নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

সপ্তম খণ্ড

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৫০৫৫

প্রথম প্রকাশ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা-পরিষদ সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ সপ্তম খণ্ড, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, ২৫শে মে ২০০৮। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : কার্তিক ১৪১৯/নভেম্বর ২০১২। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.) Nazrul Rachanabali, Central Board for the development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993, Nazrul Birth Centenary edition : Vol. VII 25th May, 2008. First Reprint (Birth Centenary edition) : November 2012. Published by : Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-5074-7

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

সপ্তম খণ্ড

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব সুগুছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল ; তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানারূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের মত একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী'র সপ্তম খণ্ডে রয়েছে প্রবন্ধ, ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা, 'জুলফিকার' : দ্বিতীয় খণ্ড, 'বনগীতি' : দ্বিতীয় খণ্ড, 'সন্ধ্যামালতী', 'রাঙা-জবা' এবং নাটক 'মধুমালা', গীতিনাট্য 'বনের বেদে', রেকর্ডনাটক 'বিয়ে বাড়ি', ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র সপ্তম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব ফারহানা খানম, জনাব সুলতানা মাহমুদা বেগম, জনাব আবু মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব শুভ্রা বড়ুয়া। প্রেস ব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত প্রকাশনার লক্ষ্যে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ ।। ২৫শে মে ২০০৮

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ সপ্তম খণ্ডে প্রবন্ধ, ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা, 'জুলফিকার' : দ্বিতীয় খণ্ড, 'বনগীতি' : দ্বিতীয় খণ্ড, 'সন্ধ্যামালতী', 'রাঙা-জবা' এবং নাটক 'মধুমালা' গীতিনাট্য 'বনের বেদে' রেকর্ডনাটক 'বিয়ে বাড়ি' ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে' সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সপ্তম খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যে-সব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন। সুস্থাবস্থায় নজরুল একই গান একাধিক গ্রন্থে সংযোজন করে থাকলে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থপরিচয়। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং

পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ ॥ ২৫শে মে ২০০৮

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী-র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইসলামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জ্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

আবদুল কাদির

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌ম)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশতেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। ...।

আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ–আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস–কর্মী–সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু–মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী–প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ–জালে ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'–এর সুর–লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়–শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা–গান।

'মৃত্যু–ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু–হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুলবুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি–মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল–বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুলবুল'–এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু–হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সিলহেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য–সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ–পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এঁরাও নজরুল–সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ–খণ্ডেরও 'গ্রন্থ–পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মালমশলার অভাব। তবে নজরুল–সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

আবদুল কাদির

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য।]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্‌ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

---

* সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের রচনা কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্যে আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদে বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বর আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্ত খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল ; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয় ; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে ; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয় ;
নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়। ...
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয় ;
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি !
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে-প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,—সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্মসংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন-রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : 'Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুংকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম-কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neopaganism-এর সাহায্য-গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথায় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ-প্যাগান নন, তিনি কখনো কখনো কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পড়েছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি-বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে

গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবিদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএবি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি-লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে ?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড 'নজরুল-রচনাবলী' কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দুবছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে' 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান, (খ)

নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল-বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস-রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ-পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি-প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ-কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে-সকল কিশোর-পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগ-মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি-বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ-মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃপ্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে-সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশত হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি-আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায়

আশিটি গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি–আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী–তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে–সকল গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক–মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাংলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি–প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত–আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে–সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ–সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন–গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সঙ্গীত–সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী–মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিকশূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার–লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮–বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯–বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল–রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল–গবেষক ও নজরুল–অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে 'নজরুল-রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু 'নজরুল-রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত 'নজরুল-রচনাবলী'রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে 'অগ্নি-বীণা'র পরে 'বিষের বাঁশী' এবং তারপরে 'দোলন-চাঁপা' বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী'। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি', 'নবরাগমালিকা'। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন 'বিষের বাঁশী' কিংবা 'পূবের হাওয়া'। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন 'সর্বহারা'। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. 'মক্তব-সাহিত্য' বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'মক্তব-সাহিত্যে'র উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা 'নজরুল-রচনাবলী'র আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০।। ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ড

শ্যামাসংগীত

কবির সঙ্গে হবীবুল্লাহ বাহার

১৯২৮ সালে ঢাকায় বনগ্রামের বাসভবনে প্রতিভা বসু (রানুসোম)কে গান শেখাচ্ছেন নজরুল

নজরুল যখন বেতারে

ঢাকার কবিভবনে নজরুল–সান্নিধ্যে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
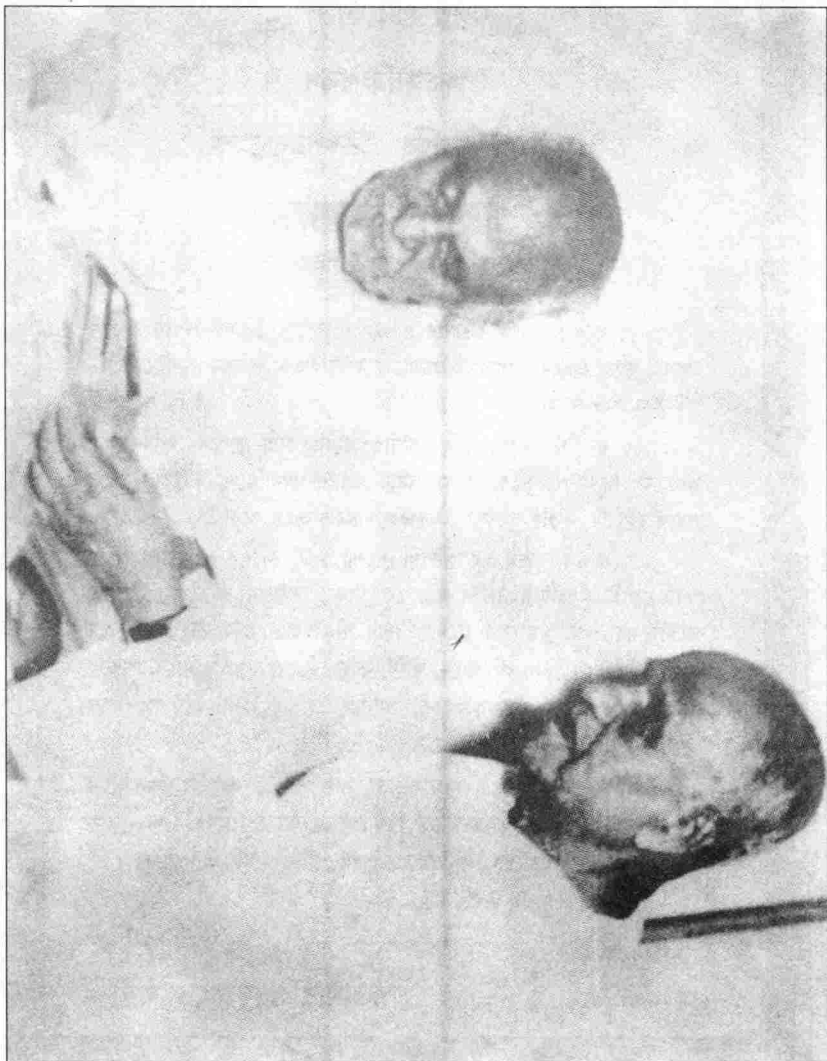
বাঙলার পরম জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের

পঞ্চচত্বারিংশত্তম

জন্মতিথি উপলক্ষে

শ্রদ্ধাভিনন্দন

হে কবি! আজ তোমার ৪৫তম জন্মতিথি উৎসব পালন করিতে সমবেত হইয়া প্রথমেই তোমাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি—তুমি ইহা গ্রহণ করো।

হে কবি! একদা তুমি তোমার অমূল্য কাব্য-সম্পদের ভাব-তরঙ্গে আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অতুলনীয় প্রেরণা দিয়াছিলে, আমরা তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছি—তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করো।

হে কবি! তুমি এই দুর্ভাগা দেশের জন্য, দেশের কৃষক, শ্রমিক ও কোটী কোটী অসহায় নরনারীর জন্য যে বেদনা অনুভব করিয়াছ, তোমার কাব্যের মধ্য দিয়া তুমি যে বিপ্লবের বিষাণ বাজাইয়াছ এবং তাহার জন্য যে দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছ—জানি, তাহারই জন্য আজ তুমি রোগশয্যার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতেছ, আমরা প্রার্থনা করি তুমি অবিলম্বে সম্পূর্ণ নিরাময় হও।

হে কবি! সারাজগতে আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য্যের ধ্বংস সাধন সুরু হইয়াছে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র-উদ্ভূত বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যে—তুমি আজ এই দুর্দ্দিনে আমাদের পথে আলো ধরো, আমাদের অনুপ্রাণিত করো।

হে কবি! তুমি দীর্ঘায়ু হও—

কলিকাতা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

ইতি—
তোমার গুণমুগ্ধ দেশবাসী

১৯৭০ সালে কবির কলকাতার কবি ভবনে এ.জেড. আবদুল আলিম ও তাঁদের কন্যা আইলিন

মধুবেণীর কোলে এই "বনী-মন্দির"। আমি এখানে এসে ধন্য হলাম। প্রাণের সরস্বতী দিয়ে গাঁথা এই মন্দিরের বেদী। সকল জাতির সকল মানুষের শ্রদ্ধা দিয়ে রচিত এর দেওয়াল। এঁরা শুধু দেবতার পূজা করেননি, দেবতাকে সৃষ্টি করেছেন। —

অনেক স্থানেই আমি গেছি কিন্তু এমন জীবন্ত প্রাণ দেখিনি। — তোমাকে এঁরা বয়সের সীমা দিয়ে বেঁধে রাখেননি যাঁর অন্তরে যৌবন আলো নেভেনি এমন বহু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকেও এঁদের দলে দেখলাম।

সব চেয়ে বেশী আনন্দ পেলাম এই দেখে যে, এখানে সাময়িক রাজনৈতিক হোলীখেলার ধূলো-কাদা এখানে এসে পৌঁছায়নি সহজ আনন্দে সহজ জীবনের মিতালীকে এঁরা অন্তরলোকে আমন্ত্রণ করেছেন। মনে হয় বাউলের একতারার ধ্বনি এঁরা শুনেছেন। এই সহজ হতে পারিনি বলেই আমাদের নাগরিক জীবনে এত ধূলো কাদা জমে উঠে, সেখানে ভেদবুদ্ধির প্রাচীর সকল মানুষকে দূরে দূরে করে রেখেছে। একই নদীর বিচিত্র তরঙ্গ মানুষ যে— এঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে একই স্নেহের বুকে বেঁধে রেখেছেন, পল্লীবাসীও এ বুঝে নিয়েছে।

সহজিয়াদের — বাউলের দেশ এ, এই সহজ ভাব— যদি এঁরা আঁকড়ে ধরে থাকেন — তা হলে তবে হবে এদেশে দাঁড়িয়ে রাখার আদর্শ মন্ত্র! "সবার চেয়ে কঠিন সাধন সহজ হবার সুর" - এই সাধনায় এঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন। আমিও এঁদের আনন্দের অংশ নিয়ে ফেললাম নিয়ে চিরদিনের মত হলো।

নজরুল ইসলাম

৪ এপ্রিল, ১৯৩১

'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের প্রচ্ছদ

'বাঙলার শেলী' কবিবর—

কাজী নজরুল ইসলাম মহোদয়

সমীপেষু—

হে অতিথি,

আমাদের ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা জন্মভূমিতে আবার তুমি আসিয়াছ—তোমায় নমস্কার করি!

গ্রীষ্মের রৌদ্র-দগ্ধ দুপুরে, বর্ষার বৃষ্টি-ঝরা প্রাতে তোমায় দেখিয়াছিলাম; তখন তোমার হাতে ছিল 'বিষের বাঁশী', কোলে ছিল 'অগ্নিবীণা', কণ্ঠে ছিল 'ভাঙার গান'। পশ্চিম সমুদ্রের 'সিন্ধু-হিন্দোলে' সেবার তুমি ছন্দ যোগাইয়াছিলে, বাড়বকুণ্ডের অগ্নি-শিখায় সুর খুঁজিয়াছিলে, 'তৃতীয়া চাঁদের সাম্পানে চড়ি' 'অনামিকা' 'গোপন-প্রিয়া'র সন্ধান লইয়াছিলে। বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে তোমায় আমরা তসলিম জানাইয়াছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলাম—'আজিকার কোলাহল কল্যকার নূতন জীবনের ভিত্তি হইতে পারে; বিদ্রোহ-অশান্তির মধ্যে পূর্ণতর জীবনের যে স্বপ্নাভাস রহিয়াছে তাহারি পানে আমাদিগকে লইয়া যাও, হে কবি'!

শীতের [illegible] তুমি দেখা দিয়াছ, নূতন রূপে, নূতন ছন্দে! 'বিদ্রোহীর' হুহুঙ্কার আজ থামিয়াছে, 'প্রলয়োল্লাস' স্তব্ধ হইয়াছে, 'ঝড়ের' ঝাণ্ডা অবনত হইয়াছে, 'রণভেরী' নীরব হইয়া গিয়াছে।

বিদেশী ওগো! আজ হাতে তোমার বাঁশের বাঁশী, স্কন্ধে তোমার 'বুলবুলি', সাথী তোমার "পারুল-চম্পা-চখাচখী", বিদ্রোহের রথ থামাইয়া আজ তুমি অশ্রুর মালা গাঁথিতে শুরু করিয়াছ। তোমার এই "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন", কান্নার সওগাতের জন্য তোমায় নমস্কার করি!

আমাদের 'দৌলত' আলাওল-পরাগল নাই, নবীন চন্দ্রের কথা আজ পুরাতন, জীবেন্দ্র কুমার 'ধ্যানলোকে', পূবদেশের 'শশাঙ্ক' এখন অস্তমিত, বাংলার আজিজ, চট্টলার কাজেম আজ চির নিদ্রায় নিদ্রিত। হে কবি! কে তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবে?

তোমায় উপযুক্ত আদর করিবে তোমার বিরহী বন্ধু সিন্ধু, প্রাণ পাইবে তুমি কর্ণফুলীর আঁকে বাঁকে, রঙ্গ-মতীর গিরি-দরী-উপবনে, চন্দ্রনাথের শৈল-শিখরে; কোল দিবে তোমায় বিবাগী বাউল, কড়িহারা মাঝি, ঘর-ছাড়া ভাটীয়াল। অতীতের স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া অনির্দ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছি আমরা, কি দিয়া তোমায় অভ্যর্থনা করিব। আমরা শুধু তোমায় সালাম জানাই, ওগো বিদেশী! তোমায় শুধু নমস্কার করি!!

তোমার প্রাণ-মুগ্ধ—

বুলবুল সমিতির সভ্যগণ।

এছলামাবাদ প্রেস, চট্টগ্রাম।

সাঁওতালী নাচ

সাপুড়ে

হলুদ-গাঁদার ফুল। রাঙা পলাশ ফুল

এনে দে এনে দে নৈলে রাঁধব না বাঁধব না চুল।

কুসুমী রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়ারি-

কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে

বাবলা ফুল আমের মুকুল॥

ঝিরকুট পাহাড় আর-ঝারে তীরে

বসবে মেলা আজি বিকাল বেলায়-

দলে দলে যাবে চলে সকলে হ'থা

সাঁওতাল সাঁওতালনী নূপুর বেঁধে পায়-

মেও দে এখাতে কাঁসা স্ট্রীর খাড়ু পায়ের মল॥

মহুয়া-কুঁড়ির মালা গেঁথেছি বিরলে নূপুর গায়

মাথে-মাথা মেখে তিয়াল পাতা থেকে রেখেছি খাড়।

পলাশ মালা নাই

দীল না কড়ি হাটে-

গাঁয়ের মেয়ে রে এনে দে এনে দে এনে দে রে পিয়া-ফুল॥

(অসমাপ্ত)

'সাপুড়ে' ছায়াছবির সাঁওতাল নাচের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গীত একটি ঝুমুর গান। কবি নজরুলের হস্তলিপি। (সৌজন্যে : 'চলচ্চিত্রে নজরুল', আসাদুল হক)

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা

গত ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' সুলেখক হেমেন্দ্রবাবুর 'সঞ্চয়ে' 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে বোধ হয় অনেকেই ক্ষুণ্ন হয়েছেন। অতোধিক মর্মাহত হয়েছেন বোধ হয় আমাদের নতুন কবিভায়ারা। লেখাটা যে তাঁদের নাকের ডগায় মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো আবির্ভূত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে! সেই 'মান্ধাতার আমলের পুরানো' এক মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত, কী সাংঘাতিক কথা!

তবে ও সম্বন্ধে এ গরিবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথম 'New York Herald' নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার ভয়ানক একটা খটকা বেধে গেছে। আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই দুনিয়ার যে-কোনো স্থানের ভ্রমণ-কাহিনী অসংকোচে লিখে থাকেন; এ একটি নিষ্করুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয় বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কাছ থেকে শুনে নতুবা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেল-মসলা সংযোগ করে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও 'কৃতার্থ' হয়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছুদিন বা খুব বেশিদিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি—আমার যতদূর সম্ভব সাদা চোখে কিছুই দেখেননি। 'সাহেব' তুর্কদের সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব বাজে বকেছেন, সেসম্বন্ধে কিছু না-বলে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু'-চারটি কথা বলে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যে পৌরাণিক প্রবাদের মতো তুর্ক তরুণীর বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্যের গুণকীর্তন হয়ে আসছে, আর শুধু পাশ্চাত্য প্রদেশ কেন, জগতের সমস্ত দেশের নূতন-পুরাতন সকল কবি ও লেখকই যে 'পঞ্চমুখে' তুর্ক রমণীর ভুবনে-অতুল সুষমার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, সব কি তাহলে বিলকুল মিথ্যা? তবে কি তাঁরা কোনো কিছু না দেখে-শুনেই চক্ষু বুঁজে, শুধু কল্পনার নেশায় মনের চোখে বেচারি তুর্ক-তরুণীদের মূর্তি এঁকে তাদিগকে একেবারে হুরপরির সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন? এমন অনেক জগদ্বিখ্যাত কবি ও লেখক তুর্ক মহিলার রূপ বর্ণনা করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, যাঁরা দস্তুরমতো তুর্ক দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁরা যে নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি, এ বোধ হয় বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাছাড়া তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহায়েত দূরও নয়, অথচ বাবা আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেননি?' এবং খামাখা ঘরের খেয়ে বেচারিদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন? আর ঐ আমেরিকান

লেখক মহাশয় একজন 'হাম্বা চোম্বা' অবতারের মতো সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয়ে সারা দুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক করে ধরলেন? লেখকের 'কেরদানি'কে বাহাদুরি দিতে হয় কিন্তু। আর হেমেন্দ্রবাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মতো তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে হুরপরি দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মতো গানে-গল্পে-কবিতায় প্রসিদ্ধা হুরপরি নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রূপ-মাধুর্য শুনেই কোনো রকমে নিজের 'আকুল পিয়াসা' দমন করে রেখেছিলেন,—এমন সময় 'দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠের' মতো সশরীরে আমেরিকান লেখক মশায় মৃত্তিকা ভেদ করে উঠে একেবারে 'চিচিং ফাঁক' করে দিলেন বা মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁশলা নয় অবশ্য।) বাস্তবিকই হুরপরির চেয়েও সুন্দরী। ও বিষয়ে আমার মতো অধমাধমের অদৃষ্ট দগ্ধ না হয়ে খুব স্নিগ্ধই বলতে হবে, কারণ আমি আমার এই চর্মচক্ষে বাস্তব জগতে যে কয়জন তুর্ক রমণীকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তার অন্তত একজন এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে বাংলার স্টেজে হাজির করতে পারলে অনেকেরই 'মূর্ছা ও পতন' হতো এবং মাথা খারাপ হয়ে যেত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। দুনিয়ার সকল জাতির রমণীই (বিশেষত যাঁরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ব-বিশ্রুত, উদাহরণস্বরূপ—পার্শি, ইরানি, ইহুদি, আরবি প্রভৃতি) দু-দশজন করে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা স্বপ্নে নয়, দিবালোকে, কল্পনায় নয় বহাল খোশ-তবিয়তে, আর প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে। কিন্তু কই তুর্ক মহিলার মতো এমন ভুবন-ভুলানো রূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়ল না। তবে হতে পারে, হয়তো ঐ তরুণীদের রূপাগ্নি আমার চোখ ঝলসে দিয়েছে, তাই আর দুনিয়ার কোথাও সুন্দরী দেখতে পাই না।

হেমেন্দ্রবাবু পরের মুখে ঝাল খেয়ে একেবারে লম্ফঝম্প দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'তুর্ক রমণীরা মোটেই সুন্দরী নয়।' কেননা একজন সাহেব বলেছেন যখন, তখন তা বেদবাক্য। একটু রসিকতার লোভে তাঁর মতো লোকের পক্ষে একজন খামখেয়ালি লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না। সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ওঁদেরই স্বজাতির মতো 'ওল ছিলা' চেহারা হলেই বোধ হয় বেশ সুন্দরীটি হতো। তবে এর সর্বশেষ প্রমাণ পেতে হলে আমাদের দুইজনকেই আবার 'আস্তানা' পর্যন্ত ছুটতে হয়, সেও তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। হেমেন্দ্রবাবু ইচ্ছা করলে অন্তত সিরাজী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারতেন।

পিকিং হতে আমদানি বেঢপ মুখ, হাবশির দেশ হতে রপ্তানি বিটকেল কুচকুচে মুখ, 'লিভ্যান্টিয়ান', 'সার্কোসিয়ান' বা 'স্কান্ডিনেভিয়ান' দেশের চ্যাপ্টা বেখাপপা মুখ ইত্যাদি যেসব পাঁচমিশেলি মুখ সাহেব-পুঙ্গব তুর্কিদের মাঝে দেখেছেন, তাই নিয়ে যদি তুর্ক তরুণীর সুষমা সম্বন্ধে ঐরকম বীভৎস মত পোষণ করেন, তাহলে আমাদের বলবার কিছুই নাই। তাহলে সাহেবেরই জয়! তাছাড়া লেখক জানেন এবং স্বীকারও করেছেন, 'তুর্কিরা নানা দেশ হতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় করে আনত, আর তাদেরই সঙ্গে

অবাধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে এই অসংখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে।' অতএব সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে শুধু এই গজঘণ্ট, রঙ-বেরঙের মুখ আদৌ তুর্কির নয়, ওসব হচ্ছে বাঁদিদের মিশ্র মুখ। ঐসব পাঁচমিশেলি মুখই বোধ হয় ঘোমটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

তুর্কিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দা-কানুনে কেতাদুরস্ত হলেও এখনও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি, আর বেরুলেও এমন সাধারণ জায়গায় বেরোয়নি, যাতে তাদের ঐ স্বর্গীয় সুষমা-মাধুরী সাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত আসল তুর্কি মহিলারা হাজার শিক্ষিতা হলেও এখনও রীতিমতো বোরকা দিয়ে পথে বের হন। কাজেই অন্যান্য দেশের মতো 'ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ' দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি।

এইসব খামখেয়ালি লেখকের কাণ্ড দেখে আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সেই সাহেব যদি বাংলায় আসেন, তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার নমুনা স্বরূপ আমাদের কুললক্ষ্মীদের রূপ বর্ণনা নিম্নলিখিতরূপে করবেন—

"বাঙালি মেয়েগুলো বিশ্রী কালো, তদুপরি তৈলচিক্কণ হওয়ায় বোধ হয় যেন আবলুস কাঠে ফ্রেঞ্চ পালিশ বুলানো হয়েছে। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পাড়াগাঁয়ে থাকে। (বাগদিদের মেয়ে দেখে সাহেব আমাদের বনফুলের মতো সুন্দরী কুলবধূদের সম্বন্ধে এই রকম সাংঘাতিক ধারণায় উপনীত হবেন।) তারপর শহুরে তাবৎ স্ত্রীলোকই খুব বেশি রকমের স্থূলাঙ্গিনী, দেহের অনুপাতে উদর ঢক্কা-সম ভীষণ প্রশস্ত, পরিধানে কম-সে-কম দুই তিন থান কাপড়, অঙ্গে খুব ভারি ভারি অলঙ্কার, মুখটি চন্দ্রের মতো নয়ই—তবে অনেকটা মালসার মতো।' মাড়োয়ারি মেয়েদের দেখে একথাই লিখবে সাহেব, কারণ তারাই বেশির ভাগ বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধুলো উড়োতে উড়োতে কাঁইয়ো মাইয়ো করে যায়। সাহেবের এ বর্ণনা ডাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, আর তাই পড়ে আমাদের সুন্দরী তরুণীরা হাত-পা কামড়িয়ে মরবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কখনও আমার নসিবে হুরপরি দেখা থাকে তবে তারা কখনও তুর্কি যুবতীর চেয়ে সুন্দরী হবেন না, এ-বিষয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছি। এমন ডাঁশা আঙুর আর পাকা ডালিমের মতো মিশানো লাবণ্য, আর আয়নার মতো স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধ হয় বেহেস্তেও দুষ্প্রাপ্য। রমণী বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশি সুন্দরী হতে পারে, তা তুর্কি তরুণী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম—

আগার ফেরদৌস বর রুয়ে জামিন আস্ত।
হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত॥

জননীদের প্রতি

[ছেলেমেয়েদের হাঁটানো]

খোকা-খুকিদের হাঁটতে দেখা বাপ-মায়ের বড্ডো বেশি আনন্দদায়ক। তাই তাঁরা যত শিগগির পারেন খোকা-খুকিদের হাঁটা শেখাবার জন্যে যেন উঠে-পড়ে লেগে যান ; আমি অনেক ঘরে দেখেছি যে, ছেলের মা তার প্রতিভূ স্বরূপ অন্য দুটি ছেলের দ্বারা তাঁর খোকাকে হাঁটা শেখাবার ভার দিয়েছেন ; আর ছেলে দুটিও খোকার দু ডানায় ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে একরকম হাওয়ার মতোই বেগে চালাতে চেষ্টা করছে ; শিশুর এতে ঘোর কষ্টকর আপত্তি থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য না করে দস্তুরমতো নিজেদের কর্তব্য করে যায়। এ যেন ঠিক সেই কাহিনীর 'হালালজাদা-হারামজাদার' মতো আর কি ? কিন্তু এ রকম 'ধরপাকড়কে আল্লাহু আকবর' এর ফল যে কত খারাপ, তাই বলছি। প্রথমেই তো স্বভাবের বিরুদ্ধে এরকম ধস্তাধস্তি করাই আমাদের জবর ভুল। কেননা, দেখবেন— যে-ই শিশুদের পায়ের মাংসপেশি ভর করে দাঁড়াবার বা চলবার মতো শক্ত হয়েছে, অমনি তারা নিজে নিজেই দাঁড়াতে এবং ক্রমে হাঁটতে চেষ্টা করবে। এ সময়ে বরং বেচারাদের একটু সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু বস্তুত এসবেরও কোনো দরকার নেই। প্রথমে শিশুরা আপনি কোনো জিনিস ধরে দাঁড়াবে, তারপর 'চলি চলি পা পা' করে বাঁকাভাবে একটির পর একটি পা ফেলবে। (এ চলা যেন অনেকটা পল্টনের সিপাহিদের স্লো মার্চের মতো।) ক্যাঁকড়ার মতো এ চলার বিকৃতি ক্রমে আপনি শুধরে যাবে। তবে ছেলের মাদের এইটুকু লক্ষ্য রাখা উচিত যে দুষ্টু ছেলে যেন পড়ে না যায় বা কোনো আঘাত না পায়। শিশুদের ভর করে দাঁড়াবার জন্যে আজকাল একরকম 'স্ট্যান্ড' বেরিয়েছে—দেখতে অনেকটা মাছধরা 'পলুই'-এর মতো। এই ক্ষুদ্র জীবগুলির পক্ষে তা খুব উপকারী আর দরকারি। কেননা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এরা ওর ভেতরে বেশ বাবুর মতো বসে আরাম করতেও পারে, আবার যখন ইচ্ছা হবে তখনই উঠে হাঁটতেও পারে। অনেক সময় বাপ-মায়ে বুঝতে পারে না ছেলে কখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর এতেই শিশুদের সমূহ ক্ষতি হয়। অনেক ছেলে-মেয়ের পা ধনুর মতো বাঁকা হতে দেখেছি, আর এ হয় মা-বাপেরই দোষে। কারণ, ছেলে-মেয়ের হাঁটবার ক্ষমতা হবার আগেই তাঁরা জোর করে তাদের হাঁটাতে শেখাবেন। কী জুলুম ! ধরুন, যদি শিশুদের পায়ের হাড় আর মাংশপেশি দেহের ভার সইবার মতো শক্ত না হয়, তাহলে তাদের জোর করে দাঁড় করাতে গেলে বা হাঁটাতে গেলে তাদের কচি হাড় বেঁকে যাবে না কি ? স্নেহের এরকম জবরদস্তির গজবে পড়ে অনেক বেচারার পা জন্মের মতো ব্যাঁকা হয়ে যায় ! এমন অনেক শিশু দেখা যায়, যাদের হাঁটতে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগে। তাই বলে তাদিগে জলদি হাঁটা শেখাবার জন্যে যে কুস্তাকুস্তি করতে হবে, এর কোনো মানে নেই। যখন উপযুক্ত হবে, তখন সে আপনিই হাঁটবে। এসব তার প্রকৃতি-মায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ, তার বড় সুদক্ষ ধাত্রী আর ছেলেদের নেই। আর যদি নিতান্তই কোনো শিশুর হাঁটতে বড্ডো বেশি দেরি লাগে, তাহলে কোনো

ভালো ডাক্তারকে দেখাবেন। কেননা খুব সম্ভব শিশুদের খাবারের মধ্যে মাংসপেশির আর হাড়ের শক্ত হওয়ার জন্যে যে রকম সারবান জিনিসের দরকার হয়তো আপনার বরাদ্দ খাবারে তা থাকে না। অতএব দু-তিন মাস দেরি হলে তাকে জোরজবরদস্তি করে হাঁটবার কোনো দরকার নেই। যখন জন্মেছে, তখন প্রকৃতি তাকে হাঁটাবেই। মনে রাখবেন, প্রকৃতি আপনাদের মাদের চেয়ে কম স্নেহময়ী নয়।

পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব

ঘোড়ার ভুরু হয় না। (তাই বলে কই তাকে তো বিশ্রী দেখায় না।)

রোমন্থনকারী জন্তু মাত্রেরই ক্ষুর বিভক্ত। (কিন্তু সাহিত্য-রোমন্থনকারী প্রাণিগুলির আদতে ক্ষুর হয় না। এটা বুঝি ব্যতিক্রম।)

তিমি মৎস্যের দাঁত হয় না। তবে হাড়ের মতো একরকম পাতলা স্থিতিস্থাপক (যা রবারের মতো টানলেই বাড়ে আবার আপনি সংকুচিত হয়) জিনিস তার ফোকলা মুখের উপর-চোয়ালে সমান্তরাল হয়ে লেগে থাকে। তাই দিয়ে এ মহাপ্রভুর দাঁতের কাজ চলে।

কচ্ছপ বা কাছিমের আবার দাঁত বিলকুল নদারদ (ছেলেবেলায় কিন্তু শুনেছি যে কাছিমে আর ব্যাংএ একবার কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না।)

শশক বা খরগোশের চোখ কখনও বন্ধ হয় না, কেননা বেচারিদের চোখের পাতাই নেই। মেমসাহেবদের মুখের বোরকার চেয়েও পাতলা একরকম চামড়ার পর্দা ঘুমোবার সময় তাদের চোখের উপর ঘনিয়ে আসে। (মানুষের যদি ওরকম হত, তাহলে তো লোকে তাকে 'চশমখোর', শা-র চোখের পর্দা নেই প্রভৃতি বলত ! তাছাড়া, চোখের পাতা না থাকলে প্রথমেই তো আমাদের চোখে ঘা হয়ে ফ্যাচকা-চোখো হয়ে যেতাম)।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে হরিণের নাকি নাকের ছ্যাঁদা ছাড়া আরও কতকগুলি ঐরকম ছ্যাঁদা আছে। আশ্চর্য বটে !

প্যাঁচার চোখে কোনো গতি বা ভঙ্গি নেই, অর্থাৎ কিনা তাদের ঐ ভাঁটার মতো চোখ দুটির তারা নড়েও না চড়েও না। সদা-সর্বদাই ডাইনি মাগির মতো কটমট করে তাকায়।

ভেড়ার আবার উপর-চোয়ালে দাঁত হয় না। (তাহলে দেখা যাচ্ছে যাঁর ওপর-চোয়ালের দাঁত ভেঙে যায় তিনিও ঐ ভ্যাঁ-গোত্রের)।

উট তো একেই একটা বিদঘুটে জানোয়ার, যাকে দূর থেকে আসতে দেখে অনেক সময় একটা সচল দোতলা বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু এর চেয়েও ঐ কুঁচবগলার হস্তম সংস্করণ জীবটির একটা বিশেষ গুণ আছে। সে গুণ আবার পেছনকার পদদ্বয়ে। উষ্ট্র-ঠাকুর তাঁর পেছনের শ্রীচরণ দুটি দিয়ে তাঁর বড় বপুর যে কোনো স্থান ছুঁতে পারেন।

একটি হাতির গর্দানে (স্কন্ধে) মাত্র চল্লিশ হাজার (বাপ্‌স্ !) মাংসপেশি থাকে। সাধে কি আর এ-জন্তুর হাতি নাম রাখা হয়েছে।

কাঁকড়া এগিয়েও যেমন বেগে হাঁটতে পারে, পিছিয়েও তেমনি হাঁটতে পারে। বাহাদুরি আছে এ মস্তকহীন প্রাণীটির।

আপনারা কোনো সর্বদর্শী জানোয়ার দেখেছেন কি? সে হচ্ছে জিরাফ। এই জন্তুপ্রবর চর্তুমুখ না হয়েও আগেও যেমন দেখতে পান, পিছনেও তেমনি দেখতে পান। ভাগ্য আর কাকে বলে!

আর একটি মজার বিষয় হয়তো আপনারা কেউ লক্ষ্যই করেননি। বৃষ্টি হবার আগে বিড়াল জানতে পারে যে বৃষ্টি আসবে, আর সে তখন হাঁচে। অতএব বিড়াল বৃষ্টির দূত বললে কেউ আপত্তি করবেন না বোধ হয়।

উত্তর আমেরিকার ময়দানে একরকম লাল খেঁকশিয়ালি আছে। শুনছি, দুনিয়ার কোনো প্রাণীই নাকি তাদের সঙ্গে দৌড়ুতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশি খেঁকিও বোধ হয় কম যাবে না। দিব নাকি এই লাল খেঁকির সঙ্গে আমাদের দেশি খেঁকির একদিন 'ঘোড়-দৌড়' লাগিয়ে?

জীবন-বিজ্ঞান

[দুঃখ-কষ্টের মহত্ত্ব]

আগুন যেমন ধাতুকে পুড়িয়ে খাঁটি করে; দুঃখও তেমনি আত্মাকে একেবারে আয়নার মতো সাফ করে দেয়। কিন্তু তাই বলে মনের সব কষ্টই দুঃখ নামে অভিহিত হতে পারে না। মোটামুটি দেখতে গেলে দুঃখ দু রকমের। একটি হচ্ছে নিজের কষ্টের জন্য দুঃখ পাওয়া, অন্যটি হচ্ছে অন্যের কষ্টে দুঃখ অনুভব করা। এই দুই দুঃখই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা একরকমের নয়।

আমি হয়তো আমার প্রিয়তম জিনিসটাকে হারিয়েছি, কিংবা আমি যা চাই তা পাই না, এইরকম সবের জন্যে যে কষ্ট পাওয়া, সেই হচ্ছে নিজের জন্যে দুঃখ। এর ফল, আত্মাভিমান এবং আত্মসুখের বৃদ্ধি। অন্যের দুঃখ দেখে নিজের দুঃখ মনে পড়া আর তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া, ক্রমে নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করে এই পরের কষ্টটাকে বড় করে দেখা, এইসব মহৎ অনুভবের ফল হচ্ছে আত্মার, প্রাণের প্রসারতা লাভ। একদিন এক বিধবা তার মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধের কাছে কেঁদে পড়ল যে তার ঐ একমাত্র মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধদেব বললেন,—'দুঃখ নেই, শোক নেই—এমন কোনো ঘর হতে কয়েকটি বিল্বপত্র যদি এনে দিতে পারো তাহলে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবো।' বিধবা অনেক খুঁজেও দুঃখ-শোকের ছোঁয়া লাগেনি এমন কোনো ঘর দেখতে পেল না। তাই তিন দিন পরে যখন এই পুত্রহারা জননী ফিরে এল, তখন সে বিশ্বের দুঃখ-কষ্টের মাঝে নিজের দুঃখের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, আর তার ঐ সসীম বুকেই অসীমের বীণের গুমরে-ওঠা বেদনার নিবিড় শান্তি

নেমে এসেছে। সে তখন আর নিজের সন্তানের জন্য দুঃখ করছে না; তার মাতৃস্নেহ সারা বিশ্বে তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যের দুঃখ-বেদনা অনুভব করাই হচ্ছে মহত্তর ব্যথার অনুভব। কেননা ব্যথার ব্যথীর এ ব্যথায় কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর কারণ, এ হচ্ছে সেই ব্যথা, যার অনুভব হয় নিজের বুকের বেদনা মনে পড়ে আত্মার ধর্ম এমনি বিস্ময়কর যে, এই পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াতেও সে এমন একটি নিবিড় আনন্দের আভাস পায়, যেন রক্তমর্মর বুকে ঝর্নাধারার একটি স্নিগ্ধ দীঘল রেখা।

এ সেই দুঃখ যা পয়গম্বরগণ বিশ্বমানবের অন্তরে অন্তর মিশিয়ে অনুভব করেছিলেন। এর বেদনা—এর আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। এ-ই হচ্ছে সেই সাধনা, যা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। এই বেদনার গভীর আন্তরিকতাতেই ত্যাগের নির্বিকার প্রশান্তি, এই চির-ব্যথার বনেই আনন্দ-স্পর্শমণি খুঁজে পাওয়া যায়।

সকলেই এ অমৃতময় দুঃখ অনুভব করতে পারে না। মহত্তর আত্মা যাঁদের, ভুক্তভোগী যাঁরা, শুধু তাঁরাই এ হেঁয়ালির মর্ম বোঝেন। এ চায় কল্পনা আর মানব-মনের বিস্ময়কর বোধশক্তি। তাই এ পথের ভাগ্যবান পথিক তাঁরাই যাদের হাতে গভীর জ্ঞান আর উঁচু প্রাণের পাথেয় আছে।

অনেক রকমের দুঃখ-কষ্ট আমাদের ঘিরে রয়েছে এবং তার অনেকগুলিরই প্রতিকার অসম্ভব। যখন আমরা আপন বুকের বেদন দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যথা নিজের করে নিতে পারি, কেবল তখনই আমাদের আত্মা উন্নত প্রসারিত হয়। তখনই আমরা সত্যকে চিনি, সুন্দরকে উপলব্ধি করি—আর তাই তখন আমাদের আনন্দ ত্যাগে, পরের জন্যে কেঁদে, বিশ্বের ব্যথিতের জন্য জান কোরবান করে।*

আমার ধর্ম

দেশে একটা কথা উঠেছে যে, মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। দেশে যখন মুক্তির জন্যে ভাঙ ভাঙ বলে রব করে লাখ লাখ লোক আগল ভেঙে বেরিয়ে এল, তখন তারা এক নতুনভাবে মাতোয়ারা হয়ে মানুষের মতো মানুষ দেখে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগল। কিন্তু আজ যখন তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হলো তখন তাঁর মতে ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক উঠে সঙ্ঘ ভেঙে যাবার যোগাড় হল। এমনি করেই যুদ্ধের পরই সঙ্ঘ থেকে জীবন চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু বাইরের একটা আচার। ঠিক তেমনি আজ যেন আমাদের ভিতর থেকে প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে—তার্কিকেরা তাকে ধরে রাখবার কোনো চেষ্টাই করছেন না। কেউ কেউ এত বেশি গোঁড়া আর সাবধানি হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ধ্বংসকে ডেকে

* ENGLISHMAN এর Magazine Section হইতে।

আর্নকার মতো সাহস বা ক্ষমতা তাদের আছে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের মনে তো কই সাড়া খুঁজে পাচ্ছি না।

আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। কিসের জন্যে আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে? ওরে শূদ্র, তুই এবার ওঠ। উঠে বল, 'আমি ব্রাহ্মণ নয় যে ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকব। আমি আর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব না। আমায় বাঁচতে হবে—যেমন করে হোক আমি বাঁচব।' ওরে পতিত, ওরে চিরলাঞ্ছিত, তুই দেখ্ সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আচার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনি ঢেকেছে।

কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল-ঝড়কে আমি বাঁধব, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করব। সব ছারেখারে দিয়েও আমি বাঁচব।

আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মতো মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফূট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দুবেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়—এই ভণ্ডামি থেকে চলে আয়। তোরা বল্ আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে? দাস কখনও দাসকে শেখাতে পারে? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনব না; আগে বাঁচব—আমরা বাঁচব।

একবার মনে ভেবে দেখো—তাদের কথা ভেবে দেখো। দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার দল আজ কোনো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে তারা কত মরে গেছে, কত ঘা সয়েছে? তারা তো কথাটি কয়নি। সেই কবে গৃহহীন হয়ে প্রবাস বরণ করে, হাটে-মাঠে বেড়াচ্ছে, তবু তারা কথাটি কয়নি। তাদেরে তপ্তশ্বাস আজ কি তোমার বুকে বয়ে যাচ্ছে না? তুমি যে পথ দিয়ে দিনের পর দিন শুধু সুখের সন্ধানে চলে যাও, তারই একপাশে বদ্ধ ঘরে তারা যে দিনের পর দিন তিল তিল করে মরতে চলেছে, সে খবর তুমি রাখো কি? সেই অন্ধকারে সহস্র আঘাত খেয়ে তারা যে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছে, তাদের ধর্ম কি?

তারা বুঝেছে বাঁচাই তাদের ধর্ম—তারা জানে এই তিল তিল করে মরার ভিতরেই জীবন। তাই তারা ঐ মরণের পথ বেছে নিয়েছে।

ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে—তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকত? তারা কি দুশমন এলে কোরআন পড়তে ব্যস্ত থাকত? তাদের রণকোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচত।

মুশকিল

আজ যে চারদিকে এত কলহ কোলাহল, এর মানে হচ্ছে আমরা যতটা দেশের কল্যাণ চাইছি, তার চেয়ে বেশি চাইছি আত্মপ্রচার বা লোকপ্রতিষ্ঠা। কারণ যখনই আমরা বাইরের খোসা নিয়ে টানাটানি করি তখনই আমাদের অতৃপ্তির মাত্রা বেড়েই চলে—অবশেষে লাঠালাঠি করে নিজেরা রক্তাক্ত হই, আর শত্রুরা হাসে। বাঙালির ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কর্মোন্মাদনা আছে। কিন্তু যা নেই সে হচ্ছে জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা ; কিন্তু এই জিজ্ঞাসা না হলে ভেদ বিষাদের মীমাংসা কোনো কালেই হয় না।

আমাদের দেশের মূঢ় জড় জনসাধারণের, শুধু তাই কেন তথাকথিত শিক্ষিতদের মনে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার ও সনাতন ধর্মের নামে পুরাতন সংস্কারের দাসত্ব করার মতন মতি, এমন ভীষণভাবে শিকড় গেড়েছে যে, আমরা সত্য ন্যায়ের অনুরোধেও বাধা বিপদের কাঁটাবন কেটে নতুন পথ খুলে নিতে পারলে মুক্তি ও মঙ্গলের পথ অবাধ ও অব্যাহত করবার মতো প্রেরণাও প্রাণে জাগে না। আমাদের এই দেহ-মনের আড়ষ্টতা—এই যে আমাদের হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছে—একটু নড়ে চড়ে সত্যের বিরুদ্ধতার সাথে লড়ে এগোবার ক্ষমতা নেই, একে কি আমরা মানবতা বলতে রাজি আছি? আজ চাই আমাদের প্রতি কর্ম ও চিন্তায় জীবনের প্রকাশ, প্রাণে চাঞ্চল্য, আর পরিপূর্ণ জীবনের জন্য বিপুল ব্যাকুলতা।

আর আমাদের নিরাশায় মুষড়ে পড়ে থাকার সময় নেই, সবাইকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগতে হবে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে মৃত্যুর বিষবীজ ছড়িয়ে আছে—সে করাল কবল থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে—আর তার জন্যে সর্বাগ্রে চাই স্বরাজ। মুক্তি-পাগল মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব অসহযোগীর কানে বেসুরো বাজতে পারে কিন্তু শুধু চরকা খদ্দর সম্বল করে দেশ যে কত কাল কোনো সুদূর ভবিষ্যতের দিনে স্বরাজের আশায় পথ চেয়ে থাকবে তা বুঝতে পারি না। আর ঐভাবে মদালস গমনে গোরুর গাড়ির চালে চললে আমাদের স্বাধীনতা আলেয়ার আলোর মতো দূরে আরো দূরে সরে যাবে, মুক্তিদেবী হাততালি দিয়ে বলবেন, 'ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে আমায় ধরতে পারলি না'—আর খলখল করে উপহাসের হাসি হেসে চলে যাবেন। চরকা খদ্দরের

আন্দোলন ও প্রচলনে দেশের লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার হচ্ছে, এ দেশের রক্ত শোষণের কলটা বন্ধ হবার অনেকটা পথ হয়েছে বটে। কিন্তু কে না জানে যে, দানবী মায়ার অন্ত নেই, আর তার কুহক জালে জড়িয়ে পড়ে আমাদের সরলপ্রাণ ও শিশুর মতো অজ্ঞান জনসাধারণ আবার ঠুঁটো জগন্নাথ হবে না, মায়ার লোভে ভুলে অমৃত ভাণ্ডের দিকে পেছন ফেরাবে না। গৌরগণ, কত যে প্রেম জানে, কত যে জাদু জানে, তা কি আমাদের জানা নেই? টাকাটা সিকিটা কম দিয়ে বিলেতি কাপড় পেলে অনেকেরই সে মাথা ঠিক থাকে না—অনেকেই সে 'প্রেমে জল হয়ে যাই গলে',—এ আমরা কলকাতা মফস্বল সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। এর মানে কি? তাহলে তো গান্ধি চিত্তরঞ্জনের কাতর আহ্বান সকলের প্রাণকে আলোড়িত করেনি, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ না হলেও, আজো তা সার্থক হয়েছে বলে মনে হয় না। আজ এদেশের প্রত্যেকের প্রাণের প্রদীপ মুক্তির অগ্নিস্পর্শে জ্বলে ওঠা চাই, সমস্ত দেশে আজ নতুন করে নবজাগরণের বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলতে হবে, আজ এমন প্রচণ্ড আগুন জ্বালা চাই, স্বাধীনতার শান্তিবারি ছাড়া যার প্রশমন হতে পারে না। স্বরাজ-সাধনায় শিশুর মতো শুদ্ধি সরলতার আবশ্যকতা আছে, স্বীকার যাই, কিন্তু তার চেয়ে যার বেশি প্রয়োজন সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি ও একান্ত নিষ্ঠা। আজ ছোট লোকটির মতো 'চলি চলি পা পা' করে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লে চলবে না। আজ যদি আমরা মুক্তির আলো-ঝরনায় অবগাহন করে নবজন্ম ও নতুন চেতনা লাভ করে থাকি তাহলে আমাদের অহিরাবণের মত বীরবিক্রমে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে হবে।

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করতে হলে কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যারা পূর্ণ মুক্তির বিরোধী তাদের শাসনযন্ত্র হতে বেদখল করা এবং বুরোক্রেসি শাসন যে নেহাত ভুয়ো ছেলেখেলা ও আমাদের সকল অমঙ্গলের আদি নিদান তা প্রতিপন্ন করে গভর্নমেন্টের গিলটি করা, মুখোশ খুলে তার বিকৃতস্বরূপ ভালো করে দেখাতে পারা যে একান্ত দরকার আর তাতে যে অসহযোগীদর ভাগবত অশুদ্ধ হবে না—এই হচ্ছে এক দলের মত। সত্যি মুক্তি সাধনকে একটি গৌণ কর্ম মনে করে আমরা যে সকলেই পুরানো থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের তালিম দিচ্ছি—এটি নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার, কিভাবে আমাদের শক্তি, তেজ উঠে নিভে যাচ্ছে তাতে আমরা যে এগিয়ে না গিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছি—তা অস্বীকার করা চলে না।

আর একদল হচ্ছেন পুরাতনপন্থী তাঁরা পরিবর্তন চান না, কাউন্সিলে গেলে দেশের কথা মনে থাকবে না—মন সাহেবি খানায় বিগড়ে যাবে। তারপর কাউনিসলের জন্য ভোট একচেটে করে দেওয়া, কর্তাদের কাউন্সিল বাতিল করে দেওয়া যাবে না—ও এমন বিষয় নয়, যা নিয়ে শক্তি ক্ষয় করে কোনো সুসার হবে। আর যে জিনিসকে অশুচি বলে বর্জন করা হয়েছে—তার সংস্রব থেকে দূরে না থাকলে আত্মা অশুদ্ধ হয়ে পড়বে।

কাউন্সিলে গিয়ে তার ফটক আটকে দিয়ে কেল্লা ফতে যাঁরা করতে চাইছেন, আর যাঁরা বলছেন ও স্থান মাড়ালেই মহাপাপ, এদের দু দলকেই জিজ্ঞাসা করছি—যে, তাঁরা দু দশটি সুখের পায়রা, ননীর পুতুল কি মুক্তিসংগ্রামের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা

ধারণ করেন? তাঁরা লড়বেন যেসব লড়িয়ে সেপাইদের নিয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে কি? তাদের অন্তরের বেদনার সন্ধান করে তার প্রতিকারের পথ দেখাবার জন্য তো অগ্রসর হতে হবে। তাদের শুষ্ক শূন্য জীবনের সুখ ও শক্তির রুদ্ধ উৎসটি তো খুলে দিতে হবে। শুধু নৈবিদ্যির চিনি দিয়ে তো দেবতার তৃপ্তি হবে না। আজ প্রচুর অন্নের ব্যবস্থা চাই, যারা দেশের শিরদাঁড়া তাদের শক্ত করতে হবে। নিচের মানুষদের টেনে উপরে তুলতে হবে তাদের মনে মুক্তিপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলে পথ আপনি ঠিক হয়ে যাবে। কাউন্সিল করতে হবে কি না হবে তা নিয়ে আজ লাঠালাঠি করে ফল নেই, ও দড়ি এত শক্ত নয় যে, দুদিকের অত ভীষণ টান সইতে পারে, এতে নিজেদের পতনের পথই প্রশস্ত হচ্ছে। এ ঝগড়া কি ধামা-চাপা দেওয়া যায় না, কাউন্সিল স্বরাজের কি গয়ায় পিণ্ডিদান হয় না?

দেশের কাজ পল্লিগঠন করতে হবে। মূক মৌনমুখে মুক্তির কলরব জাগিয়ে তুলতে হবে। সকল প্রকার মিথ্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে জনসাধারণ অকুণ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা চাই, আর তা না হলে শুধু ভদ্রলোকের জটলাতে স্বরাজের পাকা বুনিয়াদের প্রতিষ্ঠা হবে না—এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য চাই— এই অগণিত জনসাধারণ যাতে পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল রকম অবিচার কদাচারের বিরুদ্ধে, অন্তরে ভগবত্তার স্পর্শ ও অনন্ত শক্তি অনুভব করে, মাথা খাড়া করে দাঁড়াবার মতো বল পায় সেইজন্য চেষ্টা ও আন্দোলন করা। এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নভিন্নবিবাদ-ক্ষিপ্ত বিরাট জনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও চালিত না করতে পারলে অত্যাচারীর দম্ভকে স্তম্ভিত করা যাবে না। আজ সেই সাধক ও সিদ্ধ নেতা কোথায়, যিনি এই দীনহীন জীর্ণ মলিন আচণ্ডাল ভারত সন্তানের বিষণ্ন মুখে হাসির ও তেজের আলো ফুটিয়ে তুলবেন—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তাই বলছিলাম মুশকিল।

লাঞ্ছিত

মানুষ চিরকাল মানুষের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহা পশুদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষ একটি চিন্তাশীল পশু। তাহার বুদ্ধি এত প্রবল যে, ইচ্ছা করিলেই সে তাহার ভিতরকার পশুটিকে দুর্দান্ত এবং নির্মম করিয়া তুলিতে পারে। পশুর চেয়ে তার সুখ আরামের স্পৃহা একবিন্দু কম নয় এবং এই নিমিত্ত সে পৃথিবী কেন সৌরজগৎটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া তার আরামের যন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাই রেল, স্টিমার, বিদ্যুৎ গাড়ি, কলকারখানা একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই নিমিত্ত বায়ু, বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী, অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন

মনুষ্য-পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহ বা সমাজ, শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে কোটি কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে লাগিল। ফলে আজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া ইউরোপীয়গণ এশিয়া ও আফ্রিকার ধর্ম ও সমাজ শাসন করিতেছে, আবার আমাদের সমাজে কতকাল ধরিয়া মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চজাতীয় নিম্নজাতির ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়া তাহাদের পরলোকে সম্পত্তি করিতেছে। গৃহ শিল্প নষ্ট করিয়া ধনী কল স্থাপন করিলেন, অংশিদারেরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা লাভ করিয়া স্বদেশির কল্যাণ হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু সহস্র সহস্র শিল্পী কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া জাত ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। তাই আজ শত সহস্র তাঁতি জোলা, কামার কুমার বৈরাগী হইয়াছে। সহস্র লোক স্ত্রীপুত্র লইয়া কুলির কাজ করিতেছে। দিন দিন চুরিডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে। লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থানের সর্বনাশ করিয়া চারি পাঁচশত লোক ধনী হইলেন এবং বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করিলেন।

উকিল দেখিতেছে মক্কেলের কত খাওয়া যায়। মহাজন দেখিতেছে দেনাদারের ভিটেমাটিটুকু কি করিয়া নেওয়া যাইতে পারে, ভদ্রলোক ভাবিতেছে ঢং দেখাইয়া কত বোকা ঠকানো যাইতে পারে। কেউ বা বুদ্ধি বিক্রয় করিতেছেন, কেউ বা দেশনীতির মেলা খুলিয়া বসিয়া আছেন। সবাই কে কার মাথা খাইবেন ভাবিয়া অস্থির। পরের ভাবনা ভাবিবার তিলমাত্র সময় নাই। এই যে সারাদিন এত ব্যস্ততা সে শুধু কি করিয়া দুর্বলকে পেষণ করিয়া আর একটু বড় সঞ্চয় করা যায় তাহার চেষ্টার নিমিত্ত।

ভারতবর্ষে শতকরা সত্তর জন চাষি। তারা আজ অহরহ পরিশ্রম করিয়া দুবেলা খাবার অন্ন জোগাড় করিতে পারে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা অসদুপায়েও স্ত্রী-পুত্রের মুখে ভাত তুলিয়া দিতে পারে না। রোগ লইয়া দুর্ভিক্ষ ঘরে ঘরে মহাজনের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এদিকে উচ্চজাতি মৃত্যুকালেও নিম্নজাতিকে এক ধাপ উপরে উঠিতে দিবে না। জমিদারের জমি নিলামে, তবু সে প্রজার হাত ধরিবে না। বাবুরা ছোটলোকদের এখনও দূরে রাখিতেছেন। এ দেশি বড়লোকেরা ধর্ম সমাজ এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও আভিজাত্য ও কালচারের গর্বটুকু ভুলিতে পারিতেছেন না। সমস্ত জাতিটা যেন মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এমনি সময়ে যত দেশের যত লাঞ্ছিত, তাহাদের ব্যথা বুকে লইয়া মহাত্মা ভারতের শহরে শহরে ঘুরিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন, 'কে আছ লাঞ্ছিত পতিত। ওঠো! জাগো! মুক্তি তোমার দুয়ারে। তুমি উঠিয়া তোমার প্রাপ্য বুঝিয়া লও।'

স্বরাজের আশায় নাকে রুমাল দিয়া বাবুর দল ন্যাংটা সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাত্মার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অস্পৃশ্যতা আর নিচু জাতির উন্নতির কথায় বিশেষ কান দিল না। এমনকি খদ্দর জিনিসটাকেও সুবিধামতো মিশ্র খদ্দর করিয়া লইতে দ্বিধা করিল না।

নিম্ন জাতি—জাতির অধিকাংশ লোক—যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ তাহাদিগকে সেইখানেই চাপিয়া রাখিল। আর যেই আন্দোলনে মন্দা পড়িল অমনি বাবুর দল খেপিয়া

উঠিল 'বন্দরে স্বরাজ হইবে না।' নিম্ন জাতির কথা বলাও যা, ভূতের কাছে রাম নাম করাও তাই।

তাই মহাত্মা জেলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মী কেমন আছে? লক্ষ্মী মহাত্মার পালিতা নীচজাতীয়া কন্যা। তিনি লক্ষ্মীর নামে সকল নীচ জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

কে আছ পতিত, লাঞ্ছিত, কে আছ দীন, হীন, ঘৃণিত, এস। যে শক্তিবলে তোমার ভাইরা ফরাসির হাজার বছরের অত্যাচার ও আভিজাত্য দুই দিনে লোপ করিয়া দিয়াছিল, যে অন্যায় সাইবেরিয়ার লক্ষ বন্দি সন্ত্রাসদাতা দুর্ধর্ষ সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, যে শক্তিময়ীর বিকট হাস্য সমস্ত জগতের অত্যাচারকে উপহাস করিয়া ধনগর্বিতদের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই শক্তিময়ী সেই সর্বনাশের বন্যা লইয়া তোমার দুয়ারে উপস্থিত, ওঠো, ভাই, মাকে বরণ করিয়া লও।

নিশান-বরদার

[পতাকাবাহী]

ওঠো ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো, তোমাদের ডাক পড়েছে—রণদুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধরো। উড়িয়ে দাও উঁচু করে ধরে ; তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেলো ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে ভেঙে ফেলো ঐ প্রাসাদশৃঙ্গ। বলো আমি আছি। আমার সত্য আছে। বলো আমরা স্বাধীন। আমরা রাজা। বিজয়পতাকা আমাদের ; আর কারো জন্য নয়। মনে প্রতিজ্ঞা কর যে, নিশান ওড়াব আমরা। আমাদের বুকের উপর ও নিশান আর কাউকে ওড়াতে দেবো না। ও নিশান জ্বালিয়ে দেবো। শপথ করো, যদি ও নিশান আবার তুলে ধরতে চায় তবে এমন শাস্তি দেবো, যা তারা মরণের পরপারে গিয়েও তার জ্বালা ভুলতে না পারে। শয়তানকে জয় করে দেশত্যাগী করতে হলে, তাদের বুকের উপর রক্ত উড়িয়ে দিতে হবে।

আমাদের বিজয়-পতাকা তুলে ধরবার জন্যে এস সৈনিক। পতাকার রঙ হবে লাল, তাকে রঙ করতে হবে খুন দিয়ে। বলো আমরা পেছাব না। বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন নিয়ে খেলা করি, খুন দিয়ে কাপড় ছোপাই, খুন দিয়ে নিশান রাঙাই। বলো আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম জয়। বলো মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।

আমি আছি বলে নিশান হাতে তুলে নাও। এস দলে দলে নিশানধারী বীর সৈনিক ভাইরা আমার। নিজেকে সৈনিক বলে প্রচার করি, এস। এস, শয়তানকে অর্ধেক পুঁতে ফেলে তার মাথার উপর তাদেরি মাথার মগজের চর্বি দিয়ে চেরাগ জ্বালাই। শয়তানকে

দগ্ধ করে করে মারতে হবে। এই কথা বলে বেরিয়ে এস—আমি আছি, আমাতে আমিত্ব আছে, আমি পশু নই, আমি মনুষ্য, আমি পুরুষসিংহ। আমাদের বিজয়ী হতে হবে। বিজয়-পতাকা ওড়াতে হলে খুন খোশরোজ খেলা খেলতে হবে। ধরো ধরো-এক হাতে ভীম খড়গ সর্বনাশের ঝাণ্ডা আর—আর এক হাতে ধরো রক্তমাখা পতাকা। আমাদের এই বিজয়-মঙ্গলের সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে তবে তাকে ধড় থেকে অর্ধেক ছাড়িয়ে নিয়ে অর্ধেক সাগরজলে ভাসিয়ে দাও আর অর্ধেকখানা সেখানে পড়ে দুপায়ের গিটে গিটে যেন ঠোকাঠুকি করে।

আঘাতের দেবতাকে এনে তোমার মগজের ভিতর বসিয়ে নাও। কালী করালীর হাত থেকে ভীম খড়গ ছিনিয়ে আনো। উচ্চ প্রাসাদ-শিরে যে পতাকা উড়ছে তাকে উপড়ে ফেলে সেখানে আমাদের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দেবো বলে বেরিয়ে পড়ো। চেয়ে দেখো তোমার মা 'মেয় ভুঁখা হুঁ' বলে চিৎকার করে করে বেড়াচ্ছে, সর্বনাশী বেটিকে শান্ত করো। নাহলে সে নিজেরে ছেলের রক্ত খেতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

যে নরনারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করে, ভীরুতা শিখিয়ে দাস করে রেখে দেয়, তাকে তোমরা ক্ষমা করো না। তার কণ্ঠ চিরে উষ্ণ রক্ত পান করো। তোমাদের পূর্বস্থান তোমরাই দখল করে তার উপরে তোমাদেরই বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দাও।

তোমার পণ কি

নিবিড় অরণ্যমধ্যে গভীর নিশীথে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে?' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে প্রশ্ন করিল, 'তোমার পণ কি?' আবার শ্রুত হইল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

—জীবন তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবে?

—আর কি আছে? আর কি দিব?

উত্তর হইল, ভক্তি!

ওরে আমার তরুণ সাধক, আজ ঐ শোন আঁধার ভেদ করিয়া কার প্রশ্ন শোনা যাইতেছে, 'তোমার পণ কি? তুমি কি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও? পিশাচের অত্যাচারে তোমার বুকে কি রণলিপ্সা জাগিয়া উঠিয়াছে? দুর্বৃত্ত দলনের নিমিত্ত সংহারমূর্তি লইয়া ভগবান কি তোমার হৃদয়ে আসিয়াছেন? পদ-মদ-মত্ত রাক্ষসের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিবার লোভ কি তোমার হৃদয়ে জাগিয়াছে? ওরে আমার বাংলার সাধক! তোমার প্রাণে কি রুদ্র বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে? তাহা হইলে বলো, তোমার পণ কি?

ঐ দেখো অত্যাচার তার সহস্র ফণা দোলাইয়া বিশ্বতরু গ্রাস করিতে উদ্যত, প্রাণে প্রাণে পদাহতা দেবতার তপ্ত শ্বাস, ঘরে পীড়িতের ক্রন্দন। তুমি এ কালনাগকে পিষিয়া মারিতে পারিবে? তুমি কি বুকে বুকে আগুন জ্বালাইতে পারিবে? তাহা হইলে বলো, বীর, 'তোমার পণ কি?

বলো, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।' দুয়ারে আঘাত করিয়া বল—'ওগো, কে আছ পতিত, কে আছ শূদ্র, তোমরা ওঠো, এ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এ সংসার যে ভেঙে ফেলতে হবে। তোরা আয়, কার কাঁচা প্রাণটা বলি দেবার লোভ হয়েছে আয়, তোরা আয়।'

একবার—ওরে একবার তোরা ঐ তন্দ্রালসের বুকে আঘাত কর, একবার তোরা চেঁচিয়ে বল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।' আবার প্রশ্ন হইল, জীবন তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবি? ওরে তরুণ, ওরে মাতাল, প্রাণ তো তুচ্ছ কথা, আর কি দিবি? তোদের দয়া, তোদের মায়া, তোদের আশা, তোদেরে ব্যথা—তোদের আর কি দিবি? তোদের মনের কোণে কি সুখের আশা আছে? ওরে দুঃখী, ওরে হিংস্র, তা ভেঙে ফেল। সে যে সবটুকু চায়!

আর কি দিবে?

বাংলার ছেলে তুমি বলো, 'আমি সব দেবো, আমি সব নেব।' পারিবে কি? যখন অগ্রসর হইতে হইতে একটি একটি করিয়া সেনাপতি আহত হইয়া পড়িবে, তখন সেই শ্মশানে নিজ স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবে কি? শত্রুর সেনা যখন তোমার ঘরে রক্তস্রোত বহাইয়া দিবে, তখন তোমার চক্ষু পশ্চাতে ফিরিবে না তো? প্রিয়তম বলির করুণ ক্রন্দনে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে না তো? তাই বুঝি সে কঠোর স্বরে বলিতেছে, 'আর কি আছে, আর কি দিবে!' ভীষণ দুর্দিন। শত্রুরা একবার শেষ চেষ্টা করিতেছে। দেশে দেশে দানবরাজেরা ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। যুগবাণীর কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের রক্তাক্ত নখর প্রসারিত। ওগো, মরণপথের পথিক, তোমরা পারিবে কি? ক্ষত-বিক্ষত দেহেও তাহার বক্ষে আঘাত করিতে পারিবে কি?

একে একে সেনাপতি সরিয়া যাইতেছে। অন্ধকার, ওরে চারিদিকে অন্ধকার। তোমার এ অন্ধকারে চলিতে পারিবে তো? পথ-বাহক যদি হাত ছাড়িয়া দেয় তবে পথ ভুলিবে না তো? মাতার ক্রন্দন, প্রিয়ার ব্যাকুলতা—দলিত করিয়া একা এই অন্ধকারে পথ চলিতে পারিবে তো? তবে বলো, তোরা বলো—

ওরে চারিদিকে মোর
একি কারাগার ঘোর
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা
আঘাতে আঘাত কর।

ভিক্ষা দাও

ভিক্ষা দাও! পুরবাসী, ভিক্ষা দাও! তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও!

আমাদের এমন একটি ছেলে দাও, যে বলবে আমি ঘরের নই, আমি পরের। আমি আমার নই, আমি দেশের।

ওগো তোমরা চেয়ে দেখো সর্বনাশ! আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কোটি কোটি লোক দুমুঠো ভাতের জন্য হা হা করে ছুটছে। ওগো ঐ দেখো কোটি কোটি ভাই আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বুকে হাত দিয়ে দেখো সেখানে আর প্রাণ নাই, তোমাদের হৃদয়ে অনুভব করে দেখো সেখানে আর বল নাই। ওগো বলি চাই। বলি চাই। তোমাদের একটি ছেলে বলি চাই।

ওগো সংসারী! কোথা যাও। তুমি কি সুখ পেয়েছ? পদে পদে অভাব আর অধীনতায় আহত হয়ে তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পেয়েছ? ওগো! তুমি তো শান্তি পাবে না। তুমি তো যুদ্ধে তোমার ছেলে দাও নাই। ওগো, ভিক্ষা দাও, একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও।

ওগো পূজারী, কোথায় অর্ঘ্য দিতে চলেছ? বুকে বুকে দেবতার তপ্ত শ্বাস হু হু করে বয়ে যায়—তুমি কার কাছে ডালি নিয়ে যাও। ও কি নিয়ে যাচ্ছ তুমি! ফুল আর পাতায় তোমরা দেবতা কি তুষ্ট হবেন? বুকে তার তীব্র জ্বালা, চোখে তার হিংস্র বহ্নি। ওগো, সে তো ফুল পাতা চায় না, সে চায় কাঁচাতাজা প্রাণ। ওগো, বলি দাও—বলি দাও।

ওরে তরুণের দল। একবার ফিরে দাঁড়াও।

কোথা যাও তোমারা অন্ধের মতো, কোথায় চলেছ তোমরা? ঐ যেন চাষীর শত শত রক্ত প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে তাদের দলিত করে কোনো উন্নতির দিকে ছুটে চলেছ? তোমার বুকের ভিতর যে দেবতা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে তার কণ্ঠরোধ করে কোনো মায়াবীপুরের দিকে চলেছ? কান পেতে শোনো কাদের কান্নার ধ্বনি আকাশে পাতালে ধ্বনিত হচ্ছে। তোমরা কি তোমাদেরে অলস বাঁশি দূর করে দেবে না? চোখ মেলে দেখো, সব গেল। সব গেল। তিল তিল করে সব যে শেষ হয়ে গেল। ওগো তরুণের দল, তোমাদের ভিতর কি এমন লক্ষ্মীছাড়া কেউ নেই—যে বলে, আমি তিল তিল করে করে বাঁচব না। আমি ঘরের মায়ায় ভুলব না, ঘর আমার স্থান নয়, ঐ কাঁটাবন আমার ঘর, দুঃখ-দারিদ্র্য আমার সম্পত্তি, মৃত্যু আমার পুরস্কার। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে এই ভীষণ আঁধারে নিজের বুকের আগুন জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়? তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, আমি আছি, সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি; যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও, তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।

ওরে তরুণের দল! একবার বুকে হাত দিয়ে বল্ দেখি একবারও কি এ নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়নি? একবারও কি এই জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে ইচ্ছা হয়নি? ওরে ওঠ্, ওরে তোরা ওঠ্, দূর করে দে জড়তা, ছিঁড়ে ফেলে দে বন্ধন। হৃদয় থেকে কোমলতা দূর করে দে। শয়তানের হিংসা নিয়ে শত্রুর পানে একবার ছুটে চল্। বিশ্বের গরল প্রাণে ঢেলে দে। তোরা বিশ্বময় বিষ ছড়িয়ে দে, সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাক। অত্যাচার! অত্যাচার ঐ দেখো অত্যাচার তার ভীষণ মূর্তি ধরে বসেছে। ধনী তার ধন নিয়ে, বলবান তার লাঠি নিয়ে, কাজী আর পণ্ডিত তার শাস্ত্র দিয়ে মানুষকে

হত্যা করবার কি ভীষণ চেষ্টা করছে। ঐ শোন্ তাদের তাণ্ডব চিৎকার। ঐ দেখ্ কি বিকট মূর্তি।

কে আছ বীর, তার টুটি ধরে মারতে পারো। কে আছ, দুঃসাহসী, তার সহস্র ফণা নিয়ে খেলতে পারো। কে আছ নাস্তিক, কে আছ হিংসুক, কে আছ বিদ্রোহী, এসো ! কে আছ তরুণ, কে আছ পাগল ভিক্ষা দাও, তোমার মাতাল প্রাণটি ভিক্ষা দাও।

কামাল

যাক, এতদিনের পর একটা ছেলের মতো বেটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই। এতদিন দুঃখ হতো যে, এই হিজড়ে নপুংসকগুলোর মুখ দেখে মরবার পাপে হয়তো আবার শুয়োর হয়ে জন্মাতে হবে, কেননা হিজড়ের মুখ দেখে যাত্রার মত্যে অলক্ষুণে কোনো কিছু আছে কিনা জানি না। কিন্তু হঠাৎ একি শুনি ? ও কার বিষাণ বাজে ? ও কার তরবার মরা সৃষ্টির বুকে জীবনের বিদ্যুৎ হেনে যায় ? বিশ্বে যখন, 'যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি' অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দা পুরুষ কামাল এল তার বিশ্বত্রাস মহা তরবারি নিয়ে সামাল সামাল করে রোজ কিয়ামতের ঝঞ্ঝার মতো, রুদ্রের মহারোষের মতো। অত্যাচারীর মুখে গোখরো সাপের বিষাক্ত চাবুক মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেললে খ্যাপা ছেলে। ঘুষি মেরে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলে, পেঁদিয়ে তিন ভুবন দেখিয়ে দিলে। হাঁ, ব্যাটাছেলে বটে বাবা, একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর। ইচ্ছা করছে, খুশির চোটে তার পায়ের কাছে পড়ে নিজের বুকে নিজেই খঞ্জর বসিয়ে দিই। এই তো সত্যিকারের মুসলিম। এই তো ইসলামের রক্ত-কেতন। দাড়ি রেখে গোশত খেয়ে নামাজ-রোজা করে যে খিলাফত উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল, তা নাহলে সে এতদিন আমাদের বাঙলার কাছা-খোলা মোল্লাদের মতন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাছা না খুলে কাবার দিকে মুখ করে হর্দম ওঠবোস্ শুরু করে দিত। কিন্তু সে দেখলে যে বাবা, যত পেল্লাই দাড়িই রাখি আর ওঠবোস্ করে যতই পেটে খিল ধরাই, ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই, মারের চোটে স্রষ্টারও পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই। ওসব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলামের উদ্ধার হবে না—ইসলামের বিশেষ তলোয়ার, দাড়িও নয়, নামাজ-রোজাও নয়।

তাই সে সিধে মালকোঁচা এঁটে কোমর বেঁধে বন্দুক কাঁধে তুলে, দে ধনাধ্বন মার ধনাধ্বন জুড়ে দিলে। আল্লাতায়ালাও তার কথা শুনলেন, ডাকাত ব্যাটারা মুক্তকচ্ছ হয়ে চোঁ চোঁ দৌড় মারলে। তাই বলি কি, ভাই রে তোদের ঐ ধনুষ্টঙ্কারী চেহারার হিজড়ে মার্কা ফাঁকির প্রেম-বাণীটানি দিয়ে কিছু হবে না, ওসব ভণ্ডামি ছেড়ে দে। সোজা 'হল বলরাম স্কন্ধে' অজামিলের মতো বন্দুক ঘাড়ে তুলে বেরিয়ে পড়। ডাকাত কখনও তোমার

হাতে বন্ধু দিয়ে বলে দেবে না যে, নাও বন্ধু, পিঠ পেতে দিলেম, তুমি পিটাও। ওটা নিজে জোগাড় করে দিতে হবে। এখন ঐ উপায়টাই দেখো। এর চেয়ে সোজা সহজ সত্যি বোম্ কেদারনাথ বলে। আপনি আল্লা ভগবান সবাই সহায় হবে তোমার।

প্রেমের খোশামোদিতে নিদ্রিত নারায়ণের ঘুম ভাঙে না। ওঁর দোরে প্রচণ্ড ঘা দিতে হয়। ভৃগুর মতো বুকে লাথি মেরে জাগাতে হয়। রেগো না বন্ধু, যতই রাগো, এটা ডাহা সত্যি যে, মারের মতো বড় জিনিস এখনো সৃষ্টি হয়নি দুনিয়ায়।

ভাববার কথা

আর দুই এক দিন পরেই তীর্থ, বৌদ্ধ তীর্থ, ভারতের অন্যতম প্রাচীণ গৌরবময় ঐতিহাসিক গয়া নগরীতে ভারতের শত শত জাতি সম্প্রদায়ের একীভূত মহামিলন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। সহস্র সহস্র হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্শি, আর্য, ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নরনারী আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, শত অত্যাচারে জর্জরিত, রোগ-শোক-প্রপীড়িত, ভীত-ত্রস্ত তেত্রিশ কোটি মানবের জীবনমরণের সমস্যা, ইহজীবনের সুখ-দুঃখের আলোচনা করবার জন্যে সম্মিলিত হবেন।

সাঁইত্রিশ বৎসর আগে একদল মুক্তিকামী,—আজ আমরা তাদের যা-ই বলি না কেন, আমাদের ওষ্ঠে, পৃষ্ঠে, ললাটে হাজার বন্ধনের প্রথম জ্বালা অনুভব করেছিলেন, তাই হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির প্রথম বীজ বপন। সেই থেকে প্রতি বৎসর সারা বৎসরের পুঞ্জীভূত বেদনা ও আশা নিয়ে মহাসমিতির এক একটি অধিবেশন হয়েছে, একটু একটু আলোচনা হয়েছে, পূর্বের সারা বৎসরের গুপ্ত বেদনা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে কংগ্রেস অধিবেশনের ফলে পরিস্ফুট হয়েছে আর পরবর্তী সারা বছর সেই বেদনায় হাত বুলিয়ে, আরে রোগ বিকারের প্রলাপে কেটে গিয়েছে।

১৯০৫ সালে এই বেদনা তীব্র হয়ে ১৯০৬ সালে মূর্ত হয়ে উঠল। পূর্বে যারা কাউন্সিলে যাবার উপযুক্ত, শাসন করবার উপযুক্ত, মোকদ্দমা চালাবার উপযুক্ত, এমনই সব মহারথীর মায়ের পূজার আয়োজন করতেন। প্রত্যের জেলার দুই একজন নামজাদা লোক সেই জাঁকজমকের পূজায় সম্বৎসরের মতো তিন দিন পুষ্পাঞ্জলি দিতে যেতেন। সে পূজায় বিশেষ কোনো বর লাভের সম্ভাবনাও ছিল না, পাওয়া যেত না। এদিকে জাতির উপর উৎপীড়ন, বন্ধন, জারণমারণ, বশীকরণ বুরোক্রেসির দিক থেকে সমান বেগে চলতে লাগল। শেষে তখনকার মতো তার মাত্রা পূর্ণ করবার জন্যে ১৯০৫ সালে অপেক্ষাকৃত উর্বরমস্তিষ্ক বাঙালিদের, বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মনের ভিতরে বিষবৃক্ষের বীজ পুঁতবার জন্যে বাংলাদেশকে কাটবার ব্যবস্থা হলো। বুরোক্রেসির কসাইখানার ছোরা যতই ধারালো ও ভারী হোক না কেন, এবার দেখা গেল বাংলা তো

তাতে কাটলই না, উপরন্তু ছোরা যেন চুম্বকশক্তিতে সারা ভারতের সমস্ত টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে এসে সত্যি সত্যিই একটি জাতি গড়বার জন্যে ১৯০৬ সালে কলকাতার ময়দানের পাশে জমায়েত হলো। জাতীয় মহাসমিতির বীজ সেইবার অঙ্কুরিত হয়ে চারা বেরুল।

আমাদের জাতির গুণই হোক আর দোষই হোক—স্বভাবটা এমনই যে তার পাকা জমিনের উপর সহসা কেউ নতুন রঙ ধরাতে পারে না। আবার যেটুকু রঙ ধরে, তাও সহসা মুছতে চায় না। ১৯০৭ সালে বাঙালির ছেলেরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা ও উন্মাদনায় সারা ভারত জাগাল, ভারতজোড়া মহামারী কাণ্ড বেঁধে গেল। জাতীয় যজ্ঞের পৌরোহিত্য তরুণের হাতে গিয়ে পড়ল।

তখন কংগ্রেসও ছিল বুরোক্রেসির অঙ্গ, কারণ এক মূর্তিতে যাঁরা বুরোক্রেসিকে সেবা করতেন তাঁরা আর এক মূর্তিতে কংগ্রেসের সেবা করতেন। কোনো উদ্ধত মুক্তিপাগল ছেলে যদি কোনো কংগ্রেসের পাণ্ডার সম্মুখে 'গবর্নমেন্ট ভেঙে দেও' এমন কথা উচ্চারণ করত, তবে পাণ্ডাঠাকুর নিশ্চয়ই পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দিয়ে বাহাদুরি নিতেন। এতদিনে সত্যিই মুক্তিকাম একটা দলের প্রাণের ভিতরে বাঁধনের একটা তীব্র মোচড়ানি অনুভূত হলো। সেই মোচড়ানিতে অদের তনুমনপ্রাণ মুচড়িয়ে উঠল, পেশিগুলি সারা অঙ্গেরই এমনি ফুলে উঠল যে পটাপট একটা ঝটকায় সব বাঁধনগুলো ছিঁড়ে গেল। তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিল। আলোর দিকেও জাতীয় বিদ্যালয়, কাপড়ের কল, টেকনিকাল স্কুল, সাবানের কারখানা, দেশ-বিদেশে গিয়ে চাষবাস, কলকব্জা শেখা, চালানো ইত্যাদি হতে লাগল। তখন মহাসমিতি গাছে পরিণত হয়েছে। এইবার বুরোক্রেসি দানব তার হাজার হাজার চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে এই গাছ কাটতে খাঁড়া তুলল। গাছ আবার মুষড়ে পড়ল, কিন্তু রক্তবীজের গাছ একেবারে মরল না। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত এমনি করে আঁধার কেটে গেল। এই সময় বিধাতার বিধানে বুরোক্রেসির হাত দিয়ে পাঞ্জাবে এই মুষড়ে-পড়া গাছের গোড়ায় রক্তের তরল সার ছিটিয়ে দেওয়া হলো। সেই থেকে মহাসমিতিতে এই চার বছর ধরে সংঘর্ষই হয়ে আসছে। জাতীয় তরু এখন পুষ্পিত। অনবরত আঘাত খাওয়া তার সয়ে গিয়েছে। সহস্র তীক্ষ্ণ কুঠার তাকে সমূলে বিনাশ করবার জন্য উত্তোলিত।

এইবার জাতির আর এক মহাসমস্যা উপস্থিত। মায়ের পূজার বিধান নিয়ে, ক্রম নিয়েই এই বিবাদ। কিন্তু যখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি শান্তির সময়ের মতো নির্বিবাদে এ পূজা যখন সাঙ্গ করতে পারব না, শত্রু যখন সহস্র বাণে দেহ ক্ষত-বিক্ষত করছে, সেই অবস্থাতেই যখন আমাদের পূজা সাঙ্গ করতে হবে, তখন মায়ের নিকট শান্তিতে বসে মায়ের শ্রীঅঙ্গে পুষ্প চন্দন সেবা করবার অবসর কই?

উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তবে যার যেখানে সুবিধা সেখান থেকেই বুরোক্রেসির বিষদাঁত ভাঙবার ব্যবস্থা করতে হবে। মায়ের এখন ভুবনেশ্বরী মূর্তি নয়, ভারতমাতা এখন মৃত্যুরূপা কালী। তারই উপর যখন অত্যাচার তখন নিজের সাধনার কথা জাহান্নামে দিয়ে আগে তাকেই রক্ষা করতে হবে, আর অত্যাচারীকে বহু দূরে রাখবার জন্যে আলোয় আঁধারে, সদরে অন্দরে সর্বথা ঢুকে তার যতরকম বাঁধনের চাবিকাঠি চুরির

সিঁদকাঠি আছে সব কেড়ে নিতে পারা যায় যেমন করে, ফাঁকে পেলেই তার চামড়া কতখানি শীঘ্র তুলে নেওয়া যায়, তার অত্যাচার থেকে নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে যত পথ পাওয়া যায়, সে পথ যত দুর্গমই হোক, তার একটাও হাতছাড়া কেমন করে না হয়, তার সকল ফন্দি করে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়—যাঁরা কথার লোক নন, কাজের লোক তাঁরা তাই ভাবুন। ওদের শিবিরের যেখানে খুশি প্রবেশ করে ছত্রভঙ্গ করে দিন, কথার আবার ভাব কি? ও তো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, অত্যাচারীর খাবারের কতকখানি টেনে নিয়ে এলে তার ভুড়ি পাতলা করা যায়, আমার ঘাড়ের উপর থেকে কোনো পাঁকের ভিতর কোনো কাঁটাবনে, কোনো আঁধার রাত্রে তাকে দুটো ঠাসা, দুটো ঘুষি এবং অন্নজল বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাই এখন শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, গমনে, দানে, ধ্যানে, পূজায়, পার্বণে, বিবাদে, শ্মশানে একমাত্র ভাববার কথা।

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলির Skylark-এর মতো, মিল্টনের Birds of Paradise-এর মতো এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না ; কেবলি ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপনলোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে—তরুলতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে—তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না, তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে : স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলির ধরাতে নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ-ঔদ্ধত্যে সুর লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন : অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে : আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন : দৈত্যের এ-ঔদ্ধত্য কোনো-কালেই টেকেনি!

নিচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে : কেন যে টেকেনি তার কৈফিয়তই তো চাই, দেবতা! আমরা তো তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী-মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী, আর একদিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্যরূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পক্ষীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতিন নয়, সে তার মাসিমা। তবে সে তার মায়ের মতো দুঃখিনী নয়, সে রাজরানি, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোনো দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার উপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুঃখিনী মাকে শোনায়।—তার আর ভাইদের মতো, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি, সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে—লিওনিদ আঁদ্রিভ, ক্নুট হামসুন, ওয়াদিশল, রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মতো হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান করে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্গার করেননি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মতো বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন : এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্ত-মাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল-নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব।

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

A thing of beauty is a joy for ever. (ENDYMION)

Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটির মানুষ Whitman বলেন :

Not physiognomy alone—

Of physiology from top to toe I sing,

The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হলো না, সেই capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রসারপাইন যমরাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা

দেয় তার লেজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাতমুখ যদি পোড়েই—তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব—বলেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দুরবিনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করার পুণ্যবলে মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজো পূজা পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে—তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পুজো পাবে না—এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাদের, তাঁদের বলছিনে, হয়তো তাতে করে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।...

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে 14th December—১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের 14th December—এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি Merezhkovsky-র বেদনা-চিৎকার '14th December!' এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলায়ের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতিভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস। এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে লটকানো মৃত্যুপাণ্ডুর মূর্তি।*

এই নির্বাসনের সাইবেরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির 'Crime and Punishment'। রাস্কলনিকভ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ এই বহু-পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে বলল, 'I bow down not to thee, but to suffering humanity in you!' সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে-ব্যথায় শিউরে উঠল। নিখিল-মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠল। টলস্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে। সে মহাপ্লাবনে Noah-র তরণীর মতো ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন-শেষ নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মতো—ভয়াবহ সাইক্লোনের মতো বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। চেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই

---

* সেন্ট পিটার্সবুর্গে Decembrists Revolt হয়েছিল ; সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি পুশকিন সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, এমনকি Decembrist Welfare Society-র গুপ্তসভায়ও তিনি যোগ দিতেন, এসব তথ্য অধুনা জানা গেছে। কিন্তু তিনি 'ফাঁসির রজ্জুতে' প্রাণ দিয়েছিলেন, এ-তথ্য ঠিক নয়। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলেকজান্দার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) কিঞ্চিদধিক ৩৭ বছর বয়সে তাঁর স্ত্রীর আপন ভগ্নিপতি ব্যারন জর্জেস দ্য আঁথেস (Baron Georges d' Anthes)-এর সঙ্গে দ্বৈতদ্বন্দ্বে (duel-এ) পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে মারা যান।—সম্পাদক।

ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে : তোমার সৃষ্টির জন্যেই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলস্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন : **That man has only one God and that is Satan!** কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারলে না।

গোর্কি বললেন : দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।

'লক্ষ কণ্ঠে গুরুজির জয়' আরাবে বাসুকির ফণা দোল খেয়ে উঠল। নির্জিতের বিক্ষুব্ধ অভিযানের পীড়নে পায়ের তলার পৃথিবী চাকার নিচের ফণিনীর মতো মোচড় খেয়ে উঠল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে-লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংস-ক্লান্ত পরশুরামের মতো গোর্কি আজ ক্লান্ত-শ্রান্ত—হয়তো বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তার প্রভাব আজ রুশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিকস-এর অঙ্ক এই জাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মতো এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি-না তা আজও বলা দুস্কর।

রাশিয়ার পরেই আগে স্ক্যান্ডিনেভিয়া।—আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবি রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানিও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবি করে।

আজকের নরওয়ের ক্নুট হামসুন, যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের কথাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানসপুত্র। হামসুন, বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর **The Prisoner Who Sang**-এর নায়ক যেন পাপেপুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মতো স্তবের আকুতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলো তরুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—তার তুলনা কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে—মাতৃহারা শিশু যেমন করে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে Revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা ; স্ক্যান্ডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি ; নরওয়ে দিয়েছে দুচোখে চোখভরা জল। রাশিয়া বলে এ-বেদনাকে পুরুষ-শক্তিতে অতিক্রম করব, ভুজবলে ভাঙব এ-দুঃখের অন্ধ কারা। নরওয়ে বলে, প্রার্থনা করো ! ঊর্ধ্বে আঁখি তোলো ! সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না !

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায় হঠাৎ কোনো অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে। চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। পিছন ফিরে দেখি, চার্বাকের মতো, জাবালির মতো, দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল বার্নার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, জেসিতো বেনাভাঁতে। তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড। শ বলেন : Love-টাভ কিছু নয়—ও হচ্ছে মা হবার insticnt মাত্র, ওর মূলে Sex। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন : কি হে ছোকরারা, খুব তো লিখছ আজকাল। বলি, ব্যালজ্যাক-জোলা পড়েছ ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। হাসি লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে Leonardoর মুখ দিয়ে বলে : 'বন্ধু ! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল—তাকে ভুলতে হলে ভালো করে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়। মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়—সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে তবে তার মরাই মঙ্গল।'

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল—শাহজাহানের মোমতাজকে ভালো করে কবর দিয়ে, ভালো করে ভুলবারই চেষ্টা।

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম ; কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মতো অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার দুটি শান্ত লোক চুপ করে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশল রেমন্ট—পোলিশ, আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—ইতালিয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না। হঠাৎ চমকে উঠে শুনি—আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি তালে তালে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যু-অননৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনি এবং তার কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশির ধ্বনির মতো শ্রেষ্ঠ স্বপনচারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—'The sound of the bell that leaves the bell itself.' তারপরেই সে বলে : 'আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না। ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্য আমার এ গান শোনা।' শুনতে শুনতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। ধুলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তবগান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায় ! স্বপ্নে

শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্রচালকের বাঁশি,—তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মতো দেহ।

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলি-খেলা চলে। আমি স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি—'Thou wast not born for death, immortal bird!'

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদি। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনি বলে ফেলেছিলাম।...

এরি মধ্যে একদিন এ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন, 'আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবিঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছেন।'

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু-একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজকয়েদি। আমার চেয়েও বেশি হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুবি গল্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যিসত্যিই আমার ললাটে 'অলক্ষণের তিলক-রেখা' এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে, কারণ, এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দি বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনেরোবার করে নিন্দা করলেন। আমার হয়ে গেল 'বরে শাপ !'

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হলো না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমারই অগ্রজ-প্রতিম কোনো কবি-বন্ধু, সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ 'লীড' করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দুজনেই জানতাম, তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী বলে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে,—শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ-খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি, বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার ! মনে মনে কেঁদে বললাম, 'হায় গুরুদেব ! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে ?'...

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ-কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন, 'যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে !'

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দুচারটে কবিতা-গানও শুনিয়েছি ... অবশ্য কবির অনুরোধেই। এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশত তার অতি-প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনোদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভালো বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সংকোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না, বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন—'তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ—তোমাকে জনসাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে'—ইত্যাদি।

আমি দেখছি, এ-গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি করে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই 'শুভানুধ্যায়ী'রা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ মিটল না। বাপরে বাপ ! মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত করতবও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি ! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানি রসিকতা, আর সে মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি ! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ।

বাংলায় 'রেকর্ড' হয়ে রইল আমায়-দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ। ফি হপ্তায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া-রোগ—এ স্বদেশপ্রেমের বাই উঠল ? কোথায় তুই হাঁ করে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে মলয়-হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি, 'আয়লো অলি কুসুমকলি' গান,—তা না করে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা ! গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রায়োপবেশন, পরলি শিকল—বেড়ি, ডাণ্ডাবেড়ি, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোনরকম রসিকতা তোর ? কেনই বা এ হ্যাঙ্গামা-হুজ্জুৎ ?

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে! সাহিত্যের বেণু–বনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশি অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট ছুট! যত মোলায়েম করেই বেণু–বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশবনই হয়ে ওঠে তা কোনো পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে?

বেচারি তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্তমহারথীর সমাবেশ। বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল। ঘন ঘন হাততালি! বলে, 'এই! বাঁশ–বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়!' কিন্তু শুধুই কি সপ্তমহারথীর মার? তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো–কাদা–গোবর–মাটি—কোনো রুচির বাচ–বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে!

মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আসা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু–বন যে পুকুর–পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল।

পুলিশের জুলুম আমার গা–সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিকটিকি পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক–ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণভরে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন করে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল! কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্তরথীর সপ্ত–প্রহরণে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি?

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তারা আমার লেখার ভক্ত!

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজ্ঞে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হলো?—বহু কণ্ঠের হুংকার উঠল, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাতত আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু–দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি?

আবার নেপথ্যে শোনা গেল,—তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠারক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কবুল করতে দেরি লাগবে না।

দেখাই যাক ...

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতই এ ধোঁয়া–বাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁয়া ছাড়িনি—না উনুনের, না সিগারেটের। ভেবেছিলাম সম্রাটে–সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু হাতিতে–হাতিতে লড়াই হলেও নলখাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ায় কোনো পৌরুষ নেই...।

পলিটিক্সের পক্ষকে যাঁরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে—বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির রক্ষা করে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য করে। কারণ তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে। এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ করে থাকি বলেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে বেছেই বাঁশ ছোঁড়া হচ্ছে—বাণনয়!

অবশ্য, সে-বাঁশে বাঁশির মতো গোটাকতক ফুটো করে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশি নয়—বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে, দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানি মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা তো বলা দুষ্কর ...

আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু-বধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন—এইটেই এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি তো নিজেও টুপি-পায়জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ করে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু-বংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি তো টুপি-পায়জামা-শেরওয়ানি-দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই—তবু নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে নাহয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির-পেশকার-উকিল-মোক্তারকে কী বলব?

কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালিকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে—'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা

খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। উতারো ঘোমটা আমি লিখলে হয়তো সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সংগীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা তো কেউ অস্বীকার করবে না। ওই একটু ভালো শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিনদেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পিছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিকি রঙ দেওয়ার জন্য নয়। হয়তো কবি ও-দুটোর একটারও রঙ আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'খুন' নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলংকারই তো মুসলমানি ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায় 'কালার-বক্সে' (Colour box-এ) এবং তা 'খুন হওয়া' ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন-খারাবি হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গান আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে—'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার', ও করা চলত। চলত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ওই রকম ন্যাশনাল সংগীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্তখারাবি'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' নাহয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু ওতে 'রাগ' মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না তেমনি 'রক্ত'ও ফোটে না—নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুনখুনি' খেলি না, কিন্তু 'খুনসুড়ি' হয়তো করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গির সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্যসভায় ভিড় না করে হিন্দুসভারই মেম্বার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নতুন শব্দভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু-সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জমে জমে ওর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নইলে আরবি-ফারসি শব্দের মোহ তো আমার আজকের নয় এবং কবিগুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন তো কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে!

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ওই নোংরা লোকগুলোই, যারা রাতদিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত-সুন্দর মনকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করে তুলছে? আর আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু?

কবি-গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ওই দারিদ্র্য ব্যতীত হয়তো আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনোদিন আমাদের মতো সাহিত্যিকের

কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়তো তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হত না তাতে—নইলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পা

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবিগুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই।

ওঁর আমাদের উদ্দেশ্য করে আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি। এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়তো আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনি।

কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন-লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়—লক্ষ্মীর কৃপায় কবিগুরুর তা জানা নেই। ভগবান করুন, তাঁকে যেন জানতে না হয়। কবিগুরু কোনোদিন আমাদের মতো সাহিত্যিকের কুটিরে পদার্পণ করেননি—হয়তো তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হত না তাতে—নইলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবনযাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন-মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে বসে সর্বদাই মন খঁতখুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। বাইরের দৈন্য-অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবি-গুরুর কাছেও শুধু ওই দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ-লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীনভক্ত তীর্থযাত্রা করতে পারল না বলে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তাহলে এই পোড়াকপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে।

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয় সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ওই নির্মমতাটাই সইবে না।

কবিগুরুর চরণে,—ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন—যদি আমাদের দোষত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিত বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে তাঁকে তাদেরই বাহন হতে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায়, বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন—রবিলোক—কাদা-ছোঁড়াছুড়ির বহু ঊর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র 'শনিবারের চিঠি' ওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দিন আর যাই করুন (জানি না এ সংবাদ সত্য কিনা) ওই দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি

করতে পারেননি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরি করে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথেপথে ঘুরে বেড়ায় হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ওই মঠে—ফ্রি অব চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, মরে কুকুর হয়েছে। শুনলাম ওই মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ওই গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিলাম, 'শরৎ-দা সত্যিই একজন মহাপুরুষ।' সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতোই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি করে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।

আজ তাই একটিমাত্র প্রার্থনা,—যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব।

বর্ষারম্ভে

'বুলবুল'-এর চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব এল। বাংলাদেশে সাপ্তাহিক, মাসিক সবরকম পত্রেরই পরমায়ু বৃক্ষপত্রেরই মতো খুব জোর এক বৎসর। এদেশে সাহিত্য-পত্রিকার মৃত্যুর হার বাঙালি শিশুর চেয়েও অধিক। 'বুলবুল' এখন শুধু যে চলছে তা নয়, তার মুখে বাণীও ফুটেছে—আর সে বাণী আধো আধো নয়। তার চলার ভাষায় কোথাও আর জড়তা নেই। আজ তার এই জন্মোৎসবে আমার লেখা কবচ-তাবিজের প্রয়োজন ছিল না, তবু এঁদের শুধু এঁদের নয়, অনেকেরই বিশ্বাস যে সাহিত্য ছেড়ে এসে যার চর্চা করছি তা সংগীত নয়—জ্যোতিষ এবং অকাল্ট সায়েন্স। সাহিত্যিক সাহিত্য ছেড়ে গোরুর গাড়ি চালিয়েছেন হয়তো তারও নজির দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু সাহিত্যিক হাত দেখে, কোষ্ঠী করে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করছে—এ বোধ হয় শোনা যায়নি। পুরুষের দশ দশা, কিন্তু অপৌরুষ-সম্পন্ন সাহিত্যিকের দশ দশে একশো দশা।

কোনো সাহিত্যিক-উৎসবে আমার আমন্ত্রণ অপরাধ, হয়তো তার চেয়েও বেশি। কেননা, আমি ধর্মভ্রষ্ট, সাহিত্য-সমাজের পতিত। যখন সাদর আমন্ত্রণ আসে এই কবর থেকে উঠে ফেলে-আসা আনন্দ-নিকেতনে ফিরে যাওয়ার, তখন খুব কষ্ট হয়, বড় বেদনা পাই। আমার মৃত সাহিত্য-দেহকে যথেষ্টরও অধিক মাটি চাপা দিতে কসুর করিনি, তবু তাকে নিয়ে আমার বন্ধুরা টানাটানি করেন, কেউ কেউ দয়া করে আঘাতও

করেন। উপায় নেই। মৃত-লোক নাকি মিডিয়াম ছাড়া কথা বলতে পারে না। আজ যে কথা বলছি, তা মিডিয়ামের মারফতই মনে করবেন। অপরিমাণ শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্যকে আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি, সেই বিসর্জনের ঘাটে এই প্রেত-লোকচারীকে ডেকে যেন বেদনা না দেন, আজ বলবার অবকাশ পেয়ে বন্ধুদের কাছে সেই নিবেদন জানিয়ে রাখি। 'বুলবুল'-এর সাথে আমার স্বগত প্রিয়তম আত্মজের স্মৃতিবিজড়িত। এই বুলবুলিস্তানের গুল-বনে আমার এমন কোনো দান নেই, যাতে এর একটি কুসুম বিকাশেরও সহায়তা করেছে, তবু ওর নামের জন্যই ওর উপর আমার হৃদয়ের টান নিত্য-জোয়ারের মতো।

'বুলবুল' সাহিত্যে—শিল্পে তাজা-বতাজার গান শুনিয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মন্ত্র-সংগীত গেয়েছে। তার কণ্ঠে আরো বহু বৎসর এই মিলনের গান আনন্দের সুর ঝংকৃত হোক, 'বুলবুল' শতায়ু হোক, এই প্রার্থনা।

আজ চাই কি

আজ চাই সারা ভারতজোড়া একটা বিরাট ওলট-পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শ্মশানভূমিতে 'শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা' কাব্যকুঞ্জের মধু গুঞ্জন শোভা পায় না; সে নির্লজ্জ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মতো প্রাণে এসে বেঁধে। আজ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার তর্জন, দুর্দম দুর্মদ উচ্চৈঃশ্রব ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণউন্মাদ আর তাদের হ্রেষা-বৃংহনের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ। আজ অলক-তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধকধক জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মতো ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক পরতে হবে। আজ কোমল কুসুমমালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিথ্যাচারী অসুরের অস্থি-কপালের মালা প্রমত্ত বিক্রমে স্ফীত বক্ষে দোলাতে হবে। এ শ্মশানে আজ সবার মুখে স্তিমিত মধুর হাসি নিভে গিয়ে দেখা দিক এক বিকট মৃত্যুকরাল রক্তলোলুপ দুর্নিবার অধর্ম-বিদ্বেষ। আজ অবিচার-কদাচারে ভরা এই বিলাস-আলয়ের কেলি-কুঞ্জে যমরাজ তাঁর যত সব হিংস্র শৃগাল-কুকুর-শকুনি-গৃধিনীকে একবারে বল্গা আলগা দিয়ে লেলিয়ে দিন। এই মোহ-সুপ্ত মরণ-মগ্ন জাতির বুকের উপরে প্রেত-পিশাচের তাণ্ডব চলতে থাকুক। আজ মিথ্যার সকল সন্ধি, গ্রন্থি ছিন্ন বিদীর্ণ হোক। মিথ্যা-মদিরার সব পেয়ালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাক, শয়তানের আরামের আসর হতভম্ব হোক, সারা দেশটা ভরা আজ, এক বিকট উন্মাদলীলা, শুধু মতিচ্ছন্নের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকান-পাট ঘর-সংসার সাজ-সরঞ্জাম সকলের মাঝে এর বিরাট ভণ্ডামি, ধর্মের নামে ফাঁকিবাজি। ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ করে কেবল কপটতার, প্রবঞ্চনার, পুণ্য লৌকিকতার বহর জাহির করে, বিধাতার বিশ্বধ্বংসী বজ্রনিষ্ঠুর আঘাতে তাদের অহংকারকে চূর্ণ, নিষ্পেষিত করে

না? এ অন্যায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? নারায়ণ তাঁর অনন্ত শয্যায় আর কতকাল নিদ্রিত থাকবেন? এ সুন্দরী ধরিত্রী যে পাপ-রাক্ষসের দুর্গন্ধ ক্লেদ বিষ্ঠায় জঘন্য নরকে পরিণত হল, ধর্মধ্বজী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য বিষবহ্নি উদগার করে বাসুকি কি তার সহস্র জিহবা লকলকিয়ে ছুটে আসবে না? আজ কি তার ধৈর্য শেষ সীমায় পৌছায় নাই? আজ সাগর-ভূধর-সংসার-কানন-মরু দলিত-মথিত করে আসা চাই মহা-প্রলয়ের মহা-আলোড়ন। ভারতের জীবনের অণু-পরমাণু আজ পচা-গলা বিষবিষ্ঠার বাসা হয়েছে; আজ পরিপূর্ণ সৃষ্টির আয়োজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে। এই সত্যযজ্ঞে সকল মিথ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ভস্ম না করতে পারলে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। অটল সাধকের বক্ষক্ষারিত যজ্ঞ-হবিতে এ-দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না; হলে পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হলে তাতে দেব-জীবনের অভিনব সৃষ্টি জেগে উঠবে না। সৃষ্টির বাঁশরির আকুল করা প্রেরণা সেই দিনই আমাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করবে, যেদিন মহেশের ডম্বরু-বিষাণের শব্দে ভীত-ত্রস্ত হয়ে ভণ্ডামি, ন্যাকামি, অবিচার, অন্যাচারের ছায়া-মূর্তি পর্যন্ত এদেশের জীবনভূমিতে উঁকি মারতে সাহস পাবে না।

আজ চাই, ভরাট-জমাট জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ, সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও কোনো জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা না থাকে। আজ পথের বাধা পাষাণ অটল হিমাচলের মতো বজ্রদৃঢ় হলেও সত্য-সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে। অমৃতের সন্ধানী যে ভগবৎশক্তি যার শিরায় শিরায় অমিত বীর্যের অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত করছে, তার বল-দর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত-কম্পমান হবেই হবে। তার রোষ-কটাক্ষের সম্মুখে অবিদ্যাজনিত সব ভয় বিতাড়িত হবে। সমাজধর্মের দুরহঙ্কারে উচ্চশির ভুলুণ্ঠিত হবে, এ হতেই হবে। সত্য ও মুক্তির জয়রথের যাত্রাপথ রোধ করতে পারে এমন কোনো যক্ষদক্ষ দানবের নাই। সত্য-সাধককে পথভ্রষ্ট করতে পারে এমন গন্ধর্ব-কিন্নরের মায়া এ দুনিয়ায় নাই। যে সত্যের ভান এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দুর্দিনের তরে আপন প্রভাব-মহিমা বিস্তার করে দুর্দিনেই নিজের বোনা জালে, নিজের গড়া শিকলে আবদ্ধ, পঙ্গু ও অবসন্ন হয়ে পড়ত, আজ তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজ ওই নেবে আসছে ভারতের বিশাল জীবনের পরে পরিপূর্ণ সত্যমুক্তির আলোকপাত। আর তারই স্পর্শে তাতে জ্বলে উঠবে বিচিত্র নবসৃষ্টির অফুরন্ত আশা ও আনন্দ। আজ মনকে আঁখি ঠেরে ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে পারা যাবে না। আজ রাষ্ট্রে যারা অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী তাদের সমাজ-ধর্ম ও মুক্তি ব্যাহত থাকলে বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে তাদের যে লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হবেই হবে। সমাজ-ধর্মে যাঁরা মুক্তির কোনো ছেদ বা সীমা মানতে চান না, তাঁরা যদি এই বিরাট দেশের বুকের উপর রাষ্ট্রপরাধীনতার রাক্ষসীকে বসে বসে রক্ত শুষতে দেন, সে অপরাধে তাঁদের মার্জনা নেই। কোথাও মিথ্যা-অন্যায়ের সাথে মাঝপথে রফা হতে পারবে না, আজ সকল ভারত-মাতার বীর সন্তানকে বুক ঠুকে হেঁকে নিঃসঙ্কোচে এই সত্য প্রচার করতে হবে। মনের কোণে বসে যদি কোনো ছিঁচকাঁদুনি সংস্কার-বুড়ি তোমার আঁচল ধরে পিছনে টেনে রাখতে চায়, তবে তাকে নির্মমভাবে লাথি মেরে তোমার জীবন-গৃহের চতুঃসীমা হতে

বাহির করে দাও। ওগো আমার ওস্তাদ চাষি, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলনের আকাঙ্ক্ষা যদি করে থাকো, তাহলে তোমার সেখানে আবর্জনা কণ্টক দুষ্টকীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে তো ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নবজীবনের পরিপুষ্ট ফসল। সকলের শাসনের দায়িত্ব যদি সত্যই হেয় বলে বুঝে থাক, যদি তার পাষাণ-চাপে ফাঁপর হয়ে হাঁপিয়ে উঠে থাক, তবে তুমি কোনো লজ্জায় নিজের ঘরের অত্যাচারের অধীনতা মাথা পেতে নিচ্ছে? এই পরতন্ত্রতার হীনতা হতে না এড়ালে তোমার স্বর্গ নেই, আছে বীভৎস নরক। এ তুমি স্থির জেনো, মুক্তির দিশারি যদি তুমি হয়ে থাক, হতে হবে তোমায় বৃহতের ও মহতের পূজারী। তোমার দেবতার সৌন্দর্য-শক্তি-মহিমা অনাদি অনন্ত, কোনো গুরু-পুরোহিতের মন্ত্রশাস্ত্রের নিগড়ে সে বিরাট পুরুষ বাধা পড়ে নেই। সত্যের স্বরূপ জানাবার মতো আলো তোমার মাঝে আছে।

সাধনার রুদ্রবহ্নি চারিদিকে জ্বালিয়ে তুলে তুমি সকল মিথ্যার অপবাদের দড়াদড়ি পুড়িয়ে ফেলো—জগজ্জয়ী শক্তি তোমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হবে, অনন্ত জ্ঞান ও অটল অফুরন্ত প্রেম তোমার দৃষ্টির ঝাপসা কাটিয়ে দেবে, তোমার প্রাণের শতদলকে বিকশিত করবে। ভাঙাগড়া কোনোটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না, যে গড়তে যাচ্ছে সে যদি না জানে কতখানি জীর্ণ অকর্মণ্য হয়েছে তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারত চোখের পলকে ধ্বসে পড়বে। তাই দেশের সেই সঙ্গে নিজের যাঁরা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তাঁদের ভাঙবার বেলায় মনে কোনো দুর্বলতার স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হয়েছে তার এক চুলও যদি ভাঙতে বাকি থাকে তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে প্রায় ষোলো আনা ঘুণ ধরে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধ্বংসের নেশায় যতই মত্ত হন ততই মঙ্গল। আজ রুষে আসুক কালবৈশাখীর উন্মাদ ঝঞ্ঝা রক্ত-পাথারের অবারিত স্রোতে অযুত ফণা বিস্তার করে, আজ সব অগ্নিবাণ নাগ-নাগিনী বিপুল উল্লাসে বিচরণ করুক। এই প্রলয়-পয়োধিজলে মিথ্যার সৌধশীর্ষ ডুবে যাক। তবেই আবার অনন্ত জীবনের সহস্র দলের উপর বেদ-উদ্ধারণ নারায়ণের আবির্ভাব হবে।

আমার সুন্দর

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু' 'লাঙল' 'গণবাণী'তে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল ; আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন হক সাহেবের দৈনিক পত্র 'নবযুগে' কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই ; কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, অজস্র অর্থ, যশ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি রাজবন্দিদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম শৃঙ্খল-বন্ধন ('লিঙ্ক-ফেটার্স', 'বার-ফেটার্স, 'বার-ফেটার্স', 'ক্রস-ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব-জ্বালা যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মতো নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেননি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে-পায়ে ; জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট-বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হলো, এই আমার মা। তাঁর শ্যামস্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাংলাদেশ পরিক্রমণ করেছি ; আমি তরুণদের সাথে মিশেছি—বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে। তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিন্তু কোনো দিন আমার নেতা হবার লোভ হয়নি, আজো সে লোভ হয় না। আমার কেবলই যেন মনে হতো, আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজো নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মতো ছিল সে সুন্দর, মমতায় মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মতো জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে

আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান-অভিমান করত। যে সুর শেখাতাম, সে সুর দুবার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, 'বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে।' হঠাৎ আমার দেহে-মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের, বেদনার ঢেউ দুলে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্ত-রোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল।

আমার সুন্দর-পৃথিবীর আলো যেন এক নিমিষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর!

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু-সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগল, 'সংহার করো! ধ্বংস করো! বিনাশ করো!' কিন্তু শক্তি কোথায় পাই! কোথায়, কোনো পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাধী এসে বললেন—'ধ্যান করো, দেখতে পাবে।' আমি বললাম, 'ধ্যান কি?' তিনি বললেন, 'একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।' এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর। মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। তাঁরা বলল, 'আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি, আমাদের সাথে পথ চলো, তাহলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তাহলে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে।' আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, 'পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।' কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, 'কোরান পড়ো; ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।' আমি নমস্কার করে বললাম, 'তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?' তিনি আমায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্বচেতনা—প্রিকনশ্যাসনেস।' ইংরাজিতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্বচেতনার অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, 'আবার তোমার সাথে দেখা হবে?' তিনি বললেন, 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি, আমি যে তোমার বন্ধু!' তিনি চলে গেলেন। সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু শিরায়-শিরায় অণু-পরমাণুতে সেই স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্পমালার মতো হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোনো বজ্রনাদে ও তড়িৎ-লেখার তলোয়ার বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো ঊর্ধ্বে

যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতি। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতি সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোনো করাল ভয়ঙ্কর-শক্তি আমায় নিচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার মাতৃ-ঋণ—তোমার স্বদেশের ঋণ-শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?' আমি বললুম, 'সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন।' সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল বেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বলল, 'সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মতো অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানব-ঋণ, তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।' আমি বললাম, 'তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত শয়তান।' সে হেসে বলল, 'হাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরানে কি পড়ো নাই, আমার ঋণ শোধ না করে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না!' অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মতো প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ংকর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধপঙ্গু করে শয্যাশায়ী করে দিলেন! অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ-দেনার রজ্জু বন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম! আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল! আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল! আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে-চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈন্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললাম, 'আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ চাই না, ভগবান চাই না। এইসব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন! আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে! আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।'

ভয়ংকর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, 'এ তোমার অভিনয়!' সে বলল, 'এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।' চেয়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, 'কেন তুমি ঝরলে?' ফুল বললে, 'আমার মা-লতাকে জিজ্ঞাসা করো, আমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে

পড়লাম।' আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর করলাম। ফুল বলল, 'আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব।' এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল-সন্ধ্যার অরুণ-কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিতা ঝর্না, তটিনী, কূলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মতো সখার মতো, কথা কইল। আমায় 'আমার সুন্দর' বলে ডাকল।

সহসা এল উর্ধ্ব-গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ় নীলকৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নিবর্ণা দামিনী-নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চারণ আমার বাহিরে-অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে, সুর হয়ে আবির্ভূত হলো—'এল রে প্রলয়ঙ্কর সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘমালা জড়ায়ে !' আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কে—কে ?' মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, 'তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।'

আমি তখন বললাম, 'তুমি তো আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে ?' সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে, তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দুধারি তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ঘিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ—সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমরা সৃষ্টিসুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাঁধ-না-মানা বেগসহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে উর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে ; সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার।'

শুনে আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি করে বললাম, 'তবে দাও বন্ধু আমার দুধারি তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও আমায় অসুর-দৈত্য-সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি ! দাও আমায় ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব-সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই। আর কিছু দিন দেরি আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মতো জড়িয়ে ধরবে, তার না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মতো ঝরে পড়বে।' আমি বললাম, 'তথাস্তু!' প্রলয়-সুন্দর বললেন, 'সাধু! সাধু! তথাস্তু!'

সত্যবাণী

ইসলাম জাগো! মুসলিম জাগো। আল্লাহ তোমার একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমার সেই ধর্মের, সেই উপাসনার মহাবাণী,—সত্য তোমার ভূষণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য,—তুমি জাগো। মুক্ত বিশ্বের বন্যশিশু তুমি, তোমায় পোষ মানায় কে? দুরন্ত চঞ্চলতা, দুর্দমনীয় বেগ, ছায়ানটের নৃত্য-রাগ তোমার রক্তে, তোমাকে থামায় কে? উষ্ণ তোমার খুন, মস্ত তোমার জিগর, দারাজ তোমার দিল, তোমাকে রুখে কে? পাষাণ কবাট তোমার বক্ষ, লৌহ তোমার পঞ্জর, অজেয় তোমার বাহু—তোমায় মারে কে? জন্ম তোমার আরবের মহামরুতে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার পর্বতগুহায়, উদাত্ত তোমার বিপুল বাণীর প্রথম উদ্বোধন 'কোহ্-ই তুরের' নাঙ্গা শিখরে,—তুমি অমর, তুমি চির জাগ্রত। 'আল্লাহু আকবর' তোমার ওংকার, আলি তোমার হুংকার, তুমি অজেয়! বীর তুমি, তোমার চিরন্তন মুক্তি, শাশ্বত বন্ধনহীনতা, 'আজাদির' কথা ভুলায় কে? তোমার অদম্য শক্তি, দুর্দমনীয় সাহস, তোমার বুকে খঞ্জর চালায় কে? ইসলাম ঘুমাইবার ধর্ম নয়, মুসলিম শির নত করিবার জাতি নয়। তোমার আদিম জন্মদিন হইতে তুমি বুক ফুলাইয়া, শির উচ্চ করিয়া দুর্লঙ্ঘ, মহাপর্বতের মতো দাঁড়াইয়া আছ, তোমার গগনচুম্বী শিখরে আকাশ ভরা তারার আলো, অর্ধচন্দ্রের প্রদীপ্ত প্রশান্তি জ্যোতি—তোমার যে মহাগৌরবের কথা বিশ্বে চির-মহিমান্বিত। মনে পড়ে কি, তোমার সেই রক্ত-পতাকা যাহা বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়িয়াছিল,—তোমার সেই শক্তি যাহা দুনিয়া মথিত আলোড়িত করিয়াছিল? বলো বীর, বলো আজ তোমার সে শক্তি কোথায়? বলো ভীরু, তোমার সে প্রচণ্ড উগ্র মহাশক্তিকে কে পদানত করিল? উত্তর দাও! তোমায় আমি আল্লার নামে আহ্বান করিতেছি, উত্তর দাও! তোমার অপমান কেহ কখনো করিতে পারে নাই, ইসলাম অবমাননা সহে নাই। তুমি সত্য, ইসলাম সত্য, তোমার-আমার বা ইসলামের অপমান যে সত্যের অপমান। তাহা যে সহ্য করে, সে ভীরু—সে ক্ষুদ্র! যেদিন তুমি তোমার উদারবাণী মহাশিক্ষা ভুলিয়া স্বাধীনতার বদলে অধীনতার ছায়া মাড়াইতে গিয়াছ সেই দিনই তোমার শিরে মিথ্যার, দুশমনের ভীমপ্রহরণ বাজিয়াছে।

ইসলাম এক মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো নিকট শির নোয়ায় না। তোমার চির-উচ্চ চির-অটল ঋজু সেই শির আনত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাই আজ তুমি আঘাত পাইয়াছ, তাই তোমার বক্ষে বজ্রবেদন, শক্তিশেল বাজিয়াছে! যদি আঘাতই খাইয়াছ, যদি আজ এমন করিয়া গভীর বেদনাই তোমার মর্মে বাজিয়াছে, যদি এই প্রথম অবমানিত হইয়াছ, তবে তোমার লাঞ্ছিত সত্য, ক্ষুব্ধ শক্তি আবার উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উদ্বেলিত হইয়া উঠুক! বলো, ইসলাম ভিক্ষা করে না, যাচ্ঞা করে না। বল, দুর্বলতা আমাদের ধর্মে নাই! বলো, আমাদের প্রাপ্য আমাদের মুক্তি আমরা নিজের শক্তিতে লাভ করিব!... তোমার বাঁধে ভাঙন ধরিয়াছে, তোমাকে ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। তাই আজ আমরা আমাদের সারা বিশ্বের লাঞ্ছিত বিক্ষুব্ধ শক্তি লইয়া এই মুক্ত মহা-গগন-তলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' এই মুক্ত গগনতল তোমার মহাতীর্থস্থান-আরাফাতের ময়দান অপেক্ষাও পবিত্র। এইখানে গৃহহীন পথহারা নিপীড়িত মুসলিম সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব পাইয়াছে, ঈদের দিনের মতো পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, বুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া মুসলিম, আবার বলো, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও, কোথাও তোমার মাথা গুঁজিবার ঠাই না থাকে, কুছ পরোয়া নেই, তোমার মাথা নত করিও না। আবার সকলি পাইবে। মুসলিম হীন, এ ঘৃণার কথা শুনিবার পূর্বে কর্ণরন্ধ্রে সিসা ঢালিয়া বধির হইয়া যাও! তোমাদের এই 'ইখওয়াৎ'কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অন্তরের সত্য স্বাধীন শক্তিকে যেন কোনোদিন বিসর্জন না দিই। তোমার বীর ভাইগুলি ঐ যে তোমার দক্ষিণপার্শ্বে ইসলামের এই শাশ্বত সত্য রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, সেই শহিদায়েন নব্য তুর্কি-তরুণদের দেখো, আর গৌরবে তোমার বক্ষ ভরিয়া উঠুক। তাহাদের পানে তাকাও, তাহাদের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা শোনো—তাহাদের হুংকারে তোমার হিম-শীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বহিয়া যাক তোমার শিরায় শিরায়। মেঘ-মুক্ত প্রাবৃট-মধ্যাহ্নের রক্ত ভাস্কর তোমার বিপুল ললাটের ভাস্বর রাজটিকা হউক। তুমি অমর হও! তুমি স্বাধীন হও! তোমার জয় হউক।

ব্যর্থতার ব্যথা

পৃথিবী তাহার ভোগ-সম্ভার চোখের সম্মুখে লইয়া জাগিয়া আছে অনন্তকাল ধরিয়া।

বিপুল ক্ষুধার তীব্র তাড়নে ছুটিয়া চলি। দুই হাত পাতিয়া আমরা ক্ষুধার অন্নভিক্ষা চাই। ধরণী মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া যায়।

ধীরে ধীরে আঘাত আসে, বেদনা আসে, দৈন্য-দুঃখ-দারিদ্রের তাণ্ডব লীলা চলে জীবনের শ্মশানে প্রাঙ্গণে।

প্রেম ভালবাসা আত্মীয়তা বান্ধবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে জীবনব্যাপী বঞ্চনার নিষ্ঠুর পরিহাস!

অন্তর-জগতে কাঁদিয়া মরে যুগ-যুগান্তরে মথিত মানুষ। অত্যাচার অনশন-নিষ্পেষণের মাঝেও প্রাণ চায় জীবনের তৃপ্তি।

* * *

জ্ঞানী তাহার দানে জগৎকে প্রভাবান্বিত করিল। কবির দানে ধরিত্রীর প্রাণ সরস হইয়া উঠিল। ধনী তাহার সর্বস্ব দান করিয়া প্রতিদানে অমর হইয়া রহিল।

শত শতাব্দী ধরিয়া আমি দান করিয়া আসিলাম—শরীরের রক্ত, দেহের শক্তি, এক কথায় সমস্ত জীবনটাকে। প্রতিদানে পাইলাম নিপীড়ন, বন্ধন, বঞ্চনা, অপমান আর বুকভরা বেদনা!

অন্ধকার রাত্রি। ঊর্ধ্বে বহু ঊর্ধ্বে ম্লান নক্ষত্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম : উঃ কি অকরুণ এই জীবন। সুখ শান্তি আনন্দ কিছুই নাই—আছে কেবল রিক্ততার হাহাকার!

প্রাণের গহন অন্ধকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল : 'মিথ্যা কথা! তোমার ব্যথা, তোমার ব্যর্থতা আজ সার্থকতার পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে জেগেছে। প্রতীচীর স্বার্থ-মন্দির ভেঙে পড়েছে; মিশরের পিরামিড কেঁপে উঠেছে; চীনের প্রাচীরে ভাঙন লেগেছে; হিমালয় দুলে উঠেছে। তোমার ব্যথার ভিতর দিয়ে সত্যের বাণী এসেছে :—মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব-প্রয়োজনের সম-অধিকার।'

কি আশ্চর্য! আমার এই সার্থকতা বেদনার আড়ালে কেমন করিয়া লুকাইয়াছিল।

হে আমার জীবনের ব্যথা। তোমায় নমস্কার।

গণবাণী
১৯২৭

ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি

প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি-মঞ্জুষায় সে কথা হয়তো আজ ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সাল, শ্রাবণ মাস—'রাতের ভালে অলক্ষণের তিলক-রেখা'র মতোই 'ধূমকেতুর প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধুলোট-উৎসব পুরা-মাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গেলে পুলিশের ধরে না—'বন্দে মাতরম', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' রব আকাশে-বাতাসে আর ধরে না। মার খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে কিল ধরিয়া গিয়াছে। মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ! পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আজ মারে না; পলাইয়া যায়।

ইহারাই মাঝে সর্বপ্রথম প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা অপনেতা হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দুরবিন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়-তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন

আমার উপরে শিব ঠাকুরের আদেশ হইল, এই আনন্দ-রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন 'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজ-প্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

আমার ভয় ছিল না আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ-বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়নাথ।

'ধূমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছিল কি না জানি না ; সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেতু' তাহাদের বাণী লইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের গৃহী আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়, ফণি তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথের দিশারি হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন-শীতল হইয়া যায়।

রুদ্রদেব আশীর্বাদ করিলেন, আমার কারা-শুদ্ধি হইয়া গেল। প্রয়োজনের আহ্বানে নটনাথের আদেশে আমি নিশানবর্দার হইয়াছিলাম। তাহারই আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধ বিমান-পথে হারাইয়া গিয়াছে।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক আবার 'ধূমকেতু'কে আহ্বান করিতেছে। কোনো রূপে 'ধূমকেতু'র উদয় হইবে জানি না। তবু আশা আছে, যে ধূর্জটির জটাজুটে 'ধূমকেতু' ময়ূর-পাখা, সেই ধূর্জটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ-যুগের প্রলয়েশ তাহাকে নবপথে চালিত করিবে। আমি ইহার অগ্নিশিখায় সমিধ জোগাইব মাত্র।

ধূমকেতু
৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮

ধর্ম ও কর্ম

যে স্বধর্মে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশের কোনো অধিকার নাই। আজ যাঁরা দেশের কর্মী বলে খ্যাত, তাঁদের অনেকেই অনধিকারী বলেই ক্ষেত্রে লাঙলই চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফলল না। সামান্য যা ফসল ফলল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী, সৈন্য পেলেন না। যিনি নিজে স্বাধীন হলেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে? যাঁর নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সত্তালাভ করেননি, তিনি কেমন করে লোভীকে তাড়াবেন, কোন শক্তিতে দৈত্য, অসুর, দানবকে সংহার করবেন? ধর্মভাব মানে এ নয় যে শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে সংসারকে যিনি মায়া বলে বিচার করলেন,

কর্ম, সংসার ও মায়ার স্রষ্টার তিনি বিচার করলেন। যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম যাঁর কোনো শরিক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তাঁর সৃষ্টির বিচার করবে কে? এই পলাতকের শাস্তি সঞ্চিত আছে। তবে মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে হয়, একেবারে পগার পার হয়ে গেলে চলবে না। সমুদ্রের জল আকাশে পালিয়ে যায় বলেই বৃষ্টিধারা হয়ে ঝরে পড়ে।

নবনীরদ পাহাড়ে পালিয়ে যায় বলেই নদীস্রোত হয়ে ফিরে আসে। এই উপরের দিকে উড়ে যাওয়া—অর্থাৎ আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা; আমারই ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহংকার, দ্বন্দ্বাতীত হলে—লোভ, অহংকার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মতো ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয় তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না, তাঁর অটল, ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ-ভালো দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ-অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তসবি অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি দুই-ই তাঁর সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত হয়েও ইনি ওই তিনগুণে নেমে বিপুল কর্ম করতে পারেন। এই সেনাপতি সাগরের মতো কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এঁরই আহ্বানে, এরই আকর্ষণে ছুটে আসে দেশ-দেশান্তর থেকে স্রোতস্বিনী দুর্নিবার অনিরুদ্ধ প্রবাহ নিয়ে।

ত্যাগ ও ভোগ—দুয়েরই প্রয়োজন আছে জীবনে। যে ভোগের স্বাদ পেল না, তার ত্যাগের সাধ জাগে না। ক্ষুধিত উপবাসী জনগণের মধ্যে এই সেনাপতি, অগ্রনায়ক আগে প্রবল ভোগের তৃষ্ণা জাগান। অবিশ্বাসী নিদ্রাতুর জনগণের বুকে রাজসিক শক্তি জাগিয়ে তাদের তামসিক জড়তা নৈরাশ্যকে দূর করেন। রাজসিক শক্তিকে একমাত্র সাত্ত্বিকী শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ভগ্নতন্দ্রা বিপুল গণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন যে-অগ্রনায়কের কথা বলেছি—তিনি।

জনগণকে শুধু ঊর্ধ্বে কথা বললে চলবে না। তাদের বুকে ভালো খাবার, ভালো পরবার উদগ্র তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই জাগ্রত ক্ষুধিত সিংহ ও সুন্দর বনের বাঘের দল যাতে উৎপাত না করে, তার ভার নেবেন সেই মায়াবী অগ্রনায়ক। যিনি এই ভীষণ শক্তিকে জাগাবেন, তাকে সংযত করার শক্তি যেন তাঁর থাকে। নইলে জগৎ আবার পশ্চিমের রাজসিক উন্মত্ততায় রক্ত-পঙ্কিল হয়ে উঠবে। নিজেরাই হানাহানি করে মরবে।

এদের ভোগের ক্ষুধাও জাগাতে হবে, ত্যাগের আনন্দে রসের তৃষ্ণাও জাগাতে হবে।

আমি একবার 'নিউমার্কেটে'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি, এক ভদ্রলোকের নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত, আর দুই হাতের এক হাতে একগোছা রজনীগন্ধা ও আর একহাতে দুইটি রাম-পাখি—মুরগি। আমার অত্যন্ত আনন্দ হলো, তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম : 'ফেয়ার ও ফাউলের' এমন 'কম্বিনেশন'—সঙ্গতি আর দেখি নাই! ভদ্রলোকও আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন : 'নিত্য আপনার হাতে ফুল, পাতে মুরগি পড়ুক।'

মুরগির সাথে রজনীগন্ধার তৃষ্ণাও থাকবে?

বড় ত্যাগ তাঁর জন্য, যিনি সকলকে বড় করবেন। জনগণকে তাই বলে ধর্মের আশ্রয়চ্যুত করবার অধিকার কারুর নেই। এ অধিকারচ্যুত করতে চাইবেন যিনি, তিনি মানবের নিত্য কল্যাণের, শান্তির শত্রু। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ রাজসিক শক্তি দিতে পারে না। মানুষ পেট ভরে খেয়ে, গা-ভরা বস্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় প্রেম, আনন্দ, গান, ফুলের গন্ধ, চাঁদের জ্যোৎস্না। যদি শোকে সান্ত্বনা দিতে না পারেন, কলহ-বিদ্বেষ দূর করে সাম্য আনতে না পারেন, আত্মঘাতী লোভ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে তিনি অগ্রনায়ক নন। ধর্ম ও কর্মের যোগসূত্র যদি মানুষ না বাঁধা পড়ে, তাহলে মানুষকে এমনি চিরদিন কাঁদতে হবে।

'লাঙল'

যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালি মাথায় করে মাটি বিক্রি করে, সেই আজব শহর কলিকাতায় 'লাঙল' চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করছেন। কিন্তু সেই পাষাণ শহরেই আমরা 'লাঙল' নিয়ে বেরুলাম। এই পাষাণের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র-স্রোত হিমালয়ে আটকে গেলে হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নাবিয়ে ছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর শ্যামল করে কত তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 'লাঙলবন্ধ' আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন আজ নেতাদের পাষাণ-পারিপার্শ্বিকে আটকে গেছে তাই আজ আবার হলধরের ডাক পড়ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনে শহরের সৃষ্টি হয়ে পল্লিভূমি বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন এবং শোষণের সহায়তার যন্ত্রস্বরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ উৎসব রোগ-শোকের চাপে লুপ্ত হয়ে গেছে। শহরের বেকার বাঙালি আজ বুঝছে গ্রাম ছেড়ে এসে তার কি নিরুপায় অবস্থাই হয়েছে। জমিদার আর গ্রামের সকল কর্মের ত্রাণ-স্বরূপে উপস্থিত নন—তিনি শহরে এসে বাস করে মদমাংস মেয়েমানুষ মোটর মামলা এই পঞ্চম-কারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন। নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির স্বত্ব চলে যাচ্ছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে—কলকারখানায় কতক ঢুকে নিজেদের সর্বনাশ করছে—আর কতক নানা হীন উপায়ে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা করছে। দেশে চুরি, ডাকাতি ও বলাৎকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বেগুন তিন আনা সের এবং মাছ কেন দেড় টাকা সের হয়, তাই লোকে জিজ্ঞাসা করে। যে খেতের মালিক বা মাছ ধরে, তার অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে—জমিদার,

মহাজন, দালালের পেটেই লাভের বার আনা যাচ্ছে। কাজেই ক্রেতাকে দাম এত বেশি দিতে হচ্ছে।

জমিতে চাষির স্বত্ব নাই। যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয়েছে। উৎপন্নে প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি। কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বলছি স্বরাজ পেলে এই সমস্ত সমস্যা আপনিই দূর হবে।

এই 'স্বরাজ'টা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিচ্ছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা আর এটর্নি দিয়ে করতে চাই না—এবার নিজেদেরই বুঝতে হবে। মথুরার লীলা ঢের দেখেছি—আমাদের দেবতা যিনি তাঁকে বৃন্দাবনের শ্যামল মাঠে ফিরিয়ে আনতে চলেছি, তিনি রাখালগণের সখা, তিনি গোধন চরাতে ভালবাসেন। তিনি বেণু বাজিয়ে সকলকে পাগল করেন। যদি সেই দেবতার আবাহনে কেউ বাধা দেন, তবে আমাদের হলধর ঠাকুর তাঁকে রাখবেন না—লাঙলের আঘাতে তাঁকে মরতেই হবে।

'লাঙল' চালিয়ে যিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন, সেই জনক আমাদের গুরু। যিনি Producer(জনক) তিনিই ঋষি। তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ। আজ নবজনকের নূতন দর্শনে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। Distributor হিসাবে জনকয়েক ভদ্রলোকের স্থান সমাজে আছে। ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজের সেবা করার জন্যও লোকের প্রয়োজন। কবি চিত্রকর শিল্পী হিসাবেও স্রষ্টার স্থান আছে। কিন্তু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার ব্যবসাটা লোপ পাওয়া দরকার। শরীরের মধ্যস্থল বেশি স্ফীত হয়ে গেল শরীরটাই অচল হয়ে পড়বে। দুম্বার লেজ শরীর অপেক্ষা বড় হলে তখন লেজের মাংসে খেলে দুম্বারই উপকার।

হিন্দুর বর্ণবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিযোগিতাকে এড়িয়ে শ্রমবিভাগ-নীতি মেনে পুরুষানুক্রমে একই চর্চা করে সমাজের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল। এখন কিন্তু তালগাছহীন তালপুকুর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বর্ণ-বিভাগ।

ব্রাহ্মণ পাদরির রাজত্ব গিয়াছে। গুরু-পুরোহিত, খলিফা, পোপ নির্বংশ প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধ্বসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়—শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালে মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান করলাম। লাঙল নবযুগের নব-দেবতা। জয় লাঙলের জয়—জয় লাঙলের দেবতার জয়॥

লাঙল
প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা
১লা বৈশাখ ১৩৩২

পোলিটিকাল তুবড়িবাজি

কানপুরে বড়দিনের ছুটিতে All India Political Tubri Competition হয়ে গেল। জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য ৩০টি কনফারেন্স বসেছিল। নিখিল ভারতীয় প্রেত-তত্ত্ব সভা হতে আরম্ভ করে সোভিয়েট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই হট্টগোলের মধ্যে সুখের বিষয় শ্রমিক ও কৃষকের কথা সকলেই তুলেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী লাঙলের জয়গান করেছেন—

'The immemorial twin symbol of the plough and the spinning wheel is the central text of the teaching that shall liberate our unhappy peasantry from the crushing misery and terror of hunger, ignorance and disease.'

লাঙল এবং চরকাকে কেন্দ্র করে আমাদের পল্লি-সংগঠনের আয়োজন করতে হয়—লাঙলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট-সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হলে স্বরাজ আসতেই পারে না। তাই প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় সমস্ত নেতারা কি করেন, আমরা দেখবার জন্য উৎসুক আছি। যাঁরা বলেন স্বরাজ হলে ওসব ঠিক হবে—তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেন।

সাম্যবাদী-দলের কনফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুত শিঙ্গরভেলু ঠিকই বলেছেন যে, শ্রমিক ও কৃষকের সাহায্য ব্যতীত যে কংগ্রেস বলহীন এবং সে কংগ্রেসের দ্বারা স্বরাজ আসতে পারে না, তা গত পাঁচ বছরের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হয়ে গেছে। কেবল ১৯২১ সালে যখন গণ-ঐরাবত ত্যাগী রাজদুলাল মহাত্মাকে কাঁধে চড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল, তখন লর্ড রেডিং বলেছিলেন, 'Let us as equals, forgiving and forgetting the past, in a round table conference to devise a constitution for India.' তখন সমানে সমানে কোলাকুলি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর এখন এসেমব্লির সামান্য প্রার্থনার জবাব দিতেও গবর্মেন্ট প্রয়োজন বোধ করে না।

পণ্ডিত মতিলাল ভয় দেখিয়েছেন ফেব্রুয়ারির মধ্যে জবাব না দিলে স্বরাজীরা ব্যবস্থাপক সভা ত্যাগ করে সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র এবং কৈলাস হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তোলপাড় করবেন। তবে কাউন্সিলে পদগুলি যাতে শূন্য না হয়, কিংবা ফাঁকতালে আমলাতন্ত্র ট্যাক্স বাড়িয়ে না দেয়, সেজন্য সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হবেন। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স শেষ অস্ত্র হবে—কিন্তু সেটা যখন করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, তখন দেশকে তার জন্যে তৈরি করাই কাজ হবে। মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি direct action, আর বর্তমান কংগ্রেস-নীতির ভিত্তি constitutionalism—বিরোধ এইখানে, বিরোধ মতিলাল জয়াকর কেলকারে নয়। প্রথম জাতীয় নীতির মূলে শুধু জনসাধারণের সাহায্য চাই, দ্বিতয়ি নীতির মূলে এই বুর্জোয়া ভদ্র-সম্প্রদায়ের হাত। যে শক্তি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য সঞ্চিত হয়েছিল, মহাত্মা বারদৌলিতে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ অভ্যন্তরিক বাদ-বিসংবাদে সেই শক্তির

অপপ্রয়োগ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজা, নোচেঞ্জার প্রো-চেঞ্জার, এই সমস্ত দলাদলির মূলে ঐ একই কারণ। সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে আজ ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রুদ্রের এ রোষ কবে থামবে, জানি না।

কৃষক ও শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত মতিলালের মতলব দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেকশনে আবার দল বেঁধে কাউন্সিলে প্রবেশ করা? কিন্তু অতঃপর? মহাত্মার এক বৎসরের স্বরাজের ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি, আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি? পণ্ডিতজির রেজোলিউশন পড়ে আমাদের মনে হয় সেই লোকটার জলে ডোবার কথা। সে সংসার-জ্বালায় জ্বলেপুড়ে বিরক্ত হয়ে জলে ডুবে মরবে বলে ঠিক করল; কিন্তু ঘাটে যাওয়ার আগে গামছাখানি ও তেল চাইল। তেল-মাথা ও গামছার কথা যে না ভুলেছে, সে যে জলে ডুবে মরবে না এটা বেশ বোঝা যায়।

শুধু পোলিটিকাল তুবড়িবাজিতে কি হবে? কাগজে আমরা লিখতে পারি, দেশ কানপুরের দিকে চেয়ে আছে, Great speech, momentous session : কিন্তু এ-সবই অভিনয়ের শেষ রাত্রির বিজ্ঞাপনের মতো। দেশের জনসাধারণের মাথা কচ্ছপের মতো শরীরের ভিতর ঢুকে গেছে। এখন সেই মাথা বের করতে দেহটাকে কাটতে গেলে চলবে না। জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার স্বচ্ছন্দভাব ধারণ করবে। প্রতিদিনের যে অভাবে সে এমন হয়ে মরছে, জনসাধারণকে সেই অভাবের প্রতিকারের মধ্য দিয়ে আবার সজাগ করতে হবে। সে কঠিন সাধনার তারিখ নাই; ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৩ বা ফেব্রুয়ারি শেষ ১৯২৬-এর ভিতর তাকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না।

বৎসরান্তে কানপুরে আমাদের পোলিটিকাল চড়ক-পূজা শেষ হল। ফিরে এসে দুই-একজন বাদে নেতারা ওকালতি, ডাক্তারি, ব্যারিস্টারি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে মন দিবেন এবং যিনি বড় দয়ালু তিনি সপ্তাহান্তে হয়তো একএকবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন। কই দেশবন্ধুর মতো সেই সর্বগ্রাসী দেশপ্রেম, কই সেই জ্বালা? আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি, সঞ্চিত ধনের গাদায় বসে, অথবা পাবলিক ফাণ্ডের অপহরণে, অথবা প্রজার রক্ত শোষণ করে যে নিশ্চিন্ত আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন। যে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের সেবা করে সে নিশ্চয়ই উপায়হীন, কিংবা গবর্মেন্টের টাকা খায়। স্বরাজ-সাধনার শক্তিবলে আয়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ লোভীর মধুচক্রে পরিণত, পোলিটিকাল মোহন্তের দল রাজনীতির পুণ্য তীর্থে যথেচ্ছভাবে দীপ্যমান। নন্দী ভৃঙ্গীর দল তাদের শিঙা বাজিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে, শিবাদলের কোলাহলে শ্মশান-দেশ মুখরিত। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি আর ত্যাগ-সুরধুনীকে মর্ত্যে নিয়ে আসছেন না,—'শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতিতে আজ রোগশোকে মুহ্যমান নিস্তব্ধ দেশকে প্রাণবান বলে প্রতিভাত করছে।

আজ এই শব-সাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে—এস ভাই, তোমাদের মরণজয়ী পণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক। নেতাদের স্তোকবাক্যে ভুলো না—তোমাদের কাঁধে চড়ে যাঁরা নিজেদের উঁচু দেখান, সিন্দাবাদের নাবিকের সেই বোঝা ফেলে দাও। তুবড়িবাজি দেখে মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থেকো না—তোমার দুর্গম অমানিশার পথে ওই আলো কেবল চোখে ধাঁধা লাগায়। একটা পিস্তল বা বোমার আওয়াজে তুমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িও না—ওর চেয়ে ঢের বড় শক্তি তোমার অপেক্ষায় সঞ্চিত হয়ে আছে, তুমি নবযুগের রামের মতো সেই শক্তিকে পাষাণী অহল্যার ন্যায় প্রাণের স্পর্শে মুক্তিদান করো! গণআন্দোলনের চলমান শক্তি এই নিরস্ত্রীকৃত প্রাণহীনের দেশে বিপ্লবের বন্যা এনে দিক, যুগান্তরের সঞ্চিত জঞ্জাল সব ভেসে যাক।

জড় জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া হলো বেভুল
তথাপি পড়ে না পাগল শিবের মাথার ফুল!
বল সন্ন্যাসী, মুখ ফুটে বল,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল?
রক্ত-নয়ন ডুবিছে তপন না পেয়ে কূল।
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের মাথার ফুল!

লাঙল
প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা,
২৩শে পৌষ ১৩৩২

'গণবাণী' ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

[এই পত্রখানি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ দলের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী গোপাললাল সান্যাল মহাশয়কে লিখিত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সংখ্যা 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রী তারানাথ রায় 'তারা-রা' ছদ্মনামে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। তারই জবাবে কবি এই পত্রটি লেখেন।]

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,
আপনার (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের) ২০শে আগস্টের 'আত্মশক্তি'র 'পুস্তক-পরিচয়'-এ নতুন সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'গণবাণী' পুস্তক নয়, 'আত্মশক্তি'র পুস্তক-পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে পরিচিত হলেও, যেমন আত্মশক্তি আপনার কাগজ হলেও, ঐ সমালোচনাটা আপনার নয়।

ঐ 'পরিচয়' নিয়ে বলবার কথাটুকু আমারই ব্যক্তিগত, আমাদের কৃষক শ্রমিক দলের নয়। আশা করি, আপনার ঢাউস কাগজের একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবেন আমার বক্তব্যটুকু জানাতে। এ অনুরোধ করলাম এই সাহসে যে, আপনার সম্পাদিত পত্রিকাটি 'শুক্রবারের আত্মশক্তি', 'শনিবারের পত্র' নয়। হঠাৎ এ কথাটা বলার হেতু আছে। কেউ বলছিলেন, 'শনিবারের চিঠি' না-কি একীভূত হয়ে উঠেছে 'আত্মশক্তি'র সাথে। অবশ্য, আমার একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি, যদিও দু'তিনবারে আমার এইরূপ ভুল ধারণা করিয়ে দিয়েছেন আর কি। এরকম ধারণার আরও কারণ আছে। হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লাম ইটালির মুসোলিনি আর আফ্রিকার হাবসি রাজার ইয়ার্কি চলতে চলতে শেষে কি একরকম সম্বন্ধ পাকতে চলেছে। সেই ইয়ার্কিটা গুজব যে, হাবসি দেশটা ইটালির সাথে একীভূত (Incorporated) হয়ে যাচ্ছে। হবেও বা। এত সাদা Vs অত কালোয়, অত শীত Vs গ্রীষ্মের যদি আঁতাত হতে পারে, তবে শনিবারের পত্র শুক্রবারের পত্রিকাতেই বা বন্ধুত্ব হবে না কেন, একীভূত না হোক। আমরা আদার ব্যাপারি অত সব জাহাজের খবর নেওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই। তবে জানেন কি, 'খোশ খবরকা ঝুটা ভি আচ্ছা' বলে একটা প্রবাদ আছে, অর্থাৎ ওটাকে উলটিয়ে বললে ওর মানে হয় 'বুরা খবরকা সাচ্চা ভি না চা'। আপনার 'অরসিক রায়' এবং প্রবাসীর অশোকবাবুতে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল তখন ওটা ইয়ার্কির মতো অত হালকা বোধ হয় নাই, যা দেখে আমরা আশা করতে পারতাম যে ওটা শিগগিরই একটা সম্বন্ধে পেকে উঠবে। 'ফরেন পলিসি' আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখালেখির শিগগিরই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, কেননা অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাক, তাঁর ঘুষি লড়বার ক্ষমতা আছে।

চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নেই। অশোকবাবুর লেখার কসরত দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু বক্সিং শিখলে যে শক্তিশালী লেখক হওয়া যায়, এ সন্ধান তো আগে আমায় কেউ দেননি। তাহলে আমি আমার লেখার কায়দাটা অশোকবাবুর কাছে দেখেই শিখতাম। আর অশোকবাবু ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা আমায় লিখতে শেখাবার জন্য কিরূপ সমুৎসুক, তা তাঁদের আমার উদ্দেশ্য বহু অর্থব্যয়ে ছাপা বিশেষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। বাগদেবী যে আজকাল বাগদিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠেঙ্গা বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন।

আপনাকে আমি চিনি, তাই আমার ভয় হচ্ছিল আপনার কাগজের ইদানীং লেখাগুলো দেখে যে,কোনোদিন বা আপনারও নামের শেষে (B.A. Cantab) দেখে ফেলি। চিঠি মাত্রেই প্রাইভেট, এ কথা নীতিবিদ রামানন্দবাবুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত না হলে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারতেন? ও-রকম লেখা ঐরকম Oxen বা Cantab B.A. ইউরোপ-প্রত্যাগত অতিসভ্য ছাড়া বোধ হয় কেউ লিখতে তো পারেনই না, পড়তেও পারেন না। অশোকবনের চেড়ির মার সীতার প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল জানা নেই। কিন্তু সে মার সরস্বতীর ওপর পড়লে যে কিরূপ মারাত্মক হয়, তা বেশ বুঝছি। আমার ভয় হচ্ছে, কোনোদিন বা শ্রীযুক্ত বলাই চাটুজ্জে লেখা শুরু করে দেন।

শিবের গীত গাইতে ধান ভেনে নিলাম দেখে ('ধান ভানতে শিবের গীত' নয়) আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর, চিঠিতে যে আবোল-তাবোল বকবার অধিকার সকলেরই আছে, তা 'শনিবারের চিঠি' পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেননা তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হলে আবার গণেশ ঠাকুরকে ডাকতে হয়। এটাকে মনে করে নিন আসল গান গাইবার আগে একটু তারারা করে নেওয়া, যেমন আপনারা তারারা করেছেন গণবাণীর আলোচনা করতে গিয়ে।

শ্রীযুক্ত তারারা লিখেছেন 'লাঙল উঠে গিয়ে এটা (অর্থাৎ গণবাণী) নামাল।' কিন্তু 'গণবাণী'র কভারে লেখা আছে, এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে। যেমন Forword-এর সাথে Indian Daily News প্রভৃতি একীভূত হয়েছে। অতএব আসলে লাঙল উঠে গেল না, সে রয়ে গেল গণবাণীর মধ্যে। এর কারণও দেখিয়েছেন ওর সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ। 'গণবাণী'র কভারের লেখাটুকু বোধ হয় শ্রীযুক্ত তারারা চোখে পড়ে নাই। অবশ্য আমি এ ইচ্ছা করছি না যে, তার চোখে লাঙল পড়ুক। চোখে খড়কুটো পড়লেই যে রকম অবস্থা হয়ে উঠে!

তিনি আরো লিখেছেন, এ নামের দল (বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল) এদেশে কবে তৈরি হলো, কারা করল, কোনো ভাতকাপড়ের সংস্থানহীন অনশন-অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার তা সাধারণকে জানানো উচিত। কোনো সাধারণ সভায় এর উদ্বোধন, সেটাও জানানো দরকার। 'শ্রীযুক্ত তারারা' 'দরিয়াপারে' খবর লেখেন, অনেক কাগজে অনেক রকম কিছু লেখেন, সুতরাং দরিয়ার এপারের দেশি খবরটাও তিনি রাখেন এ বিশ্বাস করা অপরাধের নয় নিশ্চয়। কিন্তু না রাখাটা অপরাধের, অন্তত তাঁর পক্ষে যিনি রাজনীতি আলোচনা করেন। তিনি আপাতত আপনার কাগজে কৃষক-শ্রমিকের খবরাখবর করলেও আগে নিশ্চয় করতেন না। নইলে তিনি ও-রকম প্রশ্ন করে নিজেকে লজ্জায় ফেলতেন না। 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল' সম্বন্ধে দু'-একটা খবর দিচ্ছি ওঁকে, ওঁর ওগুলো জানা থাকলে কাজে লাগবে। গত ফেব্রুয়ারি মাঝের ৬ই ও ৭ই তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, যার সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ কনফারেন্সের বিবরণী বাংলার ইংরাজি-বাংলা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। লাঙলে তো বেরিয়েছিলই। অবশ্য ধনিকদলের কাগজ 'ফরওয়ার্ড' সে বিবরণ ছাপায়নি—শুধু সভার সংবাদটুকু কোনো নারীহরণের মামলার শেষে দেওয়া ছাড়া। এর পর এলবার্ট হল প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের যতগুলো সভাসমিতি হয়েছে, তার কোনো সংবাদই ছাপেনি 'ফরওয়ার্ড'। আমরা দিয়ে আসলেও না। সম্পাদকীয় এই ধর্ম ও সৌজন্যটুকু বাংলার আর কোনো কাগজ অতিক্রম করেনি। অবশ্যই 'ফরওয়ার্ড' বিলেতের ও জগতের আরো আরো দেশের শ্রমিকদের কথা লেখে, সুতরাং ও-কাগজে বাংলার জঘন্য চাষি-মজুরের কথাও লিখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাতে আবার এ কৃষক-শ্রমিক দলটা তুলসীবাবুর, নলিনীবাবুর মতো

ধনিক নেতার দ্বারা গঠিত নয়। গঠন করলে কারা, না, যত সব বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়-চামড়া বের করা, আধ-ন্যাংটা বেগুন-সিদ্ধ মতো মুখওয়ালা চাষা-মজুর। আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রূপ—না আছে চাল না আছে চুলো। তাতে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি সব। বোঝো ঠ্যালা!

যাক, ঐ প্রজা সম্মিলনের প্রস্তাবসমূহ নবম সংখ্যা লাঙলে বেরিয়েছিল। ঐ সম্মিলনের প্রথম প্রস্তাবই হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক দল গঠনের প্রস্তাব।

উহার চতুর্থ প্রস্তাব হচ্ছে : 'লাঙল পত্রিকাকে কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আপাতত গ্রহণ করা হউক।'

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।

অরপর তারারার সঙ্গিন প্রশ্ন—'কোনো কোনো ভাত-কাপড়ের সংস্থানহীন অনশন-অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকেরা এর কর্ণধার।' উত্তরে তারারা মহাশয়কে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন দয়া করে একবার ৩৭ হ্যারিসন রোডের 'গণবাণী' অফিসে পদধূলি দিয়ে যান। গেলে দেখতে পাবেন, বহু হতভাগ্যের পদধূলি 'গণবাণী' অফিসে স্তূপীকৃত হয়ে 'গণবাণী'-কেও ছাড়িয়ে উঠেছে? সে অফিসে মাদুরের চেয়ে মেঝেই বেশি, চেয়ার টেবিল তো নঞতৎপুরুষ সমাস। মানুষগুলির অধিকাংশই মদ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবশ্য খাবার বেলায় বহুব্রীহি। বাজপড়া, মাথা-ন্যাড়া তালগাছের মতো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, 'গণবাণী'র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফফর আহ্‌মদকে। অবস্থা তো সব—'ফকির-ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই, শানকিতে ঠোকরা।' আর শরীরের অবস্থা তেমনি। যেন সমগ্র মানবসমাজের প্রতিবাদ! আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবির দেশে নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবির দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটা দিন সে বাঁচবে জানি না। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফফর দিনের পর দিন অর্ধাশন অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে। আমি জানি, এই 'গণবাণী' বের করতে তাকে দুটো দিন কাঠে কাঠ অনশনে কাটাতে হয়েছে। বুদ্ধু মিঞাও আজ লিডার, আর মুজফফর মরছে রক্তবমন করে। অথচ মুজফফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে কোনো মুসলমান নেতা দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে যদি কারুর মাথা ঠিক থাকে, তা মুজফফরের, 'লাঙল' ও 'গণবাণী'র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট বড় মাঝারি সকল দেশপ্রেমিক মিলে যখন 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' প্রবাদটার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে পনর দিন বিনাশ্রমে জেল বাসের বিনিময়ে অন্তত একশত টাকার 'ভাত কাপড়ের সংস্থান' করে নিলে, তখন যারা তাদের ত্যাগের মহিমাকে মলিন করল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে—তাদের অন্যতম হচ্ছে মুজফফর। মুজফফর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামি এবং বাংলার সর্বপ্রথম মুসলমান স্টেট প্রিজনার! বাংলার বাইরে নানান খোট্টাই জেলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তাকে হিমালয় পর্বতস্থিত আলমোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ওজন তার মাত্র ৭৪ পাউন্ড! সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সে অনশনে, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলেনি কোনোদিনই মুখ ফুটে যে, দেশের জন্য সে কিছু করেছে। বলবেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই তো তার জন্য এত কান্না পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রদ্ধা। সেই নেতা যিনি আজ কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব্যাঙ্কে যাঁর জমার অঙ্কের ডান দিকের শূন্যটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, যাঁকে কলকাতা এনে তাঁর টাউন হলের অভিভাষণ লিখিয়ে দিয়ে কাগজে কাগজে তাঁর নামে কীর্তন গেয়ে বড় করে তুলল সেই মুজফফর তার অতি বড় দুর্দিনে একটা পয়সা বা এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি ঐ লিডার সাহেবের কাছে। সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু আমরা করি।

যে মুসলমান সাহিত্য–সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল মুজফফর, অথচ তার নিজের নাম চিরকাল গোপন রেখে গেল, সেই মুসলমান সাহিত্য–সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হলো এবং তার নতুন সভ্যগণ মুজফফর রাজলাঞ্ছিত বলে এবং তাদের অধিকাংশই রাজভৃত্য বলে যখন তার বন্দি বা মুক্ত হওয়ার জন্য নাম পর্যন্ত নিলে না—তার ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা তখন একটি কথা কয়ে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুজফফর। ও যেন প্রদীপের তেল, ওকে কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু সেই শিখাকে, যা জ্বলে প্রদীপের তেলকে শোষণ করে। শুধু মুজফফর নয়, এ দলের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। হালিম, নলিনী, সব সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখো। একজনের অ্যাপেন্ডিসাইটিস, একজনের ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, একজনের আলসার, একজনের ধরেছে বাতে। আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই। যাকে বলে নরক গুলজার, বলতে হলে সব শ্রীচরণ মাঝি ভরসা। কোমরের নিচে টাকা জুটাল না কারুর, আর পেটের ভিতর সর্বদা যেন বোমা তৈরি হচ্ছে—খিদের চোটে এমন হুড়মুড় করে। দিনরাত চুপসে আছে—বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলের ব্লাডারের মতো। চায়ের কাপগুলো অধিকাংশ সময়েই দন্ত 'ক্লাইভ স্ট্রিট' করে পড়ে আছেন। লেখককে তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান শীতলিত এবং লাইট উজ্জ্বলিত, ড্রয়ার টেবিল ডেস্ক পরিশোভিত, দারোয়ান দণ্ডায়িত, ত্রিতল অফিসকে ত্যাগ করে একটু নিচে নেমে (লিফট দিয়ে) তাঁদের অফিসের মোটরে করে আমাদের 'গণবাণী' অফিসের ও তার কর্ণধারদের দেখে যাবার নিমন্ত্রণ রইল। বুভুক্ষুগুলো অন্তত তাঁর পয়সায় একটু চা খেয়ে নেবে। অবশ্য ওকেও এক কাপ দেবে। আমি নিজে গিয়েই শ্রীযুক্ত 'তারারা'কে নিয়ে যেতাম, কিন্তু

এদিকেও ভাঁড়ে ভবানী। কয়েকদিন, কলকাতায় যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও যেতে পারছিনে ট্রেন ভাড়ার অভাবে। বাড়ির হাঁড়িতে ইঁদুরেরা বক্সিং খেলছে, ডন খেলছে! ক্যাপিটালিস্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা, তারা বলে 'হাত বুলাতে হয়, গায়ে বুলোও বাবা, মাথায় নয়, তোমার হাত খরচটা মিলে যাবে, কিন্তু ও কর্মটা হবে না দাদা। এমনকি মুজফফরের মতো সুঁটকি হয়ে মরো-মরো হলেও না।'

তারপর 'গণবাণী'র লেখা নিয়ে 'তারারা' বলেছেন—'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকেরা লেখাপড়ার সঙ্গে গোটা কয়েক মতবাদ শিখলে ওগুলো শিগগিরই বুঝতে পারবেন?'—তাঁর ইঙ্গিতটা এবং রসিকতাটা দুটোই বুঝলাম না, বুঝলাম শুধু তাঁর জানাশোনা কতটুকু—অন্তত সেই সম্বন্ধে, যে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি কি জানেন না যে, কোনো দেশের কোনো শ্রমিক কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পড়ে বুঝতে পারবে না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে, তারা কৃষক-শ্রমিক নয়, তারা লেনিন ল্যান্সব্যারির নমুনার লোক। কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনোকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি করে তুলবে সেই রকম লোক যারা বোঝাবেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইন্‌জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়িতে চড়বে সর্বসাধারণ। 'গণবাণী'ও কৃষক শ্রমিকের পড়ার জন্য নয়, কৃষক-শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা—'গণবাণী' তাঁদেরই জন্য। কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র, মানে তাদের বেদনাতুর হৃদয়ের মূক মুখের বাণী 'গণবাণী' ও তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে 'গণবাণী'। ইতি—

৮ই ভাদ্র
১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

বিনীত
নজরুল ইসলাম

বাঙালির বাংলা

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে 'বাঙালির বাংলা'—সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনাশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল

অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় ; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়—বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে, তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগল না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগল না—বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গিরণ করল না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্ব গুণের প্রধান শত্রু তম গুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ আলস্য, কর্মবিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চিরজাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজপ্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা, ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, অভাবে, দৈন্যে, ব্যাধিতে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈবশক্তির লীলানিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদগুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্যউর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ—আল্লাহ্-ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ করি না, উলটো, তাদের দাসত্ব করি ; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি ; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলি-গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতামন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্মবিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারত তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে,—হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য—যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারল না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করল বলে তার এই দুর্গতি—তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবিফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা—তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশি দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না 'এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য ! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে—তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করব, সংহার করব।'

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

'এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির—আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।'

বাংলা বাঙালির হোক ! বাংলার জয় হোক ! বাঙালির জয় হোক।

নবযুগ
৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯

মিয়া কা সারং

ইহা কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ইহাকে তানসেনের ঘরের রাগিণী বলে। ইহাও এক প্রকার সারং। ইহার রেখাব স্পষ্ট। উদারার মুদারা গ্রামের এই রাগিণী অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। উদারা গ্রামে যেখানে নিখাদ ও ধৈবতের সঙ্গত হয় সেখানে কতকটা মিয়া কি মল্লারের মতো শোনায়। গুণী মাত্রেই জানেন যে, তানসেনের আয়ত্তাধীন ও প্রিয় রাগিণী ছিল কানাড়া। এই জন্য অনেকের মতে এই সারঙেও কতকটা কানাড়ার ছাড়া আসা উচিত এবং আসেও। এই সব রাগিণী মুসলমান রাজত্বের সময় গুণী ওস্তাদগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

দুটি রাগিণী

[বেণুকা ও দোলন চাঁপা]

'বেণুকা' ও 'দোলন চাঁপা' দুটি রাগিণীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ণ) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনিফরমিটি'র (সমতা) অভাব। কোনো রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ-রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিণী যদি তার 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনো সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতে মহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন হিন্দি ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না, আমার এই গান দুটির স্বর-সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্তব্য' তাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানের 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায় রেখেও এই শ্রেণির গান কত মধুর হতে পারে, আশা করি, আমার এই গান দুটিই তা প্রমাণ করবে।

সুর : বেণুকা/তেতালা

'বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া-বনে
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে।'

সুর : দোলন-চাঁপা/তেতালা

'দোলন-চাঁপা বনে দোলে
দোল-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে,
শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে।'

হোসেনী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। এই রাগিণীও নূতন সৃষ্টি। কবি আমির খসরু এই রাগিণীর স্রষ্টা বলিয়া কথিত আছে। এই রাগিণীও প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে নাই। যেমন আড়ানা মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া গাহিতে হয় তেমনি হোসেনী কানাড়ারও গ্রহ সুর মধ্যম। আড়ানা হইতেই হাতে কানাড়ার অঙ্গ বেশি। আড়ানা, মেঘ, হোসেনী, সাহানা, সুহা, সুঘরাই, সুর মল্লার—(এইসব) রাগিণীতে সারদের অঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু কানাড়ার অঙ্গই প্রধান হইয়া ওঠে। তারার ষড়জ—ইহার চমৎকারিত্বের অন্যতম সহায়ক। ধৈবত গান্ধারের ব্যবহারের বিশেষ প্রণালিই (অধিকন্তু বা স্বল্পত) এই রাগিণীকে কানাড়া জাতীয় অন্য রাগিণী হইতে পৃথক করে। 'রাগ-লক্ষণ' গ্রন্থে হোসেনী কানাড়ার আরোহী সম্পূর্ণ ও অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

নীলাম্বরী

'নীলাম্বরী' কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। পঞ্চমবাদী—এই রাগিণীতে ষড়জ পঞ্চমের সঙ্গীত থাকে। গান্ধার কম্পব :—ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আরোহীতে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে হয়। ইহার আরোহীতে বহু গুণী গায়ক তীব্র গান্ধারও লাগাইয়া থাকেন। যদি ঠিকভাবে তীব্র গান্ধার লাগানো যায়, তাহা হইলে ইহার রূপ বিকৃত হয় না। মধুমতি ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি। এ রাগিণী প্রায় অপ্রচলিত।

আরোহী :— সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা
অবরোহী : —র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।
লক্ষণ গীত—তেওড়া (দ্রুত লয়)

আমার লীগ কংগ্রেস

আমার স্বধর্মী কোনো কোনো ভাই বা তাঁদের কাগজ প্রচার করছেন—আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ নিত্য-পূর্ণ-পরম-অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষবশত আমার এই নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি 'নবযুগে' যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে, নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহংকার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে—আল্লার বান্দা রূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। 'ইসলাম' ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে—কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উত্থিত হয়েছে। ... এক আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানবধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো 'কফুর' বা 'গুনাহ' করে থাকি তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লার কাছ থেকে নেবো, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ লা-শরিক, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে 'দ্বিতীয়' আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারও নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল-কোরান আমার পথ-প্রদর্শক।

এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত দাতা নাই, মুর্শিদ নাই। আমার আল্লাহ আল ফাদালিল আজিম—পরম দাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোনো দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তার কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে-হাত কলঙ্কিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, অন্ধ আশ্রয়-ভিক্ষুকের হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমাসুন্দর আল্লার পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি—আমি উপলক্ষ মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তারই। আমার কবিতা যাঁরা পড়ছেন, তাঁরাই সাক্ষী : আমি মুসলিমকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য—যে শির এক আল্লাহ ছাড়া কোনো সম্রাটের কাছেও নত হয়নি—আল্লাহ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্যশক্তিকে তথাকথিত 'খ্যাটো'

করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজো আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবরদাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি—আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি : আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লীগ-কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি? আজো 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে—তাদের প্রবল করে তুলতে—তাদের আবার 'মার্টায়ার'—শহীদি সেনা করতে। বাংলার মুসলমান বাংলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাংলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাংলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। 'নবযুগে' এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি ; এই 'নবযুগে' আসার আগে বাংলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল—সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনি ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌ-জোয়ানদের' নিয়ে—ভাইয়ে ভাইয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ্ জানেন, আর জানেন—যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা—আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। 'লীগ' কেন, 'কংগ্রেস'কেও আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি। আমার 'ধূমকেতু' পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনোদিন লিখিনি—কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক, নেতারা যদি নির্লোভ, নিরহংকার ও নির্ভয় না হন, সে আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেমন 'গদাই লস্করি' চালে চলছিল তাতে আমি আমার অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি।...

আমি 'লীগ' 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল কয়েদিদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হলো না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওকে ঘুস্ মারে! দেখে হাসি পায়।

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয় ; যে-সব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দরে, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি—'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ

চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহি পেতে পারে—এ আল্লাহ্‌র নির্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লার সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব ; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্মল করব—এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সৃষ্টি এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী—এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতোই অটল। 'ফিরদৌসআলা'—পূর্ণ আনন্দধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব—এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবি করে তারা শয়তান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে ভীরু সে মুসলমান নয়। এই ভীরুতা, এই তামসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ-ছাড়া আমার অন্য লীগ-কংগ্রেস নাই।

দৈনিক 'নবযুগ'
১৯৪১

নবযুগের সাধনা

[১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক মঙ্গলবারের 'নবযুগ'-এ 'নবযুগের সাধনা' শিরোনামে নজরুলের স্বাক্ষরিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৫.৮.১৯৪৫ তারিখের কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তৎকালীন অখণ্ড বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক মৎপ্রণীত 'মঞ্জুমালা' সমগ্র বঙ্গদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য-পুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়। উক্ত পুস্তকের প্রথম লেখা হিসেবে ছাপা হয় নজরুলের 'যুগের সাধনা'—'নবযুগের সাধনা' নিবন্ধেরই 'ঈষৎ-পরিবর্তিত' পাঠ। নজরুলের 'নবযুগের সাধনা' ছিল কথ্য ভাষায় লেখা এবং দীর্ঘ ; সেটিকে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা-অনুসারে সাধু ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষেপিত করা হয়। মূল 'নবযুগের সাধনা' সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না বলে অগত্যা 'যুগের সাধনা' এখনে সংকলিত হলো-
–সম্পাদক]

যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহত্তের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পুকুরের জল গ্রামের কল্যাণ করে, কিন্তু সংক্রোমক রোগের একটি জীবাণু পড়িলেই সে জল দূষিত ও

অপেয় হইয়া যায়। কেননা, পুকুরের জলের চারিধারে বন্ধন ; তার বিস্তৃতি নাই, গতি নাই, প্রবাহ নাই। নদীর জলেরও চারিধারে বন্ধন,—এক ধারে পাহাড়, এক ধারে সমুদ্র, দুই ধারে কূল। কিন্তু তার বিস্তৃতি আছে, তাই গতি ও প্রবাহ নিত্যসাথী। এই প্রবাহের জন্যই নদীর জলে নিত্য শত রোগের বীজাণু পড়িলেও তাহা অশুদ্ধ হয় না, অব্যবহার্য হয় না। তাই নদী পুকুরের চেয়ে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্য তৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে, অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সীমাবদ্ধ দেশকে সে স্বীকার করে,—তার বক্ষচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের ; পরম নিত্যের তৃষ্ণা হইলেও আমরা কর্মচ্যুত হইব না, বৃহৎ কর্ম করিব।

বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহর তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। নদী সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে ছোটে, তাই সমুদ্রকে পায়। সমুদ্রের তৃষ্ণা ছাড়া নদীর অন্য তৃষ্ণা নাই, তবু যাইতে যাইতে তার দুই কূলকে শস্য শ্যামল, ফুলে ফলে ফুল্ল করিয়া যায় ; দুই কূলের লোকের সমস্ত অশুদ্ধিকে নিজের দেহে নেয় ; তার দুই কূলের আবহাওয়াকে শুদ্ধ রাখে।

আত্মত্যাগী সাধকেরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্রবাহ। যাঁহারা নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে মুক্ত হইয়া এই প্রবাহ-তরঙ্গকে গগনস্পর্শী করিয়া তুলুন—ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালী

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র-রূপে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মুতাবিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ 'লাঙল' আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল ইসলাম ছিলেন পত্রিকার প্রধান পরিচালক এবং দলের সাধারণ সম্পাদক।]

১। নাম : ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় এই দলের নাম হইবে।

২। উদ্দেশ্য : নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।

৩। উপায় : নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি-প্রয়োগ উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।

৪। সভ্যপদ : ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে-কোনো সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালি এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির মতো হইলে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে পারিবেন।

শ্রমিক এবং চাষির স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের কথা যতদিন স্বরাজ্যদলের সভ্য হওয়ায় বাধা নাই।

৫। চাঁদা : এই দলের প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিবেন। শ্রমিক ও কৃষক হইলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজনস্থলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁদা না লইতেও পারেন।

৬। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ : কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ কমবেশি পনেরজন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। দলের সৃষ্টিকর্তাগণ তাঁহাদের প্রথম সভায় তিন বৎসরের জন্য ইহাদিগকে নির্বাচিত করিবেন। পঞ্চায়েতগণ নিম্নলিখিত বিভাগগুলির এক বা ততোধিক বিভাগের ভার লইবেন এবং তদ্বিষয়ে চরম ক্ষমতা পাইবেন।

১ম প্রচার ; ২য় অর্থ ; ৩য় দল গঠন ; ৪র্থ শ্রমিক ; ৫ম চাষি ; ৬ষ্ঠ ব্যবস্থাপক সভা। পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট থাকিবে। সমান সমান স্থলে যে ব্যক্তি সভাপতির কাজ করিবেন, তিনি কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন। তিনজন সভ্য থাকিলেই পঞ্চায়েতের কার্য চলিতে পারিবে।

৭। প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ : কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত পাঁচ হইতে নয়জন সভ্য লইয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি নির্দিষ্ট প্রত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে।

৮। প্রাদেশিক পরিষদ : প্রাদেশিক পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রথম অবস্থায় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক জেলার জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হইবে।

৯। জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা করিবেন। এই সকল পরিষদ গঠিত হইলে প্রাদেশিক পরিষদ, প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ এবং কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের সভ্য নির্বাচনপ্রণালি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১০। উপরি-উক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত করিবেন। এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের মতই চরম বলবান হইবে।

কর্মনীতি ও সংকল্প

যেহেতু বিদেশি আমলাতন্ত্রের সৃষ্ট এবং সেই আমলাতন্ত্রের শাসন-প্রণালির স্থিতির উপর যাহাদের চরম অস্তিত্বনির্ভর করে, সমাজের সেই শ্রেণির স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত ও কাউন্সিল বর্জনের দাবি করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের অসফলতার অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানে বোঝা যাইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের বাধা-প্রদাননীতি চেষ্টা দ্বারা আমলাতন্ত্রকে ভারতের জাতীয় দাবির পরিপূরণে ইচ্ছুক করা যায়

নাই, এবং সমস্ত ব্যবস্থা পরিষদগুলি স্বরাজ্যদলের সভ্যগণের দ্বারা অধিকৃত হইলেই ভবিষ্যতে ঐ নীতির সফলতার আশা দেখা যাইতেছে না।

যেহেতু ভারতের স্বাধীনতা-সমরের সেনানিগণের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আবদ্ধ হওয়া বিষয়ে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একযোগে তীব্র প্রতিবাদ আমলাতন্ত্রের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় নাই।

যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র ধারা যাহাতে সাক্ষাৎ প্রতিরোধ ক্রিয়ার সার্বজনীন প্রয়োগ দেশব্যাপী ধর্মঘট ও খাজনা বন্ধের দ্বারা হইতে পারিত এবং তদ্দারা শাসনযন্ত্র ও শোষণযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত, সেই ধারায় প্রয়োগ বিষয়ে ভারতের সমস্ত অগ্রগামী রাজনৈতিক দলই বিরোধী বা নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন।

যেহেতু দেখা গিয়াছে যে গলাবাজি অথবা ত্রাসনীতিতে অনিচ্ছা আমলাতন্ত্রের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা অতীতে কেবলই বিফল হইয়াছে ; আমলাতন্ত্রের নিকট খোশামুদি দ্বারা ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন আনয়ন সম্ভব নয়, কিংবা সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ স্বদেশীয়গণের সাহায্যেই নিরস্ত্রীকৃত জনসাধারণের স্বাধীনতা গুপ্তহত্যার সাহায্য আসিতে পারে না ; বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী গণআন্দোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় স্বরাজের যে কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই এবং যেহেতু কোনো কৃষিজীবী জাতির সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার সেই— যাহাতে সে নিজের জমির নিজে স্বত্বাধিকারী হয় ; এবং ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা না থাকিলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সুখ হয় না ; এবং উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র। যেহেতু প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যতার কলঙ্ক, এবং ভারতীয় প্রকৃত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্থলে যতদিন না সহযোগিতা ও পরস্পর সেবার ইচ্ছা প্রবর্তিত না হয়।

যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যেমন বলিয়াছেন যে, শ্রেণিগত স্বার্থত্যাগী ভদ্র যুবক, শ্রমিকও কৃষকের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসিবে না।

অতএব ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবি পূরনের এখনো একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশিজন যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে শ্রেণিগত অধিকার লাভের সাহায্য করা, যাহাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরো সচেতন হইয়া নিজেদের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে। এবং এতদর্থে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় নিম্নলিখিত কর্ম-সংকল্পের অবতারণা করিতেছেন :

১। এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন। (ভদ্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি নিজের হাত পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে, তাহাকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইবে)।

২। জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সহিত এই দল যতটা সম্ভব সহযোগিতা করিবেন।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণের নিম্নলিখিত দাবিগুলির জন্য অন্যান্য দাবি ছাড়াও যাহারা যুঝিবেন, ব্যবস্থাপক সভার এমন সমস্ত প্রতিনিধির নির্বাচনে এই দল সাহায্য করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা এই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

ক। ব্যবস্থা পরিষদে এই দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

খ। সম্ভব হইলে প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন :

১. যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালি পরিবর্তিত না হয়, ততদিন টাকা মঞ্জুরি বাজেটে না দেওয়া।

২ আমলাতন্ত্র শাসন-প্রণালির শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে এমন সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া।

৩. জাতীয় জীবনের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল এবং সে কারণে আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল এমন সমস্ত প্রস্তাব আইনের প্রবর্তন করা ও সমর্থন করা।

গ। ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি বিনা গভর্নমেন্টের অধীনে কোনো প্রতিনিধি কোনো চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চরম দাবি

১। আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্র্যামওয়ে, স্টিমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি-রূপে পরিচালিত হইবে।

২। ভূমির চরম স্বত্ব আত্মঅভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লিতন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লি-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণির শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।

১. শ্রমিক :

ক। জীবনযাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরির একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া।

খ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা ; নারী এবং অল্পবয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ শর্ত নির্ধারিত করা।

গ। শ্রমিকগণের আবাস, কাজের শর্ত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবি মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পূরণ করানো।

ঘ। অসুখ, বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন।

ঙ। সমস্ত বড় কলকারখানায় লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা।

চ। মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

ছ। কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।

জ। শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

ঝ। শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের দাবি পূরণের জন্য ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।

১. কৃষক :

ক। ভূমিকর সম্বন্ধে একটা উর্ধ্বতম হার বাঁধিয়া দেওয়া এবং বাকি খাজনার সুদ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সহিত সমান নির্ধারণ করা।

খ। (১) জমিতে কায়েমি স্বত্ব ; (২) উচ্ছেদ নিরোধ ; (৩) অন্যায় এবং বে-আইনি বাজে আদায় বন্ধ ; (৪) স্বেচ্ছায় বিনা সেলামিতে হস্তান্তর করার অধিকার ; (৫) গাছ কাটা, কুয়ো খোঁড়া, পুকুর কাটা, পাকা বাড়ি করার বিনা সেলামিতে অধিকার।

গ। জল-করে মাছ ধরিবার নির্ধারিত শর্ত।

ঘ। মহাজনের সুদের চরম হার নির্ধারণ।

ঙ। কো-অপারেটিভ কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজন ও লোভী ব্যবসাদারগণের হাত হইতে কৃষককে উদ্ধার।

চ। চাষের জন্য যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফত কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া। মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিস্তিবন্দি হিসাবে অল্প অল্প করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত।

ছ। পাটের চাষে কৃষকের উপযুক্ত লাভের বন্দোবস্ত।

এই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন :
নজরুল ইসলাম, ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লাঙল
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
১৬ই, ডিসেম্বর ১৯২৫

একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা

[নজরুল ইসলামের এই অসমাপ্ত রচনাটির পাণ্ডুলিপি সুরশিল্পী শ্রীজগৎ ঘটকের সংগ্রহে আছে। এতে একটি রূপক নাটকের খসড়া বিষয়-কল্পনা draft theme আছে বলে অনুমিত হয়।]

জনক = যে শস্য ফসল উৎপাদন করে।
রাম = কৃষকদের প্রতিনিধি (জনগণ–অধিনায়ক)।
সীতা = জনক অর্থাৎ শস্য–উৎপাদকের কন্যা : শস্য।
হরধনু–ভঙ্গ = অর্থাৎ Hard Soil উর্বর করে শস্য অর্থাৎ সীতাকে পাওয়া।
লক্ষ্মণ = শ্রীমান (?)।
রাবণ = যে সেই শস্য বা সীতাকে হরণ করে। লোভের প্রতীক। যে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করে, দশ মুখ দিয়ে গ্রাস করে।
রাম = জনগণ বা কৃষকদের প্রতিনিধি, তাই দুর্বাদল–শ্যাম।
হনুমান = নৌ–যান ও আকাশ–যানের প্রতীক।
পবন = গতি (speed)
ভরত = President
শত্রুঘ্ন = শত্রুহন্তা।
কুশ–লভ = শস্যের দুই অর্ধ।
বিভীষণ = লোভের সহোদর নির্লোভ : বিবেক।
কৌশল্যা = ডিপ্লোমেসি ; তার গর্ভেই জনগণ–অধিনায়ক জন্ম নেয়।
দশরথ = দশ দিকে যার অব্যাহত গতি।
রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই কুবের। ঐশ্বর্যের দুই দিক—দেবশক্তিতে ঐশ্বর্য নিয়োজিত হলে মঙ্গল সাধন করে ; রাক্ষস শক্তিজাত ঐশ্বর্য অমঙ্গল সাধন করে, লুণ্ঠন করে।
কুশ = যজ্ঞাদি কার্যে লাগে ; তৃণ।
লব = কুশের নিম্নার্ধ ভাগ।
সীতার পাতাল প্রবেশ = রাম অর্থাৎ কৃষকদের প্রতিনিধি যখন শস্যকে অবহেলা করে জনগণের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত স্বর্ণকে গ্রহণ করেন, তখন শস্য পাতাল প্রবেশ করেন। অর্থাৎ শস্য–উৎপাদিকা–শক্তিকে অবহেলা করে স্বর্ণরৌপ্যকে (স্বর্ণসীতাকে), বড় করে ধরলে দেশের সমূহ অকল্যাণ হয়। এই ভ্রম বুঝে রামকে বা জনগণের প্রতিনিধিকে সরযুর জলে ডুবতে হয়।
কৈকেয়ী ও মন্থরা = দুর্বুদ্ধি।
কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি বনবাসে গেলে বা Departure হলে শস্য অর্থাৎ সীতাও সহগামিনী হন। কৃষক ও শ্রমিক সাহায্য না পাওয়ায় রাবণ শস্যহরণ করতে সমর্থ হয়।
রাবণ = ঐশ্বর্য–পিপাসী সুমালির দৌহিত্র। কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে সুমালির ঈর্ষা হয়,—সেই ঈর্ষা বুদ্ধিপ্রসূত যে issue. তারই নাম নিকষা। তার সন্তান লোভ বা রাবণ।

বিশ্রবা = ঋষি।
রাবণ = ব্রাহ্মণ-শক্তি + রাক্ষস-শক্তি।

চানাচুর

[১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের দিকে জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় ১১ নং ওয়েলসলি স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক সওগাত' প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার বিশেষ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ সংখ্যায় তাঁরই লেখা 'সওগাত ও নজরুল ইসলাম' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'সাপ্তাহিক সওগাত' সম্বন্ধে জনাব আবুল মনসুর আহমদের মন্তব্যের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে :-

> -'...সাপ্তাহিক সওগাত' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সুচিন্তিত লেখায় এবং নজরুল ইসলামের রসরচনায় অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ... এতে নজরুল ইসলাম 'চানাচুর' শিরোনামায় যে একটি ফিচার লিখিতেন, সেটি পড়িবার জন্য পাঠক-মহলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। ...'

জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে 'চানাচুর' শিরোনামায় নজরুল ইসলামের কয়েকটি রসাত্মক লেখা উদ্ধৃতি করে দিয়েছেন ; তা থেকে এখানে ৮টি লেখা সংকলিত হলো। —সম্পাদক]

১
ডোমনি স্টেটাস

ভারতমাতা এতদিন পদদলিতা দাসী ছিলেন। শুনছি তাঁর পুত্রদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তার প্রভু নাকি তাঁর হাত-পায়ের কতক বাঁধন খুলে দিয়ে 'ডোমনি স্টেটাস'-এর (Dominion status) তকমা পরিয়ে দেবেন।

ভারতমাতার বল-দ (বলদানকারী) পুত্রদের মধ্যে এই নিয়ে এরই মধ্যে মোচ্ছবের ধূম লেগে গেছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠছে 'মা ডোমনি হবেন রে, মা ডোমনি হবেন।'

মা-এর অবস্থা মা-ই জানেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তিনি বোধ হয় মনে মনে বলছেন 'এদের আঁতুর ঘরেই নুন খাইয়ে মারিনি কেন?'

ডোমনির ছেলেই বুঝি বা ! হাতে যা বড় বড় ধামা !

২
পুনর্মূষিকো ভব !

কাবুলের 'আঙুল-ফুলে কলাগাছ' বাচ্চা-ই-শাকা এখন নাদির খাঁর তরবারি তলে 'নফসি নফসি' করছে।

যে ভিস্তিকে সেই ভিস্তি। কোনো 'রেকর্ড কিপার' ফেরেশতার ভুলে হয়তো ভিস্তি বেহেশতি হয়ে গিয়েছিল। তাই কাবুলের ভাগ্যে এত বিড়ম্বনা। যাক, ফেরেশতার ভুল ফেরেশতাই শুধরে নিয়েছেন। বাচ্চু মিঞাকে হয়তো আবার কাবুলের রাস্তায় মশক ঘাড়ে করে পানি দিতে হবে কিংবা কাবুলের শুকনো রাস্তা তার রক্তে ভিজাতে হবে।

ও নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা বেশি, তারাই ওর হেস্তনেস্ত করবে। কিন্তু যাদের এতদিন 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা' হচ্ছিল বাচ্চাকে নিয়ে, তাদের উপায় হবে কি?

বেচারাদের 'গাজি' যে গাঁজিয়ে উঠল। ইসলাম রক্ষার উপযুক্ত 'গাজি' পেয়েছিল বটে। বেড়ালকে দিয়েছিল মাছ বাছবার ভার।

আরগুলো হলো পাখি!

বেওকুফ আর কাকে বলে?

আশা করি বাচ্চা মরবার সময় তার মশকটা এইসব ভক্ত মিঞা সায়েবদের পাঠিয়ে দেবে। ওরা ঐ মশকের এক চল্লু করে পানি খাবেন আর শোকর গোজারি করবেন। অথবা ওটাকে ওদের 'বিস্তারা' বাঁধবার 'হোল্ডল' (Hold-all) করেও ব্যবহার করতে পারেন। যা অভিরুচি!

৩
চতুর্বর্গ-ফলের বোঁটা

সেদিন কলকাতার টাউন হলে বড় এক মজার অভিনয় হয়ে গেছে। যত সব বুড়ো ও পণ্ডিতের দল তাদর অচৈতন্য চৈতন-চুটকিতে কাঁঠলের আঠা ও ছাই মাখিয়ে দিব্যি তাতিয়ে খাড়া করে সর্দার বিলের প্রতিবাদ কল্পে জমা হয়েছিল। এ ধারে কিন্তু খবর পেয়ে যত সব টিকি-নিসূদন কালাপাহাড়ি তরুণের দল ক্ষুর কাঁচি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। যাহা বুড়োর দলের 'যুদ্ধং দেহি' বলে আর্কফলা উচিয়ে তেরে আসা তাহা 'এই লেহি' বলে তরুণ দলের ঝাঁপিয়ে পড়া।

সে এক ধূম ধাত্তর ব্যাপার! ছোঁড় চেয়ার, ভাঙ টেবিল, চালাও লাঠি, ছেঁড় টিকি! মার জোয়ান! হেইয়ো! পটাস? উ-হু-হু!!

বাস! পলকে পেল্লায়! বুড়োর দল, পণ্ডিতের দল বিষ্টিতে ছাগলের মতো যে যে দিকে পারলে দিলে চোঁ চোঁ দৌড়।

ছেলেদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই সদ্য উৎপাটিত গুচ্ছ গুচ্ছ টিকি! মনে হলো শত শত কালি সিংহ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই টিকি ছেঁড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন শত শত মহিলা, যাদের উদ্ধারকল্পে এইসব টিকির দল জমায়েত হয়েছিলেন।

বুড়োরা সত্যই কি এবার নি-কশ হল? নৈষ্ঠিক নি-টিক হল?

৪

বিবাহ-আইন বিল

লাগ লাগ লাগেয় মাটি
যে হারে তার কান কাটি !

বড় মিঞাদের রাজ পরিষদে অর্থাৎ 'অ্যাসেমব্লিতে' বিবাহ আইন বিল পাস হতে দেখে বুড়োদের দল মুক্ত-কচ্ছ হয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন—গেল রাজ্য, গেল মান, ধর্ম কর্ম সব গেল।

বটেই তো। বেচারাদের তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের যে দফা নিকেশ হলো তাহলে ! মেয়েগুলো বিয়ে হবার আগে ডাগর-ডুগর হয়ে গেলে যেসব বুঝে ফেলবে। তখন কি আর ফোকলাদন্তী চুপসায়িত কপোল অষ্টাবক্রীয়-কটী বুড়োদের ওরা বিয়ে করতে চাইবে ? ইয়া আল্লা ! ই কি গজুব !

চারিদিকে দিয়ে বুড়ো আর তরুণ মনের টুঁসাটুঁসি লেগে গেছে। দেখা যাক, কে হারে কে জেতে।

এর পরেও যদি বুড়োরা না মরে, তাহলে আমরা বলি, 'কর্তা ! আমরা তোমার গলায় দিয়া দিমু ফাঁসি !'

৫

চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে !

ফ্যাসাদ কি শুধু সাহিত্যে, কৌন্সিলে, অ্যাসেমব্লিতেই বেধেছে ?—জোয়ান বুড়োর এ লড়াই পলিটিকসে কংগ্রেস পর্যন্ত গড়িয়েছে !

সেখানেও মহাত্মা গান্ধি কংগ্রেসের সভাপতি হতে নারাজ হয়ে তরুণ দলের প্রতিনিধি জহরলাল নেহরুকে সুপারিশ করেছেন ঐ গদির গদ্দিনশিন করবার জন্য।

হায় ব্রুতাস, তুমিও ! বুড়োদের বদন ক্রমেই ব্যাদিত হয়ে চলেছে !

বুড়োরা তো অনেকেই আফিম খান, আমরা বলি কি, ওর মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিল না ওঁরা। সব ল্যাঠা একদিনেই চুকে যাক !

ঠুঁটো জগন্নাথের দল ! গাল দিই কি সাধে ! যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই পাঁশ নৈবিদ্য।

৬

'হায় জানতি পার না।'

সেদিন তুমুল তর্ক দুই নেতায় ! যাকে বলে মেড় টুঁস। একজন বলছিলেন, 'আরে ইতা কিতা কন ! স্বরাজ আমাদের তো ওইয়াই গেছে ! সেতুবন্ধ বাইন্দ্যা ফেলছি। অ্যাহন

ফাল দিয়া উৎকা মাইর‍্যা হালার লঙ্কায় গিয়া পড়লেই অয় ! সোলেমান বাদশার লাহান উ হালায় ও মইর‍্যা বুত ওইয়া গ্যাছে। হ্যালা-মারছেন কি—উপ্‌পুত ওইয়্যা যাইবো !'

আর একজন বলছিলেন, 'দেখুন আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একজন মিস্তিরি অস্ত্র তৈরি করত। সে একদিন দেশের রাজার কাছে এসে হাম্বাই তাম্বাই করতে লাগল,—হুজুর, আমার মতন তলওয়ার তৈরি করতে পৃথিবীতে কেউ পারে না। রাজা বললেন, 'কি করে বুঝব ?' মিস্তিরি বললে, 'আমি আমার তলোয়ার দিয়ে এমন সাফ সাফ গলা কেটে দিব যে, সে জানতেই পারবে না, এমন ধার।'

রাজার খেয়াল, লোক ধরে আনা হল। মিস্তিরি আস্তে গলার ওপর দিয়ে তার তলোয়ার চালিয়ে দিলে ! লোকটা কিন্তু তখনো দিব্যি দাঁড়িয়ে হাসছে, যেন কিছুই হয়নি। রাজা বললেন, ওর যে গলা কাটা গেছে কি করে বুঝব ? মিস্তিরি অমনি তার নস্যির কৌটা থেকে এক চিমটি নস্যি নিয়ে যেমনি লোকটার নাকে দেওয়া, অমনি হ্যাচচো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মাথা টুপ করে পড়ে গেল, 'কি মশাই বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

আগের লোকটি বলতে বলতে উঠে গেলেন, 'আপনোগর প্যাটে মায়ের ডাকই হান্দায়নি, বুঝবোন কিদুন কইর‍্যা ?'

৭

ফল ইন (লভ নয়) ওয়ার !

নিরস্ত্র ভারতে নখদন্তহীন ভেতো বাঙালির নিরামিষ 'সেনা-বাহিনী'র পতি ওরফে 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 'মারশিয়াল' সুভাষচন্দ্র বসু 'রেজিমেন্টাল' অর্ডার বের করেছেন—তার 'ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাওয়া' রিজার্ভ ফোর্সের সেনাদের 'ফল-ইন' করতে। 'বোনাফাইড' বাঙালি ছেলেদের 'ফল-ইন-লভ'-টাই রপ্ত হয়ে গেছে, লড়ালড়ির 'ফল-ইন'টা তাদের হয়ে শতাব্দী পূর্বে পিতৃপুরুষেরাই করে গেছেন। কাজেই 'মারশিয়াল' (সেনাপতির) হুকুম তারা যে মানবে তা তো মনে হয় না। বাঙালি মেয়েরা দিব্যি পতিপ্রাণা কিন্তু ছেলেরা রীতিমতো অসতী ! তাদের দলের পতিকে বড় একটা কেয়ার করে না ! তবে যারা আসবে, তারা এই ভরসাতেই আসবে যে, আপাতত যুদ্ধের মতো বদখত কোনো জিনিস তাদের মহাবেরা করতে হবে না ! এ সেনাদল শুধু নিরস্ত্র নয়, নি-লাঠি ! আর মাঠে কুচকাওয়াজ যা হবে তা শুধু পায়েরই কসরৎ। কাওয়াজে'র কাজ নাই, শুধু কুচের কাজ। তা বাঙালির বিপদে আপদে ছুট দেওয়া যাঁরা দেখেছেন, তারাই বলবেন যে, ও জিনিসটে বাঙালি মায়ের পেট থেকেই শিখে আসে।

খবরটা পড়ে শুনলাম নানি বিবিকে। তিনি মুখটা সিগ্যারেট মিক্‌স্‌চারের পাউচের মতো কুঁচকে বললেন, 'নেংটির আবার বখেরা সেলাই !'

৮

ধনে প্রাণে মারা যায়

এক যাত্রায় পৃথক ফল! ইংরেজের আইন বড় মজার! আঠারো বছরের কমবয়সী কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের প্রেমে বা হ্যাপায় পড়ে গৃহ বা কুলত্যাগিনী হয়, তাহলে সে অকূলে পড়ে না আইনের প্যাঁচে। কিন্তু পুরুষের স্ত্রী ঘর বা শ্বশুরালয় বাস হয়ে যায়, বেশ কয়েক বছরের জন্য। 'অক্ষয়কুমার লীলাবতীর' লীলারঙ্গে লীলাময়ী যিনি, তিনি ঐ আঠারো বছরের কম বলে (নিজে অক্ষয়ের বাড়ি চলে গেছিলেন ইনি!) অবলীলাক্রমে আইন পিছলে বেরিয়ে এলেন, আর চোর দায়ে ধরা পড়ল বেচারা পুরুষ! আমরা বলি কি, এটা সাম্যবাদের যুগ! পুরুষ মেয়েতে সমান সুবিধা, সমান শাস্তি দেওয়া হোক! অর্থাৎ এইবার থেকে আইন হোক, আঠারো কম কোনো পুরুষ ঐরকম অপরাধ করলে তার কেস ডিসমিস হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ে যদি তার বেশি বয়সী হয়, তবে শাস্তি হবে! বেচারা পুরুষ! সাধে কি কবি লিখেছিলেন :

'রমণী পিরীতি করে তেল মাখে গায়,
ধরিতে কিনা ধরিতে পিছলিয়া যায়!'

কিংবা—

'তেল থাকে হাতে লেগে, রমণী পালায়।'

বেচারা অক্ষয়কে পাঁচ বছর ঠেলেছে! রায় শোনার পরই সে আফিম খেয়ে ফেলেছিল এক ড্যালা! কিন্তু মরবারও স্বাধীনতা নেই বেচারার! মেডিক্যাল কলেজে পেটে বোমা মেরে সে আফিম বের করেছে। অক্ষয় বোধ হয় এই ভেবেই আফিম খেয়েছিল যে,

'কাঁঠাল যা তুমি খেলে
আমার গলায় বাধল বিচি!'

ধনে প্রাণে মারা যাওয়া আর কাকে বলে?

হক সাহেবের হাসির গল্প

বাংলার প্রধানমন্ত্রী 'অনারেবল' হক সাহেব যে সুন্দর গল্প বলতে পারেন, তা আগে জানতাম না। তবে তাঁর কথায় কথায় চমৎকার ব্যঙ্গ, রসিকতা ও হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছি। সকল শ্রোতাই হাসিতে ঘর পূর্ণ করে তা উপভোগ করেছেন। হক সাহেব সর্বদাই হাসি-মুখ। ভীষণ ক্রোধের পরক্ষণেই মুখে বালকের মতো সরল হাসির ফুল ফোটে।

দিন-দশেক আগে তাঁর দুটি গল্প শুনেছি। 'নবযুগের' পাঠক-পাঠিকাদের সেই গল্প দুটি উপহার দিচ্ছি। এর পরেও মাঝে মাঝে তাঁর হাসির গল্প উপহার দেবো।

তিনি বহু সভায় এবং বাড়িতে লোকজনের সামনে বহু হাসির গল্প সৃষ্টি করে বলেছেন। তাঁর শুধু হাসির গল্প বলা নয়, সভার অবস্থা বুঝে সুন্দর সুন্দর অন্য ধরনের গল্প বলারও বড় অসাধারণ ক্ষমতা আছে। হক সাহেবের সভার বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা এর সাক্ষ্য দেবেন। প্রথম গল্পটি বলছি শুনুন। গল্পটির নাম :

মরা কাউয়া

[মরা কাক]

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরূপে ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য হক সাহেবকে আমন্ত্রণ করেন। হক সাহেব দিল্লি গিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সাথে আলোচনা করার পর যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দলে দলে খবরের কাগজের প্রতিনিধি ও লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'স্ট্যাফোর্ড সাহেবের সাথে আপনার কি কথা হলো?' হক সাহেব হেসে একটি হাসির গল্প বললেন। গল্পটির মর্ম এইরূপ : এক ছিলেন পণ্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার করে বৃদ্ধ বয়সে দিন-রাত বই-পত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুজে যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছুদিন চললে সংসার চলবে না ; উপোস করে মরতেও হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পণ্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে বলতে লাগলেন—'এই চোখ বুজে টিকি উঁচিয়ে বসে থাকলে ছেলেমেয়েরা খাবে কি? বাড়িতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এইসব ভণ্ডামি করে কি টাকা পাওয়া যায়?' ব্রাহ্মণ তেরিয়া হয়ে বললেন, 'কি? এসব ভণ্ডামি? তুমি আমার যোগের শক্তি দেখবে? আমি সাত দিনের মধ্যে সাত হাজার টাকা এনে দেবো।' ব্রাহ্মণী বললেন, 'ভীমরতি হয়েছে! চল্লিশ বছরে এক সাথে এক হাজার টাকা পারলেন না, সাত দিনে সাত হাজার টাকা দিবেন!' ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখে নিও।' পণ্ডিতের গোটা বিশেক লুকানো টাকা ছিল, তাই তার গাডু গামছা নিয়ে পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন। শহরে গিয়ে দুএকজন ধূর্ত লোক যোগাড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন, এক মহাযোগী ব্রাহ্মণ এসেছেন হিমালয় থেকে, তাঁর কাছে একটা মরা-মানুষের মাথার খুলি আছে, সেই মাথার খুলিকে যে যা জিজ্ঞাসা করে, সে তার সঠিক উত্তর দেয়। শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল বেশি কথা, কম কথা অনুসারে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। সন্ধ্যা হতে না হতেই দলে দলে লোক এসে হাজির হল। ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে সব লোককে আসতে দিলেন না। একটা পর্দা টাঙিয়ে একটি একটি করে লোক আসতে দিলেন। প্রথমে যে লোকটি এল সে দশটি প্রশ্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ পাঁচ টাকা চার্জ করলেন। ব্রাহ্মণের হাতে টাকা দিয়ে সে বলল, 'মরা মানুষের মাথার খুলি কই?' ব্রাহ্মণ একটা ঝুড়ি তুলে বললেন, 'এই।' সে রেগে উঠে বললে, 'এ যে মরা কাউওয়া, খুলি কই।' ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলে বললেন, 'খুলি-টুলি মিথ্যা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ছেলেপিলে খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে—তুমি এ কথা

কাউকে বোলো না, বললে তোমাকে সবাই হাঁদা'বোকা আরো কত কি বলবে। মনে করো দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করলে। তোমার মঙ্গল হবে বাবা, মঙ্গল হবে। সে লোকটি আর একবার মরা কাকের দিকে করুণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই হেসে ফেলল। লোকটি ছিল কায়স্থ। যত লোক তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'খুলি কি সত্যিই কথা কয়?' সে উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখন ও নিশ্চয় কেল্লা ফতে করেছে। ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করে কে আগে যাবে, তার চেষ্টা করতে লাগল। যে যায় ব্রাহ্মণ তাকে ঐ এক কথাই বলে—আগে টাকা নিয়ে। কেউ কথা বলল না, পাছে অন্য লোকে তাকে বোকা বলে। এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের সাত হাজার টাকা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে সগর্বে বলল, 'এই নে সাত হাজার টাকা। আর আমায় কিছু বলিসনে। আমি লঙ্কা বিজয় করে এসেছি।' ব্রাহ্মণী বদন-ব্যাদান করে এক হাত জিভ বের করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় গল্প

পাড়াগাঁয়ের গরিব মুসলমানদের মধ্যে একজন মোড়ল ছিলেন। তাঁকে সকলে ফকিরজি বলে ডাকত। তিনি দিনরাত আল্লা নাম জিকির করতেন। তাঁর গায়ে সর্বদা থাকত একটি চাদর। সেই চাদরে লেখা ছিল কোরান শরিফের অনেকগুলি বিখ্যাত সুরা (শ্লোক)। সেটিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। সেই চাদর গায়ে দিয়ে গ্রামের লোকদের অনেক মাজেজা (বিভূতি) দেখাতেন, রোগ ভাল করতেন, তাদের মাঠে বেশি ফলন ফলাতেন ইত্যাদি। আর এক গ্রামের মোড়ল তাই দেখে মনে করল—ঐ মোড়লের যা কিছু শক্তি, ঐ চাদরের গুণে। ওকে যে গ্রামের—এবং পাশের অনেক গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করে খাওয়ায় তার কারণ ঐ চাদরের শক্তি। ঐ চাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেই আমাকেও সকলে সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা করবে, পির বলে মানবে। এই ভেবে একদিন সে হাত জোড় করে সেই ফকিরকে নিমন্ত্রণ করে এল রাত্রে খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় সেই ফকির এসে হাজির হলেন অন্য গ্রামের মোড়লের বাড়িতে। তখন সে তার দলবল নিয়ে রাম দা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি তোমার গাঁয়ের ঐ চাদর আমাকে না দাও, তা হলে তোমাকে কোতল করব।' বেচারা ফকির ওর রক্ত-চক্ষু আর রামদা দেখে গায়ের চাদর দিয়ে পালিয়ে এল।

ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে সগর্বে পাড়া বেড়িয়ে এল। আড়-চোখে দেখতে লাগল, কেউ চেয়ে দেখে কিনা। কেউ এসে সালাম করে কিনা। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, 'মোড়ল! খবর সব ভাল তো?' মোড়ল হতাশ হলো না। মনে করল, দু-চারদিন গায়ে দিতে দিতে এর শক্তি বেরিয়ে পড়বে। দিন পনেরো ক্রমে ক্রমে একমাস গায়ে দিয়েও কোনো শক্তি পেয়েছে বলে মনে হল না। গ্রামের লোক হাসে আর বলে, মোড়লের মাথা খারাপ হয়েছে।

এদিকে ফকির চাদর হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। চাদরের শোকে কাঁদতে লাগলেন। এই চাদর তিনি মক্কা-মদিনাফেরত এক হাজির কাছে পেয়েছিলেন। একদিন ফকিরজি আর থাকতে না পেরে নদীর ধারে সারা রাত্রি জেগে জিকির করেন আর কাঁদেন! ভোরের সময় একজন ফেরেশতা (দেবদূত) এসে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার চাদর তুমি ফিরে পাবে। ও গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে কোনো শক্তি পায়নি। সে তো আল্লাকে ডাকে না। ধৈর্য ধরো, আর কিছু দিন গায়ে দিয়ে ও তোমার চাদর আবার তোমায় ফিরিয়ে দেবে।'

ফকির আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

এক সাহেব বালকের মতো হাসি হেসে বললেন, 'ঐ ফকিরের চাদরের মতো মুসলিম লীগ ওরা কেড়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন আমি জানতে পেরেছি, আমার চাদর অর্থাৎ আমার মুসলিম লীগ আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।' সকলে সোল্লাসে হেসে উঠলেন।

নবযুগ,
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯

ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা

আয়নার ফ্রেম

আয়না : আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত গল্পগ্রন্থ

এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায় কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে-সমস্ত মানুষ হরেকরকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপমূর্তি—বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখোশপরা এই বহুরূপী বনমানুষগুলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে বক্তৃতার মঞ্চে, পলেটিকসের আখড়ায়, সাহিত্য-সমাজে যেন বহুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার যা কদর আছে, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সাহিত্যে তা নেই। ইংরেজি সাহিত্যে জেরোম ও বার্নার্ড শ-র সুউচ্চ আসনই ইংরেজি পাঠক-সাধারণের রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিচ্ছে। শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, সমৃদ্ধিশালী সমস্ত সাহিত্যেই ব্যঙ্গ-সৃষ্টি অভিনন্দিত হয়েছে। ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যই 'ল্যামপুন' ও 'স্যাটায়ার'-এ সমৃদ্ধিশালী এবং তার স্রষ্টারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাহিত্য খুব উন্নত হয়নি, তার কারণ, ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিড়বে না। আমি একবার এক ওস্তাদকে লাঠি দিয়ে সরোদ বাজাতে দেখেছিলাম। সেদিন সেই ওস্তাদের হাত সাফাই দেখে তাজ্জব হয়েছিলুম। আর আজ বন্ধু আবুল মনসুরের হাত সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম। ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ। এ যেন পাকা ওস্তাদি হাত।

আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ ; আর সে কামড় গিয়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতোই করুণ।

কিন্তু সে হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, সে কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তারাই। বন্ধুবরের এই রসাঘাত কশাঘাতেরই মতো তীব্র ও ঝাঁঝালো। কাজেই এ রসাঘাতের উদ্দেশ্যে সফল হবে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে।

বন্ধুর আয়নার এই-ই আমার ফ্রেম।

'হারামণি'

হারামণি-(গ্রাম্য গানের সংগ্রহ) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম. এ. সম্পাদিত।
কবিসম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা-সংবলিত।
প্রাপ্তিস্থান : প্রবাসী কার্যালয় ; ১২/২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
মূল্য—১০ টাকা।

ভৈরব নদীর তীরে ঝাউতলায় নিরালায় বসে 'হারামণি' দেখছিলাম। মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ মর্মর ধ্বনি, দূরে গো-চারণের মাঠে রাখালের তলতা বাঁশের সুর, সামনে উদাস মাঠের বুকে হাটুরে পথিকের পায়ে-চলা পথ ; মনে হচ্ছিল—'হারামণি'র গান যদি শুনতে হয়, তাহলে এমনি নিরালা একটু স্থান খুঁজে নিতে হয়। সাথে থাকবে এমনি 'একতারা'র মতো অপ্রখর নদী-স্রোতের মৃদুল গুঞ্জন।

এ গানে বাংলার স্নেহ-সিঞ্চিত ভেজা মাটির গন্ধ, বাংলার নিরক্ষর পল্লীকবির অনাড়ম্বর প্রকাশ-স্বচ্ছতা, নিরাবিল প্রাণ, নিস্তরঙ্গ-স্তব্ধতা ; এ তো কোলাহলমুখর জলসার জন্য নয়। কাকাতুয়ার স্বর শুনে যারা অভ্যস্ত, 'একতারা'র এই ভ্রমরগুঞ্জন তারা হয়তো শুনতেই পাবে না।

ক্লারিওনেট আর তানপুরার আসরে মেঠো রাখালকে তিনি ধরে এনেছেন ; আর কার কেমন লাগবে জানিনে, কিন্তু আমার চোখে জল এসেছে।

'বন্দীর বাঁশী'

শ্রীমান বে-নজীর আহমদকে আমি জানিতাম তাহাদেরি একজন রূপে—যাহারা মৃত্যুর মুঠায় জীবনের সঞ্চয় খুঁজিয়া ফেরে। এদিক দিয়া সে সত্যই মুসলিম তরুণদের মাঝে বে-নজীর ; এরূপ আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একদিন দেখিলাম, সে কবিতা লিখিতেছে, অগ্নিশিখা সন্ধ্যা-প্রদীপের স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মৃণালে কন্টকের জ্বালা সহিয়া পদ্মফুল যেমন সূর্যের স্তব করে, এ যেন তেমনি। দুর্যোগের নিবিড় নিশীথের দুঃসাহসিকা যাত্রীর মুখে আনন্দ-ভৈরবীর সুর—সত্য সত্যই বিস্ময়কর।

অন্ধ কারার সঙ্গীহীন অবকাশ সে ভরিয়া তুলিয়াছে এই কবিতা কয়টি দিয়া। মরুভূমিতে খর্জুর যেমন করিয়া রস আহরণ করে ; নিষ্প্রাণ নিরানন্দ কারাগৃহে এ হয়তো তেমনি করিয়াই কাব্যরস সঞ্চয় করিয়াছে। অদ্ভুত জীবনীশক্তি যাঁহাদের, ইহা বোধহয় শুধু তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব।

বে-নজীরের কাব্যে বন্দীর আকূতি, মুক্তির উদগ্র বাসনা, সৌন্দর্যের অসীম ক্ষুধা যে ভাষা, যে সংযম লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোনো নবীন কবির পক্ষে বিস্ময়কর। ত্রুটি-বিচ্যুতি যে নাই এমন কথা বলি না, তবু কাঁটার ঊর্ধ্বে যে ফুল ফুটিয়া

উঠিয়াছে, আমি শুধু তাহাকেই দেখিয়াছি। কাব্য-কাননে তাহার স্থান আছে। প্রথম জোয়ার যখন আসে, তখন সে কূলের বন্ধনকে স্বীকার করিতে চায় না। এই আবেগ যেদিন সংযত হইবে, ছন্দের দুই কূলকে স্বীকার করিয়া এই কবির কাব্য-স্রোত সেদিন অপূর্ব সংগীতে বাজিয়া উঠিবে। হয়তো বা তাহার আর দেরিও নাই।

পাষাণ-কারার বন্ধন-মুক্ত যে বাণীর ধারা আপনার বেগে আপনি আসিয়া বাংলার সমতলভূমিতে নামিয়া পড়িয়াছে, সে ধারা আপনার পথ আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিবে। আমি শুধু সশ্রদ্ধ অঙ্গুলি-সংকেতে তাহাকে নির্দেশ করিয়া গেলাম।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৩৯

'দিলরুবা'

দিলরুবা (কাব্যগ্রন্থ)—আবদুল কাদির প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পি.সি. সরকার এন্ড কোম্পানি, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

তরুণ কবিদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার কবি আবদুল কাদির তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁর 'দিলরুবা' অবশ্য এর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। কবি যখন নীহারিকা-লোক থেকে হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখছিলেন, সেইদিনের প্রকাশ-অপ্রকাশ বিজড়িত, ইঙ্গিত-সংগীত-রহস্যমাখা, কইতে পারা-না-পারার আভাস এর অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। তবু 'দিলরুবা'র হৃদয়তন্ত্রীতে যে সুর শুনি এ যুগের নাম করা বহু কবির বাঁশিতে সে সুর শুনতে পাইনে। এর ভাগ্যলক্ষ্মীর চোখে অতল রহস্য, নিবিড় গভীরতা। প্রথম প্রথম আলাপ করতে একটু ভয় হয়, কিন্তু ভয় ভেঙে গেলে তখন আর পৃথিবীর কোনো কিছু মনে থাকে না। এ-সুর মাঠের রাখালের তলতা বাঁশির মেঠো সুর নয়; গুণীর হাতের 'দিলরুবা'র আলাপ শুনে বুঝবার মতো সমঝদার যাঁরা, এ তাঁদেরই জন্যে।

আমরা এ যুগে যে কয়জন শুভ্র-মুক্তবুদ্ধি কবি ও সাহিত্যিকের জন্য গৌরব অনুভব করি, আবদুল কাদির তাঁদেরই একজন। কাজেই, এঁর চিন্তায় ভাষায় ভাবে যে স্বাধীনতা যে পালিশ দেখতে পাই, তা আর কোথাও দেখতে পাইনে। হয়তো সেইজন্যই এঁকে অনেকের ভালো লাগবে না, কারণ আমাদের চোখ জবরজং জিনিস দেখে দেখেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অত পালিশের জৌলুস আমাদের অনেকেরই সইবে না। এঁর :

'সে রূপ-দুলালী কভু দিবসের বিলাস-পাণ্ডুর
দূর অস্তপারে
দেহ-সন্ধ্যাগ্নিরে তার লুকাইত বিরহ-বিধুর
রাত্রির অঙ্গারে।

বসন্তে ঐশ্বর্য সাথে সে আসিত, ঝরিত শ্রাবণে
তার অশ্রুধারা ;
শারদ-সুষমা শেষে হেমন্তের হিম আবরণে
হইত সে হারা॥'

পড়ে 'বুঝবার ও বুঝে' রস গ্রহণ করার মতো রসিক খুব বেশি নেই।

জলসায় বসেই চমকিলা সুরের চটক লাগিয়ে যাঁরা তাক লাগিয়ে দেন, কাদির তাঁদের দলের নন। এর সংগীতের সুর আচ্ছন্ন করে এর গান হয়ে যাওয়ার বহু পরে—কোলাহল যখন স্তব্ধ হয়ে যায়। এঁর 'দিলরুবা'র সুর শুনতে হয় তমস্যা-ঘন নিথর নিশীথে। দিনে যে সমুদ্রের গর্জন শুনি ভীতিবিহ্বল চিত্তে, রাত্রে শুনি সেই কল্লোল-ধ্বনি সংগীত-রূপে। তবু মনে হয়, এর 'দিলরুবা'-কে দিল দিবার মতো দিলদারি এ যুগেও অনেক জন্মেছে।

'আগামীবারে সমাপ্য'

এমপায়ার বুক হাউস হইতে মৌলভী মাহফুজার রহমান খান কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীমান মোহাম্মদ কাসেমের 'আগামীবারে সমাপ্য' পড়লাম। পড়ে ভালো লাগল—এইটুকু বললেই যেখানে যথেষ্ট বলা হয়, সেখানেও ইনিয়েবিনিয়ে, সেই ভালো লাগাটাকে বোঝাবার আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হবে।—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর নেই।

শ্রীমান কাসেম তরুণ কথাশিল্পী। কয়েকটি সুন্দর গল্প লিখে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা ধারালো, ভাষা জোরালো। কথার মাঝে মাঝে উপমাগুলি ঝর্নার স্বচ্ছ উপল-নুড়ির মতো কাঁকন-চুড়ির সৃষ্টি করে চলেছে।

এঁর লেখা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে—পীড়িত অসহায় মানুষের জন্য সত্যিকার বেদনাবোধ। এই বেদনাবোধের আবেগে আবেগে কথার স্রোত আপনি ছুটে চলেছে উদ্দাম ফেনিল গতিতে।

'আগামীবারে সমাপ্য' সত্যিই আগামীবারে সমাপ্য। উপন্যাসের যেখান থেকে শুরু হবার, লেখক সেইখানে এসে থেমেই গেছেন। হয়তো আগামীবারেই সমাপন হবে—বইয়ের নামে ও তাড়াতাড়ি বই শেষ করায় তাই মনে হয়।

সত্যিকার উপন্যাস কোনো মুসলমান লেখক লেখেননি, লিখতে পারেননি। তবু যে কয়খানি ভালো উপন্যাস তাঁরা লিখেছেন, তার মধ্যে 'আগামীবারে সমাপ্য' অন্যতম।

এঁর হৃদয়ে আবেগ আছে, ভাষায় তীক্ষ্ণতা আছে, তারো বড়—অন্তর আছে। কাজেই শ্রীমান কাসেম অদূর ভবিষ্যত একজন সত্যিকার গল্পী হয়ে উঠবেন—এ আমার সত্যিকার বিশ্বাস। আমাদের কবি-কন্টকিত বনে তিনি সত্যিকার কথা-কাহিনীর ফুল ফুটিয়ে তুলুন, এই আশির্বাদ করি।

'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'

'শেকওয়া ও জওয়াবে-শেকওয়া'—মোহাম্মদ সুলতান অনূদিত

সুলতানের 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া'র কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল 'শেকওয়া ও জওয়াবে-শেকওয়া' পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই 'শেকওয়া ও জওয়াবে-শেকওয়া'। উর্দু—ভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ 'শেকওয়া'র বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমি ওতে হাত দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হলাম, অরিজিন্যাল ভাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতি-ভঙ্গি দেখে। পশ্চিমের বোরকাপরা মেয়েকে বাংলার শাড়ির অবগুণ্ঠনে যেন আরো বেশি মানিয়েছে।

'সাঁঝের মায়া'

কবি সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'র ভূমিকা

কয়েক বৎসর আগের কথা।

কল্যাণীয়া কবি সুফিয়া এন. হোসেন তখন হেরেমের বন্দিনী বালিকা। তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজ-প্রতিম বন্ধু সৈয়দ নেহাল হোসেন সাহেব আমায় কয়েকটি কবিতা দেখতে দিলেন। আমার বিশ্বাস হলো না যে সে কবিতা কোনো মুসলিম বালিকার লেখা। আমারই উৎসাহ ও অনুরোধে বোরকা নেকাবের অন্ধস্তূপ থেকে সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জ শঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করল।

আজ কবি সুফিয়া যখন স্বনামধন্যা, তখন সবচেয়ে আনন্দিত হতেন, গৌরব বোধ করতেন যিনি, সেই শ্রীমান নেহাল হোসেন নাই। তাঁরই উৎসাহ দখিন হাওয়ার মতো সুফিয়ার কবিতার দলগুলি বিকাশের সহায়তা করেছিল। ঘেরাটোপ-ঢাকা পিঞ্জরের বুলবুলকে তিনিই মুক্তি দিয়েছিলেন, বুঝি এরই অপেক্ষা তিনি করছিলেন। বদ্ধ বুলবুলের কণ্ঠ যখন অবগুণ্ঠনের ব্যথা অতিক্রম করে দিগদিগন্তে ধ্বনিত হলো। তখন মুক্তিদাতারও মুক্তির ঋণ এল। কিন্তু সেই বিদায়—'সাঁঝের মায়া' শাশ্বত হয়ে রইল। তার অবেলায় বিদায়-নেওয়া বন্ধুকে প্রিয়তমকে স্মরণ করে বুলবুলের কণ্ঠে যে সকরুণ সুর অনুরণিত হয়ে উঠল, তার তুলনা যে কোনো সাহিত্যে বিরল। বেদনার এই ঘন বর্ষণ না হলে বুঝি গানের পাখি এ গান গাইত না, বনের চোখে জুঁই ফুলের অশ্রু ঝরত না।

'সাঁঝের মায়া'র কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতোই যেমন বিষাদ-ঘন তেমনি রঙিন গোধূলির রঙের মতো রঙিন। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণ-তিথির সন্ধ্যা নয়, শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যা। প্রতিভার পূর্ণ চন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনাপুঞ্জিত অন্ধকারের প্রয়োজন আছে। নিশীথ-চম্পার পেয়ালায় চাঁদিনির, শিরাজি এবার বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয়, 'সাঁঝের মায়া'ই তার অনুপম নিদর্শন।

এ কবিতার ফুল ফোটাতে পারলে কাব্য-মালঞ্চের যে কোনো ফুলমালি-কবি নিজকে ধন্য মনে করতেন।

কবি সুফিয়া এন হোসেন বাংলার কাব্য-গগনে নবোদিত উদয়-তারা। অস্ত-তোরণ হতে আমি তাঁকে যে বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম, এ আনন্দ আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'পথ-হারার পথ'

লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার পরলোকগত শ্রীবরদাচরণ মজুমদার প্রণীত।
মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলা থেকে ১৩৪৭ বৈশাখে প্রকাশিত।

বহু বৎসর আগের কথা। বাংলার সাহিত্য-আকাশে আমার উদয় তখন ধূমকেতুর মতো ভীতি ও কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছে। গত মহাসমরে রক্তস্নাত রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য আমার রক্তধারায় ছন্দ-হিল্লোল তুলিয়াছে। আমি তখন আবিষ্টের মতো লিখিতেছি, তাহার কোনো অর্থ হয় কিনা জানিতাম না ; কিন্তু মনে হইতেছে তাহার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল যাঁহার ইচ্ছায়, সেদিন তিনি আমায় এমনি গ্রাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নাই। এক সাথে যশের সিংহাসন, গালির গালিচা, ফুলের মালা, কাঁটার জ্বালা-আনন্দ আঘাত পাইতে লাগিলাম। কিন্তু যিনি আমায় চালাইছিলেন, সেই অদৃশ্য সারথি আমায় চলিতে দিলেন না। নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম। মনে হইত, তাঁহাকে আজও দেখি নাই, কিন্তু দেখিলে চিনিতে পারিব। এই কথা বহুবার লিখিয়াছি ও বহুসভায় বলিয়াছি।

সহসা একদিন তাঁহাকে দেখিলাম। নিমতিতা গ্রামে এক বিবাহসভায় সকলে বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখিতেছে আমার প্রলয়সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহসভায় আমার বধূরূপিনী আত্মা তাহার চিরজীবনের সাথীকে বরণ করিল। অন্তপুরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি হইতেছে, স্রকচন্দনের শুচি-সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে, নহবতে সানাই বাজিতেছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দ-বাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম, তিনি এই গ্রন্থগীতার উদগাতা—শ্রী শ্রী বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পথপ্রদর্শক। সাধনপথের প্রতি পথিক আজ তাঁহাকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁহাকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেইদিন হইতে আমার বহির্মুখী চিত্ত, অন্তরে কাহার যেন অভাব বোধ করিতে লাগিল। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ংকর রুদ্রের চেলারা ভ্রূকুটিভঙ্গে ভয় দেখাইতেছে, আমি ধূমকেতু-রূপে সেই রুদ্র ভৈরবদের মশাল জ্বালাইয়া চলিয়াছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজিতেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মৃত্যুর সাগরে হারাইয়া গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমায় ধর্মরাজ–রূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ধর্মরাজ আমার হাত ধরিয়া তাঁহারই কাছে লইয়া গেলেন যাঁহাকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহসভায় দেখিয়াছিলাম, ধ্যানে বসিয়া আবিষ্টের মতো তাঁহাকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষবার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার চিরকালের ধ্যেয়, তাঁহার জ্যোতিঃরূপ দেখিলাম। তিনি আমার হাতে দিলেন যে অনির্বাণ দীপ–শিখা, সেই দীপ–শিখা হাতে লইয়া আজ বারো বৎসর ধরিয়া পথ চলিতেছি—আর অগ্রে চলিতেছেন তিনি পার্থসারথিরূপে।

আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি আমাকে চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম-ক্ষুধা আজও মিটে নাই, কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আমি আমার আনন্দ–রসঘন স্বরূপকে দেখিয়াছি। কি দেখিয়াছি, কি পাইয়াছি, আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই নাই। হয়তো আজ তাহা গুছাইয়া বলিতেও পারিব না ; তবুও কেবল মনে হইতেছে—আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।

যে অমৃত পারাবারের এক কণা মাত্র পাইয়া আমি আজ প্রমত্ত হইয়াছি, সেই অমৃত আজ পাত্র পুরিয়া আমার অমৃত–অধিক সকলকে পরিবেশন করিতেছেন, অমৃত–পিয়াসী যাঁহারা তাঁহারা আমারই মতো তৃপ্ত হইবেন, তৃষ্ণা তাঁহাদের মিটিবে, তাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তাঁহার যে দীপশিখা আমায় পথ দেখাইয়া অমৃত–সাগরের তীরে জ্যোতির্লোকের দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, সেই দীপশিখার প্রাণ এই গ্রন্থ। বহু পথহারা সাধক এই সাধনার দীপশিখার অনুবর্তী হইয়া পথ পাইয়াছেন—আজ তাঁহারা জীবনমুক্ত হইয়া দুঃখ–শোকের অতীতে স্থিত। সংসারকে 'মজার কুটির' জানিয়া তাঁহারা আজ আনন্দ–স্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন।

সারাজীবন ধরিয়া বহু সাধু সন্ন্যাসী যোগী ফকির দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল, আলোক পাইল, তিনি আমাদের মতো গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিব–স্বরূপ হইয়াছেন। এই গৃহের বাতায়ন দিয়াই আসিয়াছে তাঁহার মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি। তাঁহার সেই সাধনার ইঙ্গিত এই 'পথ–হারার পথে' রহিয়াছে।

আমার যোগসাধনার গুরু যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। সে–সময় আজিও আসে নাই। আমার যাহা–কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে–কাব্যে, সংগীতে, অধ্যাত্ম জীবনে, তাঁহার মূল যিনি, আমি যাঁহার শক্তি প্রকাশের আধার মাত্র, তাঁহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম। লোকে শ্রীরামচন্দ্রকেই দেখে,

তাঁহার পশ্চাতে যে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যাঁহার সাধনার ফল শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার কথা কয়জন ভাবে? এই দুর্দিনে এই বাংলা দেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহংকার, নিরভিমান, ব্রহ্মজ্ঞ-যোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাঁহার শক্তিতে আজ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালি উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সূর্যোদয়ের আগে যেমন অকারণ বিহগ-কাকলি ধ্বনিত হইয়া ওঠে, আমারও এই কয়েকটি অসংবদ্ধ কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দ-আকূতির ক্ষীণ আভাস মাত্র। আদেশ পাইলে এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিব ইচ্ছা রহিল।

'সুজনের গান'

'সুজনের গান' (গ্রাম্য গানের বই)-রচয়িতা ও সংগ্রাহক : গিরীন চক্রবর্তী। (হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোং লিঃ)।

শ্রীমান গিরীন চক্রবর্তী সংগীত-শিল্পীরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির ঊর্ধ্বে তাঁর যে নির্বিশেষ রূপে সেখানে তিনি কবি। পল্লি-সংগীতের প্রতি তাঁর প্রীতি—তিনি নিজে পল্লিকবি বলে। ভুঁইচাঁপার মালা-পড়া ভুঁই-মালীর মেয়ের মতো তাঁর কবিতার নিরাভরণ রূপ-'কালচারের' কালচে-পরা আভরণ-বহুল বিলাসী মনের কাছে হয়তো নিখুঁত মনে হবে না। পল্লিমেয়ের মতো এর ছন্দ ও গতি স্বচ্ছন্দ। তাতে নাগরিকার কৃষ্টি-ক্লিষ্ট নৃত্যময়ী রূপ খুঁজতে গেলে মন ও চোখ দুই-ই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। শহুরে সভ্যতার ক্লান্ত চোখ—ছুটিতে গ্রামে গিয়ে তার অর্ধ-অনাবৃত সহজ সুন্দর রূপ দেখে যেমন জুড়িয়ে যায়, আমার চোখ তেমনি জুড়িয়ে গেছে শ্রীমান গিরীনের সংগ্রহ ও স্বরচিত গানগুলির অনাড়ম্বর রূপ দেখে। এঁর গানগুলি পড়ে মনে হয়, পল্লি-সংগীত সংগ্রহ করতে করতে এঁর রসের আনন্দের ছোঁওয়া এর হৃদয় স্পর্শ করেছে।

সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করি—যত রকমে পারি জটিল কুটিল করে। প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গি বা 'ডিকশন'। পল্লি-কবিদের প্রকাশভঙ্গি পল্লীবাসিনীর মতোই সহজ সরল—কোথাও হয়তো অর্ধনগ্ন। কিন্তু সে নগ্নতায় বাসনায় আমন্ত্রণ নাই—আছে আত্মভোলা মগ্ন মনের মাধুরী। আজকালকার কবিতায় মিলের 'মিল এরিয়া' পেরিয়ে যে উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল-বিলের সহজ শ্রী, তাকে দেখতে হলে আমাদের পড়তে হয় নিরক্ষর পল্লিকবিদের গান ও কবিতা। এঁরা যেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ—এবং এঁরাই প্রকৃতির অন্তরে স্থান পেয়েছেন।

সেই আন্তরিকতার প্রেম শ্রীমান গিরীন পেয়েছেন, শুধু এইটুকু বলার জন্যই আমার এই ভূমিকা। শ্রীমান গিরীনকে জানি, চিনি, তাঁর লেখাতেও তাঁর সেই সহজ সাবলীল পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তিনি নিজেকে ফাঁকি দেননি, যা নন তা হতে চাননি; এতে তাঁর লেখা সার্থক হয়েছে।

জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড

১

(ওরে) ও চাঁদ ! উদয় হলি কোন জোছনা দিতে !
(দেয়) অনেক বেশি আলো আমার নবির পেশানীতে॥
(ওরে) রবি ! আলোক দিস যতো তুই দগ্ধ করিস ততো,
আমার নবি স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মতো,
(সে) নাশ করেছে মনের আঁধার ঈষৎ হাসিতে॥

(ওরে) আসমান ! তুই সুনীল হলি জানি কেমন করে,
আমার নবির কালো চোখের একটুকু নীল হরে।
(ওরে) তারা ! তোরা জ্যোতি পেলি নবির চাউনিতে॥

(ওরে) বসরা গোলাব ! অনেক বেশি খোশবু তোদের চেয়ে
সেই ধূলিতে মোর নবিজি যেতেন যে-পথ বেয়ে।
সেই বারতা ফুলকে শোনায় বুলবুলি সঙ্গীতে॥

২

হেরা হতে হেলে দুলে
নূরানি তনু ও কে আসে, হায় !
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা
খুলে খুলে যায়—
সে যে আমার কম্‌লিওয়ালা কম্‌লিওয়ালা॥

তার ভাবে বিভোল রাঙা পায়ের তলে
পর্বত জঙ্গম টলমল টলে,
খোরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল
ঝরে ঝরে যায়॥

আসমানে মেঘ চলে ছায়া দিতে,
পাহাড়ের আঁসু গলে ঝরনার পানিতে ;
বিজুলি চায় মালা হতে
পূর্ণিমা চাঁদ তাঁর মুকুট হতে চায়॥

৩

ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে
হেরা গিরির 'পরে !
শিরে তাঁহার লক্ষ কোটি
চাঁদের আলো ঝরে ॥

কী অপরূপ জ্যোতির ধারা নীল আসমান হতে
নামে বিপুল স্রোতে,
হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরুর পথে—
সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজ ঝলমল করে ॥

আগুনবরণ ফেরেশতা এক এসে
খোদার হাবিব জাগো জাগো, বলে হেসে হেসে ॥

নবুয়তের মোহর দিল বাহুতে তাঁর বেঁধে
তাজিম করে কদমবুসি করে কেঁদে কেঁদে ;
সেই নবিরই নামে আজি দুনিয়া দরুদ পড়ে ॥

৪

মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ-রাগে।
বুলবুলিরা উঠল গেয়ে মক্কার গুলবাগে ॥

খোদার প্রেমের কোন দিওয়ানা
দ্বারে দ্বারে দেয় রে হানা,
নবীন আশার আলো পেয়ে ঘুমন্ত সব জাগে ॥

এ কোন তরুণ প্রেমিক এলো কাবার অঙ্গনে,
সবুজ পাতার নিশান দোলায় শুকনো খেজুর বনে ॥

এলো নব দ্বীনের নকিব
চির-চাওয়া খোদার হবিব,
নিখিল পাপী তাপী যাঁহার পায়ের পরশ মাগে ॥

৫

ত্রাণ করো মওলা মদিনার
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গুনাহের ফাঁদে॥
নাহি কেউ ঈমানদার, নাহি নিশান-বর্দার,
মুসলিম জাহানে নাহি আর পরহেজগার
জামাত শামিল হতে যায় না মসজিদে,
পড়ে নাকো কোরআন, মানে না মুরশিদে।
ভুলিয়াছে কলমা শাহাদত
পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে॥
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ্-ফাঁসে
মেতে আছে সবে বিভব-বিলাসে,
বসিয়াছে জালিম শাহি তখতে তব
মজলুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব।
তলওয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামির জিঞ্জির বাঁধে॥

৬

আল্লা রসুল জপের গুণে কী হলো দেখ চেয়ে।
সদাই ঈদের দিনের খুশিতে তোর পরান আছে ছেয়ে॥
আল্লার রহমত ঝরে
ঘরে বাইরে তোর উপরে,
আল্লার রসুল হয়েছেন তোর জীবন-তরির নেয়ে॥

দুখে সুখে সমান খুশি, নাই ভাবনা ভয়,
(তুই) দুনিয়াদারি করিস, তবু আল্লাতে মন রয়।
মরণকে আর ভয় নাই তোর,
খোদার প্রেমে পরান বিভোর,
(এখন) তিনিই দেখেন তোর সংসার তোর ছেলেমেয়ে॥

৭

যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল,
হয়নি যাবার বেলা।
সংসার-পাথারে আজো দুলে পাপের ভেলা।
আজো হয়নি যাবার বেলা॥

মেটেনি তোমারে দেখার পিয়াসা,
মেটেনি কদম জিয়ারত আশা,
হজরত, এই জমেছে প্রথম
দীন-ই-ইসলাম মেলা॥

ছড়ায়ে পড়েনি তোমার কালাম
আজিও সকল দেশে,
ফিরিয়া আসেনি সিপাহিরা তব
আজো বিজয়ীর বেশে॥

দীনের বাদশা চাও ফিরে চাও
শোনো দুর্দিনে বেদনা ভোলাও
গুনাহ্গার এই উম্মতে তব
হানিয়ো না অবহেলা॥

৮

ফেরি করি ফিরি আমি
আল্লাহ্ নবীর নাম।
দেশ-বিদেশে পথে-ঘাটে
হাঁকি সুব্হ্-শাম॥

কলমা শাহাদতের বাণী
যে বারেক বলে একটুখানি,
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে
মোর সওদার দাম॥

দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারি
মিটায় দেনা;

অমূল্য এই আল্লাহ্‌র নাম
কেউ চাবে না।

আল্লাম্ নামের ফেরিওয়ালায়
ডাকে ওরা শেষের বেলায়,
ঐ নাম দিয়ে সে আখেরে পায়
বেহেশ্‌তি আরাম॥

৯
(ধাত্রী হালিমার উক্তি)

ওগো আমিনা! তোমার দুলালে আনিয়া
আমি ভয়ে ভয়ে মরি।
এ নহে মানুষ, বুঝি ফেরেশতা
আসিয়াছে রূপ ধরি॥

সে নিশীথে যখন বক্ষে ঘুমায়
চাঁদ এসে তাঁয় চুমু খেয়ে যায়,
দিনে যবে মেষ-চারণে সে যায়
মেঘ চলে ছায়া করি।
সাথে সাথে তার মেঘ চলে ছায়া করি॥

মনে হয় যেন লুকাইয়া রাতে তোমার শিশুর পা'য়
কতো ফেরেশতা হুরপরি এসে সালাম করিয়া যায়॥

সে চলে যায় যবে মরুর উপরে,
বসরা গোলাপ ফোটে থরে থরে,
তার চরণ ঘিরিয়া কাঁদে গুলবনে
অলিকুল গুঞ্জরি॥

১০

সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির,
বিরাজে রওজা মোবারক যথা মোর প্রিয় নবীজির॥

বাতাসে যেখানে বাজে অবিরাম
তৌহিদ বাণী খোদার কালাম,
জিয়ারতে যথা আসে ফেরেশতা শত আউলিয়া পীর॥

মা ফাতেমা আর হাসান হোসেন খেলেছেন পথে যার
কদমের ধূলি পড়েছে যথায় হাজার আম্বিয়ার,
সুরমা করিয়া কবে সেই ধূলি
মাখিব নয়নে দুই হাতে তুলি
কবে এ-দুনিয়া হতে যাবার আগে রে কাবাতে লুটাব শির॥

১১

তৌহিদেরই বান ডেকেছে
সাহারা মরুর দেশে।
দুনিয়া জাহান ডুবুডুবু
সেই স্রোতে যায় ভেসে॥

সেই জোয়ারে আমার নবী পারের তরী নিয়ে,
'আয় কে যাবি পারে' ডাকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে;
যে চায় না, তারেও নেয় সে নায়ে আপনি ভালবেসে॥
পথ দেখায় সে ঈদের চাঁদের পিদিম নিয়ে হাতে,
হেসে হেসে দাঁড় টানে, চার আসহাব তাঁরি সাথে॥

নামাজ রোজার ফুল-ফসলে শ্যামল হল মরু,
প্রেমের রসে উঠল পুরে নীরস মনের তরু।
খোদার রহম এল রে আখেরে নবীর বেশে॥

১২

আজি ঈদ ঈদ ঈদ খুশির ঈদ, এলো ঈদ
(যাঁর) আসার আশায় চোখে মোদের ছিলো না রে নিঁদ॥
শোন রে গাফিল, কী বলে তকবির ঈদগাহে,

(তোর) আমানতের হিসসা সাদকা দে খোদার রাহে
নে সাদকা দিয়ে বেহেশ্‌তে যাবার রসিদ॥
ঈদের চাঁদের তশতরিতে জান্নাত হতে
আনন্দেরই শিরনি এলো আশমানি পথে,
সেই শিরনি নিয়ে নতুন আশায় জাগবে না–উম্মিদ॥

(তোর) পিরাহানের আতর গোলাব লাগুক রে মনে,
(আজ) প্রেমের দাওত দে দুনিয়ার সকল জনে,
দিলেন ঈদের মারফতে হজরত এই তাগিদ॥

১৩

আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে
শিশু নবি আহমদ রূপের লহর তুলে॥

রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে—
যেন নাচে ভোরের আলো গোলাব গাছে।
চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল ভুলে॥

(সে) খুশির ঢেউ লাগে আরশ ও কুরসির পাশে,
হাততালি দিয়ে হুরি সব বেহেশ্‌তে হাসে,
সুখে ওঠে কেঁপে দুনিয়া চরণ–মূলে॥

চাঁদনি–রাঙা অতুল মোহন মোমের পুতুল
আদুল গায়ে নাচে খোদার প্রেমে বেভুল।
আল্লার দয়ায় তোহ্‌ফা এলো ধরার কূলে॥

১৪

তোরা যা রে এখনই হালিমার কাছে
লয়ে ক্ষীর সর ননী।
আমি খোয়াবে দেখেছি কাঁদিছে মা বলে
আমার নয়ন–মণি॥

মোর শিশু আহমদে যেদিন কাঁদিয়া
হালিমার হাতে দিয়াছি সঁপিয়া,

সেই দিন হতে কেঁদে কেঁদে মোর
কাটিছে দিন-রজনি ॥

পিতৃহীন সে সন্তান হায়
বঞ্চিত মা'র স্নেহে,
তারে ফেলে দূরে কোল খালি করে
থাকিতে পারি না গেহে ॥

অভাগিনি তার মা আমিনায়
মনে করে সে কি আজো কাঁদে, হায়!
বলিস তাহারই আসার আশায়
দিবানিশি দিন গণি ॥

১৪

তৌহিদের মুরশিদ আমার মোহাম্মদের নাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম।
ওই নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদায় কালাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ওই নামেরই রশি ধরে যাই আল্লার পথে,
ওই নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ওই নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম ॥

ওই নামের দামন ধরে আছি, আমার কিসের ভয়;
ওই নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়;
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশতি তাঞ্জাম
মুরশিদ মোহাম্মদের নাম ॥

১৫

মদিনার শাহানশাহ্ কোহ-ই-তুর-বিহারি।
মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী ॥

আল্লার প্রিয় সখা, দুলাল মা আমিনার,
খদিজার স্বামী, প্রিয়তম আয়েশার,
আসহাবের হামদম, ওয়ালেদ ফাতেমার,
বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার,
কেয়ামতে উম্মত শাফায়ত-কারী॥

তৌহিদ-বাণী মুখে, আল কোরআন হাতে,
খোদার নূর দেখি যার হাসির ইশারাতে,
যাঁর কদমের নীচে দোলে কত্তো জিন্নাত,
যে দু-হাতে বিলাল দুনিয়ায় খোদার মহব্বত
মে'রাজের দুলহা আল্লার আরশচারী॥

নয়নে যাঁর সদা খোদার রহমত ঝরে
সংসার মরুবাসী পিয়াসার তরে,
আনিল যে কওসর সাহারা নিঙাড়ি॥

১৬

তোমার নূরের রওশনি মাখা
নিখিল ভুবন অসীম গগন।
তোমার অনন্ত জ্যোতির ইশারা
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন॥

তোমার রূপের ইঙ্গিত খোদা
ফুটিছে বনের কুসুমে সদা,
তোমার নূরের ঝলক হেরি
মেঘে বিজলি চমকে যখন॥

প্রাণের খুশি শিশুর হাসি
মধুর তোমার রূপ দেয় প্রকাশি,
তোমার জ্যোতির সমুদ্রে খোদা
আলোক ঝিনুক মোর এ দুটি নয়ন॥

ধানের খেতে নদী-তরঙ্গে
দুলে তোমার রূপ মধুর ভঙ্গে,

নিতি দেখা দাও হাজার রঙ্গে
অরূপ নিরাকার তুমি নিরঞ্জন ॥

১৭

রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমার করো না বিচার।
বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহ্গার ॥

আমি জেনে শুনে জীবন ভরে
দোষ করেছি ঘরে পরে,
আশা নাই যে যাব তরে বিচারে তোমার ॥
বিচার যদি করবে, কেন রহমান নাম নিলে।
ঐ নামের গুণেই তরে যাব, কেন এ জ্ঞান দিলে!
দীন ভিখারি বলে আমি

ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী
শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কো আর ॥

১৮

তোমায় যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি!
ওগো আমার নবি প্রিয় আল আরবি
তেমনি করে ডাকি যদি আসবে নাকি তুমি ॥

যেমন কেঁদে দজলা ফোরাত নদী
ডেকেছিল নিরবধি,
হে মোর মরুচারী নবুয়তধারী
তেমনি করে কাঁদি যদি আসবে নাকি তুমি ॥

যেমন মদিনা আর হেরা পাহাড়
জেগেছিল আশায় তোমার
হে হজরত মম, হে মোর প্রিয়তম
তেমনি করে জাগি যদি আসবে না কি তুমি ॥

মজলুমেরা কারা ঘরে
কেঁদেছিল যেমন করে,
হে আমিনা–লালা, হে মোর কমলিওয়ালা,
তেমনি করে চাহি যদি আসবে নাকি তুমি॥

১৯

নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহম্মদ বোল
যে নাম নিয়ে চাঁদ সেতারা আসমানে খায় দোল॥

পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা,
ত্রিভুবনে যে নাম মাখা,
যে নাম নিতে হাসিন উষার রাঙে রে কপোল॥

যে নাম গেয়ে ধায় রে নদী,
যে নাম সদা গায় জলধি,
যে নামে বহে নিরবধি পবন–হিল্লোল॥

যে নাম বাজে মরু সাহারায়,
যে নাম বাজে শ্রাবণ–ধারায়,
যে নাম চাহে কাবার মসজিদ, মা আমিনার কোল॥

২০

দূর আজানের মধুর ধ্বনি বাজে বাজে
মসজিদেরই মিনারে।
এ কী খুশির অধীর তরঙ্গ উঠল জেগে
প্রাণের কিনারে॥

মনে জাগে, হাজার বছর আগে
ডাকিত বেলাল এমনই অনুরাগে,
তাঁর খোশ এলাহান মাতাইত প্রাণ
গলাইত পাষাণ ভাসাইত মদিনারে
প্রেমে ভাসাইত মদিনারে॥

তোরা ভোল দুখ-কাজ, ওরে মুসলিম থাম
চল খোদার রাহে, শোন ডাকিছে ইমাম।
মেখে দুনিয়ার খাক বৃথা রহিলি না-পাক,
চল মসজিদে তুই শোন মোয়াজ্জিনের ডাক,
তোর জনম যাবে বিফল যে ভাই
এই এবাদত বিনা রে॥

২১

অসীম বেদনায় কাঁদে মদিনাবাসী।
নিভিয়া গেল চাঁদের মুখের হাসি॥

শোকের বাদল আছড়ে পড়ে
কাঁদছে মরুর বুকের 'পরে,
ব্যথার তুফানে আরব গেল ভাসি॥

গোলাব-বাগে গুল নাহি আজ
কাঁদিছে বুলবুলি।
ছাইল আকাশ অন্ধকারে
মরু স্যাহারার ধূলি।

তরুলতা বনের পাখি
কোথায় হোসেন? কইছে ডাকি,
পড়ছে ঝরে তারার রাশি॥

২২

ঈদুজ্জোহার তকবীর শোন ঈদগাহে।
(তোর) কোরবানিরই সামান নিয়ে চল রাহে॥

কোরবানিরই রঙে রঙিন পর লেবাস,
পিরহানে মাখ রে ত্যাগের গুল-সুবাস,
হিংসা ভুলে প্রেমে মেতে ঈদগাহেরই পথে যেতে
দে মোবারক-বাদ দীনের বাদশাহে॥

খোদারে দে প্রাণের প্রিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা,
যেমন পুত্র বিলিয়ে দিলেন খোদার নামে হাজেরা,
ওরে কৃপণ, দিসনে ফাঁকি আল্লাহে॥

তোর পাশের ঘরে গরিব কাঙাল কাঁদছে যে
তুই তাকে ফেলে ঈদগাহে যাস সঙ সেজে,
তাই চাঁদ উঠল, এল না ঈদ, নাই হিম্মত নাই উম্মিদ,
শোন কেঁদে কেঁদে বেহেশত হতে হজরত আজ কী চাহে॥

২৩

সকাল হল, শোন রে আজান, ওঠ রে শয্যা ছাড়ি।
মসজিদে চল দীনের কাজে, ভোল দুনিয়াদারি॥
ওজু করে ফেল রে ধুয়ে নিশীথ রাতের গ্লানি,
সিজদা করে জায়-নামাজে ফেল রে চোখের পানি,
খোদার নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারী॥

নামাজ পড়ে দু-হাত তুলে প্রার্থনা কর তুই,
ফুল-ফসলে ভরে উঠুক সকল চাষির ভুঁই,
সকল লোকের মুখে হউক আল্লার নাম জারি॥

ছেলেমেয়ে সংসার-ভার সঁপে দে আল্লারে,
নবিজির দোওয়া ভিক্ষা কর রে বারে বারে,
তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে, সুখে দিবি পাড়ি॥

২৪

আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফলবে ফসল, বেচব তারে কিয়ামতের হাটে॥

পত্তনিদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবিজির
বেহেশ্‌তেরই তালুক কিনে বসব সোনার খাটে॥

মসজিদে মোর ধরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি,
'মনকের' 'নকির' দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমানকে মোর সাথি করে,
রদ হবে না কিস্তি; জমি উঠবে না আর লাটে॥

২৫

মদিনায় যাবি কে আয় আয়।
উড়িল নিশান, দ্বীনের বিষাণ বাজিল যাহার দরওয়াজায়॥

হিজরত করে যে দেশে
ঠাঁই পেলেন হজরত এসে,
খেলিতেন যথায় হেসে
হাসান হোসেন ফাতেমায়॥

হজরতের চার আসহাব যথায় করলেন খেলাফত,
মসজিদে যাঁর প্রিয় মোহাম্মদ করতেন এবাদত;
ফুটল যেথায় প্রথম বীর খালেদের হিম্মত,
খোশ এলহান দিতেন আজান বেলাল যেথায়॥

যার পথের ধূলির মাঝে
নবীজীর চরণের ছোঁয়া রাজে,
তৌহিদের ধ্বনি বাজে
যার আসমানে, যার 'লু' হাওয়ায়॥

২৬

হে নামাজি! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ।
পেতে দিলাম তোমার চরণ-তলে হৃদয়-জায়নামাজ॥
আমি গুনাহগার বে-খবর
মোর নামাজ পড়ার নাই অবসর,
তব চরণ-ছোঁয়ায় এই পাপীরে করো সরফরাজ॥

তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে,
আমার এ-ঘর হউক মসজিদ তোমার পরশ নিয়ে॥
যে শয়তানের ফন্দিতে, ভাই,
খোদায় ডাকার সময় না পাই,
সেই শয়তান থাক দূরে, শুনে তকবিরের আওয়াজ॥

২৭

ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে!
জাফরানি রঙের পরাব পিরান তোর গায় রে।
আয় রে॥

আসমানে যেতে চায় তারা হয়ে আমার নয়ন-তারা
তোর খেলার সাথি কাঁদে শাপলার ফুল, ফিরে আয় পথ-হারা।
দুনয়ন ঘুমে ঢুলে, হৃদয় ঘুমায় না,
কাছে পেতে চায় রে॥

চোখের কাজল তোর চাঁদ-মুখে লেগেছে,
(আয়) মুছাব আঁচলে,
মায়ের পরানে তোর স্নেহের সাগর-তরঙ্গ উথলে।
(মোর) মনের ময়না! ঘরে মন রয় না,
পথ চেয়ে রয়, রাত কেটে যায় রে॥

২৮

কারো ভরসা করিসনে তুই,
ও মন, এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন
ভাবনা কীসের, কীসের ডর॥

রোগে শোকে দুখে ঋণে
নাই ভরসা আল্লা বিনে,
তুই মানুষের সহায় মাগিস
তাই পাসনে খোদার নেক-নজর॥

রাজার রাজা বাদশা যিনি
'গোলাম' হ তুই সেই খোদার,
বড়লোকের দুয়ারে তুই
বৃথাই হাত পাতিসনে আর॥

তোর দুখের বোঝা ভারী হলে
ফেলে প্রিয়জনও যায় রে চলে,
সেদিন ডাকলে খোদায় তাঁহার রহম
ঝরবে রে তোর মাথার 'পর॥

২৯

দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপ ফুল।
কথায় সুরে ফুল ফুটাতাম, হয় না এখন আর সে ভুল॥
বাসি হাসির মালা নিয়ে
কী হবে নওরোজে গিয়ে,
চাঁদ না দেখে আঁধার রাতি বাঁধে কি গো এলোচুল?

আজও দখিন হওয়ায় ফাগুন আনে,
বুলবুলি নাই গুলিস্তানে,
দোলে না আর চাঁদকে দেখে বনে দোলন-চাঁপার দুল॥
কী হারাল, নাই কী যেন,
মন হয়েছে এমন কেন?
কোন নিদয়ের পরশ লেগে হয় না হৃদয় আর ব্যাকুল॥

৩০

নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই॥
সম্বল যার আছে হাতে
হজের তরে যা 'কাবা'তে,
জাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়ত যে পাই॥

ফরজ তরফ করে করলি কবজ ভবের দেনা
আল্লা ও রসুলের সাথে হলো না তোর চেনা।
পরানে রাখ কোরাণ বেঁধে,
নবিরে ডাক কেঁদে কেঁদে
রাতদিন তুই কর মোনাজাত 'আল্লা তোমায় চাই'।

৩১

কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও, মদিনায়
আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো নবিজির রওজায়॥
হাজিদেরই যাত্রা পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হতে,
কেঁদে বলি কেউ যদি মোর সালাম নিয়ে যায়॥
পঙ্গু আমি, আরব সাগর লঙ্ঘি কেমন করে
তাই নিশিদিন কাবা যাওয়ার পথে থাকি পড়ে।

বলি, ওরে দরিয়ার ঢেউ,
(মোর) সালাম নিয়ে গেল না কেউ,
তুই দিস মোর সালামখানি মরুর লু হাওয়ায়,
ওরে কাবার দরওয়াজায়॥

৩২

নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান
জপে তোমারই নাম।
তারায় গাঁথা তসবি লয়ে নিশীথে আসমান
জপে তোমারই নাম॥
ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া,
হাতে লয়ে ফুল কুঁড়ির তসবি ফুলের বাগান
জপে তোমারই নাম॥
সাঁঝ সকালে কোকিল পাপিয়া
মধুর তব নাম ফেরে গাহিয়া,

ছল ছল সুরে ঝরনার ধারা নদীর কলতান
জপে তোমারই নাম॥
বৃষ্টি ধারার তসবি লয়ে
তব নাম জপে মেঘ ব্যাকুল হয়ে
সাগর-কল্লোল, সমীর-হিল্লোল
বাদল ঝড় তুফান
জপে তোমারই নাম॥

৩৩

দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলা দেশের কুটির হতে
বেহুঁশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে॥
হায় গো খোদা কেন মোরে
পাঠাইলে কাঙাল করে
যেতে নারি প্রিয় নবির মাজার শরিফ জিয়ারতে॥
স্বপ্নে শুনি নিতুই রাতে-যেন কাবার মিনার থেকে
কাঁদছে বেলাল[১] ঘুমন্ত সব মুসলিমেরে ডেকে ডেকে
য়্যা এলাহি! বলো সে কবে
আমার স্বপন সফল হবে
(আমি) গরিব বলে হবো কি নিরাশ
মদিনা দেখার নিয়ামতে॥

৩৪

নাই হলো মা বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার।
আল্লা আমার মাথার মুকুট রসুল গলার হার॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি
ওতেই আমায় মানায় ভারী,
কলমা আমার কপালে টিপ, নাই তুলনা তার॥

হেরা-গুহার হিরার তাবিজ কোরান বুকে দোলে,
হাদিস ফেকা বাজুবন্দ দেখে পরান ভোলে।
হাতে সোনার চুড়ি যে মা
হাসান হোসেন মা ফাতেমা,
(মোর) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি মা, নবির চার ইয়ার॥

৩৫

আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি' মোমের বাতি।
নবিজি গো! জেগে আমি কাঁদি সারা রাতি॥
আশমানেরই চাঁদোয়াতলে
চাঁদ সেতারার পিদিম জ্বলে,
ওরাও যেন খোঁজে তোমায় আমার দুখের সাথি॥
দিনের কাজে পাই না সময় তাই নিরালা রাতে
তোমায় পাওয়ার পথ খুঁজি গো কোরানের আয়াতে।
তোমায় পেলে পাব খোদায়
তাই শরণ যাচি তোমারি পায়
পাওয়ার আগে জেগে থাকি প্রেমের শয্যা পাতি॥
ঝরলে পাতা ডাকলে পাখি
চমকে ভাবি তুমি নাকি?
মসজিদে যাই গভীর রাতে খুঁজি আঁতিপাঁতি
রোজহাশরে পাব দেখা মোরে সবাই বলে
তোমার বিহনে আমার ঘুম নাই নয়নে,
মোর জীবনে রোজ কিয়ামত আসে প্রতিপলে,
বিষের সমান লাগে আমার দুনিয়ার যশ-খ্যাতি॥

বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ড

১

আবির্ভাব

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া
কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে।
ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন
আশমানের কোলে রাঙা-চাঁদ দোলে॥

'কে এলো কে এলো' গাহে কোয়েলিয়া,
পাপিয়া বুলবুল উঠিল মাতিয়া,
গ্রহ-তারা ঝুঁকে করিছে কুর্নিশ
হুরপরি হেসে পড়িছে ঢলে॥

জিন্নাতের আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশতা আম্বিয়া এসেছে ধেয়ে
তহ্‌রিমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলে॥

এলো রে চির-চাওয়া, এলো আখেরি-নবি
সৈয়দে মক্কি-মদনি আল-আরবি,
নাজেল হয়ে সে যে ইয়াকুত-রাঙা ঠোঁটে
শাহাদতের বাণী আধো-আধো বোলে॥

২

তিরোভাব

সেই রবিয়ল আউওলেরই চাঁদ এসেছে ফিরে
ভেসে আকুল অশ্রুনীরে॥
আজ মদিনার গোলাপ-বাগে বাতাস বহে ধীরে
ভেসে আকুল অশ্রুনীরে॥

তপ্ত বুকে আজ সাহারার
উঠেছে রে ঘোর হাহাকার,
মরুর দেশে এলো আঁধার-শোকের বাদল ঘিরে
আকুল অশ্রুনীরে॥

চবুতরায় বিলাপ করে কবুতরগুলি
খোঁজে নবিজিরে।
কাঁদিছে মেষশাবক, কাঁদে বনের বুলবুলি
গোরস্থান ঘিরে।
মা ফতেমা লুটিয়ে পড়ে
কাঁদে নবির বুকের 'পরে
আজ দুনিয়া জাহান কাঁদে কর হানি শিরে
আকুল অশ্রুনীরে॥

৩

হে মদিনার বুলবুলি গো
গাইলে তুমি কোন গজল।
মরুর বুকে উঠল ফুটে
প্রেমের রঙিন গোলাপ দল॥

দুনিয়ার দেশ-বিদেশ থেকে
গানের পাখি উঠল ডেকে,
মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনি
উঠল ভেদি গগনতল॥

সাহারার দগ্ধ বুকে রচলে তুমি গুলিস্তান
সেথা আসহাব সব ভ্রমর হয়ে শাহাদতের গাইল গান।
দোয়েল কোকিল দলে দলে
আল্লা-রসুল উঠল বলে,
আল-কোরানের পাতার কোলে
খোদার নামের বইল ঢল॥

৪

দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি
হে হজরত, বাদশাহ হয়ে ছিলে তুমি উপবাসী॥

তুমি চাহ নাই কেহ হইবে আমির, পথের ফকির কেহ
কেহ মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই, কাহারও সোনার গেহ,
ক্ষুধার অন্ন পাইবে না কেহ, কারও শত দাসদাসী॥

আজ মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই
ধনী মুসলিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই,
তাই তোমারেই ডাকে যত মুসলিম গরিব শ্রমিক চাষি॥

বঞ্চিত মোরা হইয়াছি আজ তব রহমত হতে
সাহেবি গিয়াছে, মোসাহেবি করি ফিরি দুনিয়ার পথে,
আবার মানুষ হব কবে মোরা মানুষেরে ভালোবাসি॥

৫

পাঠাও বেহেশ্‌ত হতে, হজরত পুন সাম্যের বাণী,
আর দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি॥
বলিয়া পাঠাও, হে হজরত
যাহারা তোমার প্রিয় উম্মত,
সকল মানুষে বাসে তারা ভালো খোদার সৃষ্টি জানি।
সবারে খোদারই সৃষ্টি জানি॥

আধেক পৃথিবী আনিল ঈমান যে উদারতা-গুণে
তোমার যে উদারতা-গুণে,
শিখিনি আমরা সে উদারতা, কেবলই গেলাম শুনে
কোরানে হাদিসে কেবলই গেলাম শুনে।

তোমার আদেশ অমান্য করে
লাঞ্ছিত মোরা ত্রিভুবন ভরে,
আতুর মানুষে হেলা করে বলি, আমরা খোদারে মানি॥

৬

মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে॥

ওই নামেরই মধু চাহি
মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি
আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি
ওই নামের অনুরাগে॥

ও নাম প্রাণের প্রিয়তম
ও নাম জপি মজনু-সম
ওই নামে পাপিয়া গাহে
প্রাণের কুসুম-বাগে॥

আমি ওই নামে মুসাফির রাহী
তাই চাই না তখ্‌ত্ শাহানশাহি
নিত্য ও নাম য়্যা ইলাহি
যেন হৃদে জাগে॥

৭

মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি
মোহাম্মদ নাম জপ-মালা।
ওই নামে মিটাই পিপাসা
ও নাম কওসরের পিয়ালা॥

মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি,
মোহাম্মদ নাম গলায় পরি,
ওই নামেরই রওশনিতে
আঁধার এ মন রয় উজালা॥

আমার হৃদয়-মদিনাতে
শুনি ও নাম দিনে রাতে

ও নাম আমার তসবী হাতে
মন-মরুতে গুলে-লালা॥

মোহাম্মদ মোর অশ্রু চোখের
ব্যথার সাথি, শান্তি শোকের,
চাই না বেহেশ্‌ত, যদি ও নাম
জপতে সদাই পাই নিরালা॥

৮

মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে।
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে॥

ওরে গোলাব ! নিরিবিলি
বুঝি নবির কদম ছুঁয়েছিলি,
তাই তাঁর কদমের খোশবু আজও তোর আতরে জাগে।

মোর নবিরে লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ, রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে॥

ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম
চুমেছিলি নবির কদম,
আজও গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি জানাস রে গুলবাগে।

৯

ইসলামি গান (দ্বৈত)

পু॥ আমি মুসলিম যুবা, মোর হস্তে বাঁধা
আলির জুলফিকার।
স্ত্রী॥ আমি মুসলিম নারী জ্বালিয়া চেরাগ
ঘুচাই অন্ধকার॥

পু॥ ধরিয়া রাখিতে দীনের নিশান
আনন্দে করি জান কোরবান,
স্ত্রী॥ কত ছেলে মোর শহিদ হয়েছে মরুতে কারবালার।
আমি নন্দিনী ফতেমার॥
পু॥ য়ুরোপ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে ছড়ানু খোদার বাণী
স্ত্রী॥ মোর একা গৃহ–মক্কাতে আমি আনি জমজম–পানি।
পু॥ আমি জিনিব পৃথিবী আছে মোর আশা
স্ত্রী॥ আমি প্রাণে দিব তেজ, বুকে ভালোবাসা
উভয়ে॥ মুসলিম নর মুসলিম নারী দু–ধারী তলোয়ার॥

১০

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানি॥

শস্যশ্যামল ফসলভরা
মাঠের ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবানি॥

তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন,
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও
মানি চাই না মানি॥

খোদা! তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাশরে,
পথ না ভুলি তাই তো দিলে
পাক কোরানের বাণী।
খোদা তোমার মেহেরবানি॥

১১

খোদা এই গরিবের শোনো শোনো মোনাজাত।
দিয়ো তৃষ্ণা পেলে ঠাণ্ডা পানি,
ক্ষুধা পেলে লবণ-ভাত॥

মাঠে সোনার ফসল দিয়ো
গৃহভরা বন্ধু প্রিয়,
আমার হৃদয়ভরা শান্তি দিয়ো,
সেই তো আমার আবহায়াত॥
আমায় দিয়ে কারও ক্ষতি
হয় না যেন দুনিয়ায়।
আমি কারুর ভয় না করি,
মোরেও কেহ ভয় না পায়।

যবে মসজিদে যাই তোমার টানে
যেন মন নাহি ধায় দুনিয়া পানে
আমি ঈদের চাঁদ দেখি যেন
আসলে দুখের আঁধার রাত॥

১২

হে মদিনার নাইয়া!
ভব-নদীর তুফান ভারী
করো মোরে পার।
তোমার দয়ায় তরে গেল লাখো গুনাহ্‌গার
করো করো পার॥

পারের কড়ি নাই যে আমার হয়নি নামাজ রোজা
আমি কূলে এসে বসে আছি নিয়ে পাপের বোঝা
'পার করো য়্যা রসুল' বলে কাঁদি জারেজার॥

আমি তোমার নাম গেয়েছি শুধু কেঁদে সুবহ্‌শাম
আমি তরিবার মোর নাই তো পুঁজি বিনা তোমার নাম।
আমি হাজারো বার দরিয়াতে ডুবে যদি মরি
ছাড়ব না মোর পারের আশা তোমার চরণ-তরি;
দেখো সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদমতগার॥

১৩

লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া
মজনুঁ গো আঁখি খোলো।
প্রিয়তম! এতদিনে বিরহের
নিশি বুঝি ভোর হলো॥
মজনুঁ গো আঁখি খোলো

মজনুঁ! তোমার কাঁদন শুনিয়া মরু, নদী, পর্বতে
বন্দিনী আজ ভেঙেছে পিঞ্জর বাহির হয়েছে পথে।
আজি দখিনা বাতাস বহে অনুকূল,
ফুটেছে গোলাব নার্গিস ফুল,
ওগো বুলবুল, ফুটন্ত সেই গুলবাগিচায় দোলো॥
মজনুঁ গো আখি খোলো

বনের হরিণ হরিণী কাঁদিয়া পথ দেখায়েছে মোরে,
হুরি ও পরিরা ঝুরিয়া ঝুরিয়া চাঁদের প্রদীপ ধরে
পথ দেখায়েছে মোরে।

আমার নয়নে নয়ন রাখিয়া
কী বলিতে চাও–হে পরান–প্রিয়া!
ডাকো নাম ধরে, ডাকো মোরে স্বামী
ভোলো অভিমান ভোলো॥
মজনুঁ গো আখি খোলো

১৪

লায়লি! লায়লি! ভাঙিয়ো না ধ্যান
মজনুঁর এ মিনতি।
লায়লি কোথায়? আমি শুধু দেখি
লা–এলার জ্যোতি॥

পাথর খুঁজিয়া ফিরিয়াছি প্রিয়া
প্রেম–দরিয়ার কূলে,
খোদার প্রেমের পরশ–মানিক
পেলাম কখন ভুলে।

সে মানিক যদি দেখ একবার
মজনুঁরে তুমি চাহিবে না আর,
জুলেখা ইয়ুসুফ লাজ মানে হেরি
তাহার খুবসুরতি॥

মজনুঁরে যে লায়লি ভোলায়
সে যে কত সুন্দর
বুঝিবে লায়লি যদি তুমি তারে
নেহার এক নজর
সাধ মিটিবেনা হেথা ভালোবেসে
চল চল প্রিয়া লা এলা'র দেশে
নিত্য মিলনে ভুলিব আমরা
এই বিরহের জ্বালা॥

১৫

কোন রস-যমুনার কূলে বেণু-কুঞ্জে
হে কিশোর বেণুকা বাজাও।
মোর অনুরাগ যায় যেথা, তনু যেতে নারে,
তুমি সেই ব্রজের পথ দেখাও॥

মোর অন্ধ আঁখি কাঁদে চাঁদের তৃষ্ণায়
তব পানে চেয়ে রাত কেটে যায়।
বঁধু এই ভিখারিনি সেই মাধুকরী চায়
মধুবনে, গোপীগণে যে মধু দাও॥

প্রেমহীন নীরস জীবন লয়ে,
পথে পথে ফিরি বৈরাগিনী হয়ে—
বুঝি আমি চাই তাই তব প্রেম নাহি পাই,
কৃপা করো প্রেমময়, তুমি মোরে নাও॥

১৬
সাঁওতালি গান

হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল।
এনে দে, এনে দে, নইলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।

কুসমি রঙ শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি।
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে,
বাবলা ফুল, আমের মুকুল॥
নৈলে বাঁধবনা, বাঁধনা চুল।

তিরকূট পাহাড়ে শালবনের ধারে
বসবে মেলা আজি বিকালবেলায়।
দলে দলে পথে চলে সকাল হ'তে
সাঁওতাল সাঁওতালনি নূপুর বেঁধে পায়
যেতে দে ওই পথে বাঁশি শুনে শুনে পরান বাউল॥
নৈলে বাঁধবনা, বাঁধনা চুল॥

মহুয়া–কুঁড়ির মালা গেঁথেছি নিরালা তুহার তরে,
মনের আদর মেখে পিয়াল পাতা ঢেকে রেখেছি ঘরে।
গলার মালা নাই,
কী যে করি ছাই,
গাঁথব মালা রে, এনে দে, এনে দে রে শিয়াকুল॥
নৈলে বাঁধবনা, বাঁধনা চুল॥

১৭

ওগো প্রিয়তম! এত প্রেম দিয়ো না গো, সহিতে পারি না আর।
তটিনীর বুকে ঝাঁপায়ে পড়িলে কেন মহা–পারাবার?
তোমার প্রেমের বন্যায় বঁধু হায়!
দুই কূল মোর ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়,
আমি নিজেরে হারাতে চাহিনি বন্ধু
দিতে চেয়েছিনু হার॥

তুমি চাহ বুঝি তুমি ছাড়া আর রহিবে না মোর কেউ,
তাই কি পরানে তুফান তোল গো, এত রোদনের ঢেউ?
দেহ ও মনের সীমা ছাড়াইয়া মোরে,
কোথা নিয়ে যেতে চাও মোর হাত ধরে?
বলো, কোন মধুবনে শেষ হবে বঁধু আমাদের অভিসার?

১৮

আগুন জ্বালাতে আসিনি গো আমি
এসেছি দেয়ালি জ্বালাতে।
শুধু ক্রন্দন হয়ে আসিনি,
এসেছি চন্দন হতে থালাতে।

ধরায় আবার আসিয়াছি প্রিয়া
তব মুখখানি দেখিব বলিয়া,
তাই প্রদীপ হইয়া নীরবে পুড়ি গো
তোমার বরণডালাতে॥

তব মিলন-বাসরে ঘুম ভাঙাইতে আসিনি
তুমি কেন লাজে ওঠ আকুলি?
তব রাঙা মুখখানি রাঙাইয়া যাব চলে গো
আমি সাঁঝের ক্ষণিক গোধূলি॥

তব কাজল নয়ন-পল্লব ছায়ে
অশ্রুর মতো রহিব লুকায়ে,
ঝরিতে এসেছি ফুল হয়ে আমি
তোমার বুকের মালাতে॥

১৯

আহির ভৈরব—তেতালা

অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি।
নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে
প্রখর তেজ তব নেহারিতে নারি॥
রাস-বিলাসিনী আমি আহিরিনি
শ্যামল কিশোর রূপ শুধু চিনি,
অম্বরে হেরি আজ এ কী জ্যোতিঃপুঞ্জ
হে গিরিজাপতি! কোথা গিরিধারী॥

সম্বর সম্বর মহিমা তব, হে ব্রজেশ ভৈরব, আমি ব্রজবালা
হে শিব সুন্দর, বাঘছাল পরিহরো, ধরো নটবর বেশ পরো নীপমালা॥

নব মেঘচন্দনে ঢাকি অঙ্গজ্যোতি
প্রিয় হয়ে দেখা দাও ত্রিভুবনপতি
পার্বতী নহি আমি, আমি শ্রীমতী,
বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরিধারী॥

২০

মৃতের দেশে নেমে এল মা-নামের গঙ্গাধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা॥
আয় আশাহীন ভাগ্যহত,
শক্তিবিহীন অনুন্নত,
আয় রে সবাই আয়
আয় এই অমৃতে উঠবি বেঁচে জীবন্মৃত সর্বহারা॥

ওরে এই শক্তির গঙ্গাস্রোতে, অনেক আগে এই সে দেশে
মৃত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে
মহাভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য স্রোতেই ভেঙেছিল দেশ-বিদেশের লক্ষ কারা॥

২১

জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী চীর গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥
যজ্ঞাহুতির হোমশিখা সম,
তুমি তেজস্বী তাপস পরম
ভারত-অরিন্দম নমো নমো
বিশ্ব মঠ-বিহারী॥
মদ-গর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী, ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা
জানাইলে হুঙ্কারি॥

সন্ধ্যামালতী

১

সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে
কে আসি বাজালে বাঁশী ভৈরবী সুরে॥

সাঁঝের পূর্ণ চাঁদের অরুণ ভাবিয়া
পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠিল গাহিয়া;
ভোরের কমল ভেবে সাঁঝের শাপলা ফুলে
গুঞ্জরে ভ্রমর ঘুরে ঘুরে॥

বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি
সকালের মল্লিকা ফুটাইলে তুমি
রাঙিল উষার রঙে গোধূলি লগন
শোনালে আশার বাণী বিরহ বিধুরে॥

২

ঘুমে-জাগরণে বিজড়িত প্রাতে
কে এলে সুন্দর আমারে জাগাতে॥

শাখে শাখে ফুলগুলি
হাসিছে নয়ন খুলি
শিহরিছে উপবন ফুলের হাওয়াতে॥

দেখিনি তোমায় তবু অন্তর কহে
ছিলে তুমি লুকায়ে আমার বিরহে।

চম্পার পেয়ালায়
রস উছলিয়া যায়
ঝরিয়া পড়ার আগে ধর তারে হাতে॥

৩

ফিরিয়া যদি সে আসে
আমার খোঁজে ঝরা গোলাবে
আনিয়া সমাধি পাশে
আমার বিদায় বাণী শোনাবে ॥

বলিও তারে, এখানে এসে
ডাকে যেন মোর নাম ধরে সে
রবাব যবে কাঁদিবে রমল সুরের কোমল রেখাবে ॥

তৃষিত মরুর ধূসর গগন
যেমন হেরে মেঘের স্বপন
তেমনি দারুণ তিয়াসা লয়ে
কাটিল আমার বিফল জীবন,
একটি ফোঁটা আঁখি জল
ঝরে যেন তার হাতের শরাবে ॥

৪

দক্ষিণ সমীরণ সাথে
বাজো বেণুকা
মধু মাধবী সুরে চৈত্র পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা ॥

বাজো শীর্ণা স্রোত নদী-তীরে
ঘুম যবে নামে বন ঘিরে
যবে ঝরে এলোমেলো বায়ে ধীরে
ফুল-রেণুকা ॥

মধু-মালতী-বেলা-বনে ঘনাও নেশা
স্বপন আনো জাগরণে মদিরা-মেশা।
মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ লোকে সে বিহরে
যবে নিরাশার বালুচরে
ওড়ে বালুকা ॥

৫

আকাশে ভোরের তারা মুখপানে চেয়ে আছে
ঝরা ফুল অঞ্জলি প'ড়ে আছে পা'র কাছে
দেবতা গো জাগো॥

আঁধার–ঘোমটা খুলি
শতদল আঁখি তুলি
প্রসাদ যাচে।
দেবতা গো জাগো॥

কপোতকণ্ঠে প্রথম তব বন্দনা বাজে
তোমারে হেরিতে উষা দাঁড়ায়ে বধূর সাজে।
দেবতা গো, জাগো জাগো॥

দেবতা তোমার লাগি
আমি আছি নিশি জাগি
ভীরু এ মনের কলি হের দল মেলিয়াছে।
দেবতা গো জাগো॥

৬

সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায়
তুমি ফিরিলে না ঘরে
আঁধার ভবন, জ্বলেনি প্রদীপ
মন যে কেমন করে॥
উঠানে শূন্য কলসীর কাছে
সারাদিন ধরে ঝরে পড়ে আছে
তোমার দোপাটি, গাঁদা ফুলগুলি
যেন অভিমান ভরে॥

বাসন্তি রঙ শাড়ীখানি তব
ধূলায় লুটায় কেঁদে
তোমার কেশের কাঁটাগুলি বুকে
স্মৃতির সমান বেঁধে।

যাইনি বাহিরে আজ সারাদিন
ঝরিছে বাদল শ্রান্তিবিহীন
পিয়া পিয়া বলে কাঁদিছে পাপিয়া
এ বুকের পিঞ্জরে॥

৭

বলো প্রিয়তম বলো
মোর নিরাশা-আঁধারে আলো দিতে
(তুমি) কেন দীপ হয়ে জ্বল॥

যত কাঁটা পড়ে মোর কাছে যেতে যেতে
কেন তুমি তাহা লহ বঁধূ বুক পেতে,
যদি ব্যথা পাই, বুঝি বাজে তাই
তুমি ফুল বিছাইয়া চল॥

বলো বলো হে বিরহী
তুমি আমারে অমৃত এনে দাও কেন
নিজে উপবাসী রহি।

(মোর) পথের দাহন আপন বক্ষে নিয়ে
মেঘ হয়ে চল সাথে সাথে ছায়া দিয়ে
(মোর) ঘুম না আসিলে কেন তখন
চাঁদ হয়ে ঢল ঢল॥

৮

আমি দ্বার খুলে আর রাখব না
পালিয়ে যাবো গো।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকব না
পালিয়ে যাবে গো॥

এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকব না
পালিয়ে যাবে গো॥
হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধব না
দান এনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদব না।
পাষাণ তোমায় বন্দী ক'রে
রাখব আমার ঠাকুরঘরে
রইব কাছে গো
আর অন্তরালে থাকব না
পালিয়ে যাবে গো॥

৯

বলেছিলে ভুলিবে না মোরে।
ভুলে গেলে হায় কেমন ক'রে॥

নিশীথের স্বপনে কে যেন কহে
ধরণীর প্রেম সে কি স্মরণে রহে
ফুলের মতন ফুটে যায় যে ঝ'রে॥

বোঝে না বিরহী মন অসহায়
যত নাহি পায় তত জড়াইতে চায়।

যত দূরে যাও তত তব গাওয়া গান
কেন স্মৃতিপথে এসে কাঁদায় প্রাণ?
আঁখিতে দেখি না, দেখি আঁখির লোরে॥

১০

কে এলে হংস-রথে, কোথা যাও
তার লিপি এনেছ কি? দাও মোরে দাও॥

যার বিরহে মোর হৃদয়-কমল
অশ্রু-সরসী-নীরে কাঁপে টলমল।
শুনেছি তার সাথে তুমি কথা কও
কার কথা হয় সেথা—শোনাও শোনাও॥

আনন্দ-দূত তুমি লিপি আন নাই?
দেখিতে কি আসিয়াছ—কত দুখ পাই?
সে এত প্রেম দিয়ে কেন লুকিয়ে থাকে
কেন দেখা দেয় না এত যে ডাকে।
কেন মোর আর ভালো লাগে না কিছুই?
মনে করে বলো যদি তার দেখা পাও॥

১১

সন্ধ্যা-গোধুলি লগনে কে
রাঙিয়া উঠিলে কারে দেখে॥

হাতের আলতা পড়ে গেল পায়ে
অস্ত-দিগন্ত বনান্ত রাঙায়ে
আঁখিতে লজ্জা, অধরে হাসি
কেন অঞ্চলে মালা ফেলিলে ঢেকে॥

চিরুণি বিনোদ বিনুনীতে বাঁধে
দেখিলে সে-কোন সুন্দর চাঁদে
হৃদয়ে ভীরু প্রদীপ-শিখা
কাঁপে আনন্দে থেকে থেকে॥

১২

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে
আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে॥

মোরে চেন কি—
মোর আঁচলে চাঁপা, হেনা জুঁই অতসী।

মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল
নব আমের মুকুল
মম উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে॥

আনি মলয়-গিরি হতে চন্দন-গন্ধ
হৃদয়-উদাস-করা সমীর সুমন্দ
ছড়াই আবীর হাসি জোছনার স্বর্ণে॥

১৩

আমি পথ-মঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে
গোপন অশ্রুসম রাতের নয়ন-পাতে॥

দেবতা চাহে না মোরে
গাঁথে না মালার ডোরে
অভিমানে তাই ভোরে
শুকাই শিশির সাথে॥

মধুর সুরভি ছিল আমার পরাণ ভরা
আমার কামনা ছিল মালা হয়ে ঝরে পড়া।
ভালোবাসা পেয়ে যদি
আমি কাঁদিতাম নিরবধি
সে-বেদনা ছিল ভালো, সুখ ছিল সে-কাঁদাতে॥

১৪

পিয়াল ফুলের পিয়ালায় বঁধু
অন্তর-মধু ঢেলে পিয়াব তোমায়।
রচিব হৃদয়ে মাধবী-কুঞ্জ
বাহিরে ফাগুন যদি যেতে চায়॥

বেল-ফুল যায় যদি ঝরে
প্রেম-ফুল দিব ডালি ভরে

নিশি জেগে আমি গান শোনাব
বনের বিহগ যদি মাগে বিদায়॥

আর যদি নাহি বহে দখিনা বাতাস
বঁধু অঞ্চল আছে মোর, আছে কেশ-পাশ।
যায় যদি ডুবে যাক চৈতালী চাঁদ
আমার চাঁদ যেন চলে নাহি যায়॥

১৫

প্রথম প্রদীপ জ্বালো
মম ভবনে হে আয়ুষ্মতী।
আঁধার ঘিরে আশার আলো
আনুক তোমার দীপের জ্যোতি॥

হেরিয়া তোমার আঁখির আলোক
বিষাদিত সাঁঝ পুলকিত হোক—
যেন দূরে যায় সব দুখ-শোক
তব শঙ্খরব শুনি হে সতী॥
কাঁকন পরা তব শুভ কর
মুখর করুক এ নীরব ঘর
এ গৃহে আনুক বিধাতার বর
তোমার মধুর প্রেম আরতি॥

১৬

ভিখারীর সাজে কে এলে।
তৃতীয় প্রহর নিশি নিঝ্‌ঝুম দশ দিশি—
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে এলে কে এলে॥

সুন্দর হাতে কেন ভিক্ষার ঝুলি
চাঁদের অঙ্গে কেন পথের ধুলি?

আমার কবরীর জুঁই ফুলগুলি
তব চরণের পানে আছে আঁখি মেলে॥

বনভূমি কাঁদে ঝরা–ফুল পল্লব ছড়ায়ে
হে তরুণ সন্ন্যাসী! বসন্ত কাঁদে তব দুই কর জড়ায়ে।
ওগো উদাসীন! কোন নিষ্ঠুর সাধে
বিভূতি মাখায়ে হায়! চৈতালী চাঁদে
আমার এমন ফাগুন–নিশীথে
ধুতুরা–আসব কেন দিলে ঢেলে॥

১৭

ইরাণের বুলবুলি কি এলে
গোলাপের স্বপ্ন লয়ে সিন্ধু–নদীকূলে।
চন্দনের গন্ধে কবি
মিশালে হেনার সুরভি
তোমার গানে মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস দুলে॥

কোন সাকীর আঁখির করুণা নাহি পেয়ে
মরুচারী হে বিরহী এলে মেঘের দেশে ধেয়ে।
হেথা কাজল আঁখি নিরখি
তৃষ্ণা তব জুড়াল কি
লালা ফুলের বেদনা ভুলিবে কি পলাশ ফুলে॥

১৮

ধর হাত, নামিয়া এসো শিব–লোক হতে।
শিব–ভিখারি পড়িয়া আছি অশিব মায়া–পথে॥

তব চরণে পাইতে নারি
মায়ার সাথে কেবলই হারি
তুমি আসিয়া তুলিয়া লহ ধ্রুব–জ্যোতির রথে॥

বারে বারে জ্ঞান-দীপ যায় নিভিয়া ঝড়ে
তমসা-ভীত চিত্ত মম কাঁপে তোমার তরে।
জন্ম ও মৃত্যুর
যাতন মম কর দূর—
আর ভাসিতে নারি তৃণসম জোয়ার-ভাটা স্রোতে॥

১৯

জল দাও,—দাও জল!
জল দাও, মরু-পথে মরি তৃষ্ণায়, সাহারার মত হৃদিতল॥

আঁখিজল পিয়া, পিয়া! এতদিন
বেঁচেছিনু; সে আঁখি আজ জল-হীন।
সে কি ছল? তব নয়ন সদাই
করিত যে ছলছল॥

২০

উদার অম্বর দরবারে তোরই—
প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা।
শতদল-শুভ্রা-পদতল-লীনা
প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা॥

সহস্র-কিরণ-তারে হানি ঝঙ্কার
ধ্বনি তোলে অনাহত গভীর ওঙ্কার—
সেই সুরে উদাসীন পরমা প্রকৃতি
ধ্যাননিমগ্না মহা-যোগাসীনা॥

আনন্দ-হংস বিমুগ্ধ গতি-হীন
স্থির হয়ে ব্যোমে শোনে সে জ্যোতির্বীণ
ঝরা ফুল অঞ্জলি তারি চরণে
প্রণতা ধরণী বাণী-বিহীনা॥

২১

পরাজিতা হল অপরাজিতার কাছে
গোলাপের রূপ হায়।
পথের ধুলিতে, ঢেকে দে গোলাপ-বন,
আয় ঝোড়ো হাওয়া আয়॥

বসিল না মোর ময়ূর-সিংহাসনে বনের সে প্রজাপতি,
কোহিনুর ফেলে দেখিল পথের ফুলে
সে-কোন প্রেমের জ্যোতি!

হে প্রেম-ভিখারী! তোমার ধুলির পথে
ডাক দিলে যদি চির-ভিখারিণী হতে,
মরণের ক্ষণে দুটি ফোঁটা আঁখি-জল
সে যেন ভিক্ষা পায়॥

২২

চাঁদিনী রাতে মল্লিকা-লতা
আবার কহিতে চাহে কোন কথা॥

আবার ভ্রমর-নূপুর বাজে
কী-যেন-হারানো হিয়ার মাঝে,
আবার বেণুর উতলা রবে
ব্যাকুল হয়ে ওঠে গোপন ব্যথা॥

তনুর পিঞ্জর ভাঙিয়া কেন হায়
না-জানা আকাশে হৃদয় যেতে চায়।
বায়ুরে ডেকে বলে, বহিতে নারি আর
যে দিল তারে দিও সুরভি মধু-ভার,
কৃপা কর, আমি ঝরিয়া মরে যাই
সহিতে পারি না মাটির মমতা॥

২৩

নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়!
তাহার ধ্যানের চাঁদ ডুবে যায়॥

ভরিল সরসী তারি আঁখি-জলে
ঢলিয়া পড়িল পল্লব-তলে,
অকরুণ নিষাদের তীর সম
অরুণ-কিরণ বেঁধে এসে গায়॥

কপোলের শিশির অভিমানে শুকাল,
পাঁপড়ির আড়ালে পরাগ লুকাল।
সরসীর জলে পড়ে আকাশের ছায়া
নাই সেথা তারা-দল, চাঁদের মায়া,
জলে ডুবে মেটে না প্রাণের তৃষা
হৃদয়ের মধু তার হৃদয়ে শুকায়।

২৪

কেন ফুটালে না ভীরু এ মনের কলি?
জয় করে কেন নিলে না আমারে,
কেন তুমি গেলে চলি॥

ভাঙিয়া দিলে না কেন মোর ভয়
কেন ফিরে গেলে শুনি অনুনয়?
কেন সে বেদনা বুঝিতে পার না
মুখে যাহা নাহি বলি॥

কেন চাহিলে না জল নদী-তীরে এসে
অকরুণ অভিমানে চলে গেলে
মরু-তৃষ্ণার দেশে।

ঝোড়ো হাওয়া ঝরা পাতারে যেমন
তুলে নেয় তার বক্ষে আপন
কেন কাড়িয়া নিলে না তেমনি করিয়া
মোর ফুল-অঞ্জলি॥

২৫

বল রাঙাহংস–দূতী তার বারতা।
দাও তার বিরহ–লিপি, বল, সে কোথা॥

কেমনে কাটে তার অলস-বেলা
আজো কি গাঙের ধারে কাঁদে একেলা,
দু'জনের আশা–তরী ডুবিল যথা॥

দীপ জ্বালেনি কি কেউ তাহার ঘরে
ভাঙা ঘর বেঁধেছে কি নূতন করে।
দেখা হলে তারে কহিও নিরালায়
আমি মরিয়াছি, মোর প্রেম মরেনি হায়
(মোর) অন্তরে সে আজো অন্তর-দেবতা॥

২৬

গোধূলির শুভ লগন এনে সে
কেন বিদায়ের বাঁশী বাজায়!
ওর মিলনের মালা ভালো লাগে না
বুঝি গো
ও শুধু বিরহের অশ্রু চায়॥

কে জানিত ও বিরহ-বিলাসী—
সকালের ফুল চায়, সন্ধ্যায় উদাসী
দিনে যে ধরা দেয়
দীনের মতন
রাতে সে শূন্যে কেন মিশে যায়॥

ঘরে এনে কেন ভোলাতে চায় ঘর
আত্মা জড়ায়ে কাঁদে, আত্মীয়ে করে পর।
প্রেম-কৃপা-ঘন সে নাকি সুন্দর
কেন তবে অসহ দুঃখ দিয়ে কাঁদায়॥

২৭

মোর ধ্যানের সুন্দর এলে কি ফিরে
আসে চন্দন-গন্ধ মৃদুল সমীরে॥

আবার শূন্য এ হৃদি-মাঝে
কার নাম ধরে বাঁশী কেন বাজে
কাঁদে ভ্রমর মাধবী-কুঞ্জ ঘিরে॥

পাপিয়া কেন পিয়া পিয়া ডাকে
কেন দোলা লাগে তনুর চম্পা-শাখে
কেন অন্ধ আঁখি ভাসে অশ্রু-নীরে॥

২৮

যে অবহেলা দিয়ে মোরে করিল পাষাণ
সখি কেন কেঁদে ওঠে তারি তরে মোর প্রাণ॥

যে ফুল ফুটায়ে তার মধু নিল না
মোরে ধরার ধূলিতে এনে ধরা দিল না
কেন তার তরে বুকে এত জাগে অভিমান॥

মোর প্রেম-অঞ্জলি সে যত যায় দলি
তারে তত জড়াতে চাই, শ্যাম-সুন্দর বলি।
সখি বড়র পীরিতি নাকি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি দেয় ক্ষণে হাতে চাঁদ—
চাঁদ সে যে আকাশের—
সে ধরা দেয় না
তবু চকোরীর ভুল হয়না কো অবসান॥

২৯

প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই
বুলবুলি সে কথা ভুলিল কি হায়!

সে কেন তবে আসে না, রাতের ফুল মোর
হাতে শুকায়॥

রাজ–বাগিচার ফুল হোক যত গরবী
পথের ফুলেও আছে তারি মত সুরভি,
রসের পুতলী হয় পথের ভিখারিণী
যদি প্রেম পায়॥

৩০

একলা গানের পায়রা উড়াই,
সে কাছে নাই গো, সে কাছে নাই।
চাঁদ ভালো লাগে না—তার চেনা কার যেন
ইহুদি মাকড়ি,
সে কেন কাছে নাই, অভিমানে ঝরে যায়—
গোলাপের পাঁপড়ি।
ফিরোজা আকাশের জাফরানী জোছনায়
মন ভরে না, কি যেন চাই গো
কি যেন চাই॥

৩১

মোর দেহ মন বিভব রতন প্রিয়া
তুমি নাও তুমি নাও।
পথের ধূলায় মুক্ত আকাশ–তলে
আমারে থাকিতে দাও॥

সাজাইয়া হীরা মানিকের ফুলদানি
সাধ যায় রাখি সেথা তোমারে
সোনার দালান—প্রাণহীন, সে যে ভুল–আমি
মাটিতে জন্ম আমি যে মাটির ফুল
কেন তা ভুলাতে চাও॥

মাটির রসে যে প্রেমের কুসুম ফোটে
তারি কাছে এসে মধুকর গেয়ে ওঠে,
মোর কাছে এসো—যদি কোনদিন
সে মাটির মধু পাও।

পংক্তিটি অসম্পূর্ণ। দুয়েকটি শব্দ সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায়নি।

৩২

অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার
ত্রিভুবনে নাই তার কোথাও আঁধার ॥

পথের ধূলি তারই চরণ যাচে
আকাশ কথা কয় তাহারি কাছে
তারি তরে খোলা থাকে সকলের ঘর
সকলের হৃদয়-দুয়ার ॥

কে বলে ভিখারিণী সে—কে বলে সে ভিখারী।
ভিক্ষা ঝুলিতে তার বিশ্ব থাকে—ভগবান তাহার দ্বারী ॥

তার রীতি বোঝা যায় না
বুকে যার বহে নিতি পিরীতি জেয়ার ॥

৩৩

সাঁঝের প্রদীপ কেন নিভে যায়
আমারি দীরঘ-নিঃশ্বাসে হায় ॥

মালতীর মালা কেন হয়ে যায় ম্লান
অকারণ অভিমানে কেন কাঁদে প্রাণ
বহুদূরে শুনি কার বিদয়ের গান,
কহে যেন—এ জনমে পাব না তোমায় ॥

হৃদয়ের পদ্মিনী মেলেছিল দল
শুকাইয়া গেল হায় সরসীর জল
হে বঁধু, ফিরে যদি আস কোনদিন
ফুল যদি নাহি পাও
কাঁটা নিও পায়॥

৩৪

আমি মহাভারতী শক্তি–নারী।
আমি কৃশ–তনু অসিলতা,
স্বাহা আমি তেজ–তরবারি॥

আমি আশা–দীপ, জ্যোতি,—
আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম, সংহৃতি,
আমি ভবনে করুণা-কোমল
আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি॥

আমি শান্ত উদাসীন মেঘে আনি বর্ষণ–বেগ
আমি তড়িৎলতা,
পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি
দূর করি নিরাশা দুর্বলতা।

আমি গার্গেয়ী মৈত্রেয়ী ভাগবতী শক্তি,
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে
তিমির বিদারি॥

৩৫

নীল সরসীর জলে চতুর্দশীর চাঁদ ডোবে
আর উঠে গো।
এলোকেশে ঢেউয়ে জড়াজড়ি করে
পড়ে লুটে গো॥

নীল-শাড়ি-বিজড়িত কিশোরী
কলসী লয়ে ফেরে সাঁতরি।
চাঁদ ভেবে মুদিত কুঁড়ি
হেসে ওঠে ফুটে গো॥

সরসীর পড়শী পলাশ পারুল
সুরভিত সমীরণ হাসিয়া আকুল।
কলসে কঙ্কনে রিনিঝিনি সুর—
বাজে জল-তরঙ্গে সজল বিধুর
কমলিনী হরষে ঢলে পড়ে
পরশে অধরপুটে গো॥

৩৬

শিব-অনুরাগিণী গৌরী জাগে।
আঁখি অনুরঞ্জিত প্রেমানুরাগে॥

স্বপনে কি শিব এসে
বর দিল বর-বেশে
বালিকা বলিতে নারে, শরম লাগে॥

কি হয়েছে উমা তোর-গিরিরাণী সাধে
কে মাখালো কুঙ্কুম ভোরের চাঁদে?
লুকায়ে মায়ের বুকে
বলিতে বাধে মুখে
পাগল শিব ঐ রূপ ভিক্ষা মাগে॥

৩৭

ঘন ঘোর বরিষণ মেঘ-ডমরু বাজে
শ্রাবণ রজনী আঁধার।
বেদনা-বিজুরি-শিখা রহি রহি চমকে
মন চাহে প্রেম অভিসার॥

কোথা তুমি মাধব কোথা তুমি শ্যামরায় !
ঝরিছে নয়ন–বারি অঝোর ধারায় ;
কদম–কেয়া বনে জাহ্নবী আনমনে
সাথী বিনা কাঁদে অনিবার ॥

৩৮

উভয়ে : কপোত–কপোতী উড়িয়া বেড়াই
সুদূর বিমানে আমরা দু'জনে।
স্ত্রী : কানন–কান্তার শিহরি ওঠে
মোদের প্রণয়–মদির কূজনে ॥
ভ্রমর গুঞ্জে মঞ্জুল গীতি
হেরিয়া আমার বঁধুর প্রীতি
পুরুষ : আমার প্রিয়ার নয়নে চাহি
কুসুম ফুটে ওঠে বিপিনে বিজনে ॥
স্ত্রী : তোমা ছাড়া স্বর্গ চাহি না, প্রিয় !
মোদের প্রেমে চাঁদ আসে নেমে
মাটির পাত্রে পান করি অমিয় ॥
পুরুষ : বিশ্ব ভুলায়ে ও–রাঙা পায়ে
আমারে বেঁধেছে জীবনে মরণে।

৩৯

নাইয়া কর পার !
কূল নাহি নদী জল সাঁতার
দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,
নামিছে আঁধার মরি তরাসে
দাও দাও কূল কূলবধূ ভাসে
নীর পাথার
নাইয়া, কর পার !

৪০

ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা, বনের বিধবা মেয়ে।
হারানো কাহারে খুঁজিস নিশীথ-আকাশের পানে চেয়ে॥
ক্ষীণ তনুলতা বেদনা-মলিন
উদাস মুরতি ভূষণ-বিহীন
তোরে হেরি ঝরে কুসুম-অশ্রু বনের কপোল বেয়ে॥

তুই লুকায়ে কাঁদিস রজনী জাগিস সবাই ঘুমায় যবে
বিধাতারে যেন বলিস, 'দেবতা গো, আমারে লইবে কবে?'
করুণ-শুভ্র ভালোবাসা তোর
সুরভি ছড়ায়ে সারা নিশিভোর
প্রভাতবেলায় লুটাস ধূলায় যেন কারে নাহি পেয়ে॥

৪১

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম
গান গেয়ে কি ভেঙেছ ঘুম।
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি ঘোর গানের স্বপন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

৪২

চমকে চপলা মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন॥

লুকায়েছে গ্রহ-তারা, দিবসে ঘনায় রাতি,
শূন্য কুটীরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত-চিত, সচকিত শ্রবণ॥

৪৩

তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের 'পরে।
মোর কণ্ঠ হতে সুরের গঙ্গা ঝরে॥

তব কাজল-আঁখির ঘন-পল্লবতলে
বিরহ-মলিন ছায়া মোর যবে দোলে
তব নীলাম্বরীর ছোঁয়া লাগে যেন
সেদিন নীলাম্বরে॥

যেদিন তোমারে পাই না কাছে গো
পরশন নাহি পাই,
মনে হয় যেন বিশ্ব-ভুবনে
কেহ নাই, কিছু নাই।

অভিমানে কাঁদে বক্ষে সেদিন বীণ
আকাশ সেদিন হয়ে যায় বাণীহীন
যেন রাধা নাই আর বৃন্দাবনে গো
সব সাধ গেছে মরে।

৪৪

হয়তো আমার বৃথা আশা তুমি ফিরে আসবে না
আশার-তরী ডুরবে কূলে দুখের স্রোতে ভাসবে না
তুমি ফিরে আসবে না॥

হয়তো তুমি এমনি করে
পথ চাওয়াবে জনম ভরে
রইবে দূরে চিরতরে সামনে এসে হাসবে না
তুমি ফিরে আসবে না॥

কামনা মোর রইল মনে রূপ ধরে তা উঠল না
বারে বারে ঝরলো মুকুল ফুল হয়ে তা ফুটল না।

অবুঝ এ প্রাণ তবু কেন
তোমার ধ্যানে বিভোর হেন
তুমি চির চপল নিঠুর
জানি, ভালোবাসবে না॥

৪৫

ওগো ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে
তার কালো দুটি আঁখিতারা তুলে
চেয়েছিল শুধু নিরদয় বঁধূ
হায় সেদিন বিজন নদীকূলে॥

কি কথা যেন গো হায়
আমারে বুঝাতে চায়
মুখে নাই কথা, শুধু নীরবতায়
ওগো কয়েছে আমারে সবই ভুলে॥

কয়েছে মলয়, কয়েছে পাপিয়া
ওগো নব-কিশলয় কয়েছে কাঁপিয়া
যে কথা লুকানো ছিল তার মনে
অলি কহে ফুলে ফুলে দুলে দুলে॥

৪৬

সেদিনও বলেছিলে এই সে ফুলবনে
আবার হবে দেখা ফাগুনে তব সনে॥

ফাগুন এলো ফিরে লাগে না মন কাজে
আমার হিয়া ভরি উদাসী বেণু বাজে
শুধাই তব কথা ফাগুন সমীরণে।

শপথ ভুলিয়াছ বন্ধু, ভুলিলে কত কি গো,
বারেক দিয়ে দেখা লুকালে মায়া-মৃগ।

আঁচলে ফুল লয়ে হল না মালা গাঁথা
আসার পথ তব ঢাকিল ঝরা পাতা
পূজার চন্দন শুকালো অঙ্গনে॥

৪৭

চৈতী চাঁদের আলো আজ ভালো নাহি লাগে
তুমি নাই মোর পাশে সেই কথা মনে জাগে॥

এই ধরণীর বুকে কত গান কত হাসি
প্রদীপ নিভায়ে ঘরে আমি আঁখি-নীরে ভাসি
পরাণে বিরহী বাঁশী ঝুরিছে করুণ রাগে॥

এ কী এ বেদনা আজি আমার ভুবন ঘিরে
ওগো অশান্ত মম, ফিরে এসো, এসো ফিরে।

বুলবুলি এলে বনে, কহে যাহা বনলতা
সাধ যায় কানে কানে আজি বলিব সেকথা
ভুল বুঝিও না মোরে বলিতে পারিনি আগে॥

৪৮

তুমি সারাজীবন দুঃখ দিলে
তব দুঃখ দেওয়া কি ফুরাবে না।
যে ভালোবাসায় দুঃখে ভাসায়
সে কি আশা পুরাবে না॥

মোর জনম গেল ঝুরে ঝুরে
লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে
তব স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে কি নাথ
দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না॥

তুমি অশ্রুতে যে-বুক ভাসালে
সেই বক্ষে এস দিন ফুরালে।
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে
হাত দিয়ে কি কুড়াবে না॥

৪৯

বনের তাপস কুমারী আমি গো
সখী মোর বনলতা।
নীরবে গোপনে দুইজনে কই
আপন মনের কথা॥

যবে গিরিপথে ফিরি সিনান করিয়া
লতা টানে মোর আঁচল ধরিয়া
হেসে বলি, 'ওরে ছেড়ে দে, আসিছে
তোদের বন-দেবতা॥

ডাকি যদি তারে আদর করিয়া
'ওরে, বন-বল্লরী!'
আনন্দে তার ফোটা ফুলগুলি
অঞ্চলে পড়ে ঝরি।

লুকায়ে যখন মোর দেবতায়
আবরিয়া রাখে কুসুম পাতায়
ও যে চরণে আমার আসিয়া জড়ায়
যবে হই ধ্যানরতা॥

৫০

হে পাষাণ দেবতা—
মন্দির দুয়ার খোল, কও কথা কও কথা॥

দুয়ারে দাঁড়ায়ে শ্রান্তিহীন দীর্ঘদিন
অঞ্চলের পুজাঞ্জলি

শুকায়ে যায় উষ্ণ বায়
আঁখিদীপ নিভিছে, হায়
কাঁপিছে তনুলতা ॥

শুভ্রবাসে পূজারিণী, দিনশেষে
গোধূলি গেরুয়া রং হের প্রিয়
লাগে এসে
খোল দ্বার, শরণ দাও সহে না আর নীরবতা ॥

৫১

মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম গিরিধারী
কৃষ্ণমুরারি, আনন্দ ব্রজে তব সাথে মুরারি ॥
যেন নিশিদিন মুরলীধ্বনি শুনি
উজান বহে প্রেম-যমুনারি বারি
নূপুর হয়ে যেন হে বনচারী
চরণ জড়ায়ে ধরে কাঁদিতে পারি ॥

৫২

দেবযানীর মনে—প্রথম প্রীতির কলি জাগে।
কাঁপে অধর—আঁখি অরুণ অনুরাগে ॥

নব-ঘন-পরশে
কদম শিহরে যেন হরষে,
ভীরু বুকে তার তেমনি শিহরণ লাগে ॥

দেব-গুরু-কুমার ভোলে সঞ্জীবনী মন্ত্র,
তপোবনে তার জাগে ব্যাকুল বসন্ত।
নব সুর ছন্দ
আনিল অজানা আনন্দ;
পূজা-বেদী তার রাঙিল চন্দন-ফাগে ॥

৫৩

চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষী, কয়ে যাও—
না-বলা কোন বাণী বলিতে চাও॥
আড়ি পাতে নিঝ্‌ঝুম বন
আঁখি তুলি চাহিবে কখন?
আঁখির তিরস্কারে ঐ বন-কান্তারে
ফুল ফোটাও॥

নিটোল আকাশ টোল খায়
তোমার চাওয়ায় হে মীনাক্ষী,
নদীজলে চঞ্চলা সফরী লুকায়—
হে মীনাক্ষী।
ওই আঁখির করুণা
ঢালো রাগ অরুণা,
আঁখিতে আঁখিতে ফুল-রাখী বেঁধে দাও॥

৫৪

হাসে আকাশে শুকতারা হাসে
অরুণ-রঞ্জনী উষার পাশে॥

ওকি উষসীর সাথী
বাসর ঘরে জাগে রাতি,
ওকি সখীর মনের কথা জানে আভাসে॥

হাসির ছটায় ওর আঁখি কেন নাচে,
রবির রথের ধ্বনি ওকি শুনিয়াছে।
ও কেন দিবা আসিবার আগে
শ্রান্ত বধূর ঘুম ভাঙে।
ওকি ধরার সূর্যমুখী ফুটেছে নভে—
প্রিয়তমে প্রথম দেখার আগে॥

৫৫

ইরানের রূপ-মহলে শাহজাদী শিরী
জাগো জাগো শিরী।
'প্রিয়া জাগো' বলে ফরহাদ ডাকে শোনো
আজো রাতে ধীরি ধীরি॥

তুমি ধরা দেবে তারে, বে-দরদী।
যদি পাহাড় কাটিয়া আনিতে পারে সে নদী,
হের গো শিলায় শিলায় আজি উঠিয়াছে ঢেউ,
সেথা তব মুখ ছাড়া নাহি আর কেউ,
প্রেমের পরশে যেন মোমের পুতুল—
হয়েছে পাষাণগিরি॥

গলিল পাষাণ, তুমি গলিলে না বলে—
যে প্রেমিক মরেছিল তোমার পাষাণ-প্রতিমার তলে,
সেই বিরহীর রোদন যেন গো
উঠিছে ভুবন ঘিরি॥

৫৬

দোলন-চাঁপা বনে দোলে—
দোল-পূর্ণিমা-রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম-পল্লব কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥

যেন দেব-কুমারীর শুভ্রহাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি
আরতির মৃদু-জ্যোতি প্রদীপ কলি
দোলে যেন দেউল-আঙিনাতে॥

বন-দেবীর ওকি রূপালি-ঝুমকা
চৈতী সমীরণে দোলে—
রাতের সলাজ আঁখিতারা
যেন তিমির আঁচলে।

ও যেন মুঠিভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও কি রে চুরি করা শ্যামের নূপুর—
চন্দ্রা যামিনীর মোহন-হাতে॥

৫৭

রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজায়—
জল-ঝুমঝুমি।
চমকিয়া জাগে—
ঘুমন্ত বনভূমি॥

দুরন্ত অরণ্যা গিরিনির্ঝরিণী
রঙ্গে সঙ্গে লয়ে বনের হরিণী।
শাখায় শাখায় ঘুম ভাঙায়
ভীরু মুকুলের কপোল চুমি॥

কুহু কুহু কুহরে পাহাড়ী কুহু—
পিয়াল-ডালে
পল্লব-বীণা বাজায় ঝিরিঝিরি সমীরণ
তারি তালে তালে।
সেই-জল ছল ছল সুরে জাগিয়া,—
সাড়া দেয় বন-পারে
সাড়া দেয়—বাঁশী রাখালিয়া,—
পল্লীর প্রান্তর ওঠে শিহরি,
বলে—'চঞ্চলা কে গো তুমি?'

৫৮

শোন ও সন্ধ্যামালতী
বালিকা তপতী—
বেলাশেষের বাঁশী বাজে।

শোনো মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি
উদাস আকাশ মাঝে ॥

তব মৌন ব্রত ভাঙো, কও, কথা কও
মোর নৃত্য–আরতির সঙ্গিনী হও ;
মাধবী হেনা হের এলো বাহিরে—
রসরাজে হেরি রাস–নৃত্যের সাজে ॥

তুমি যার লাগি সারাদিন
বিরহ–ধ্যান–লীন—
একাকিনী কুঞ্জে,
হের সে–মাধব
রাতের ভ্রমর হয়ে
তব পাশে গুঞ্জে।
সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে—
মঞ্জরী–দীপ জ্বালো ডাকো তারে—
বুকের চন্দন–সুরভি ঢালো—
পাতার আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে ॥

৫৯

তুমি সুন্দর হতে সুন্দরতর মম মুগ্ধ মানস মাঝে
ধ্যানে, জ্ঞানে, মম হিয়ার মাঝারে
তোমারি মুরতি রাজে ॥
তোমারি বিহনে হৃদয় আঁধার
তোমারি বিরহে বহে আঁখিধার
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে
বেদনার বাঁশী বাজে ॥

কাছে কাছে আছ তবু যেন দূরে
তোমারে খুঁজিয়া সদা ফিরি ঘুরে
পাব কি গো দেখা বারেকের তরে
আমার জীবন সাঁঝে ॥

৬০

পিয়ালা কেন মিছে আনলে ভরি
কি হবে এ বেদনাকে মাতাল করি,
যে ফুলের আজি আর
নাহি কাজ ফুটিবার
দাও ওগো দাও তারে পড়িতে ঝরি॥

যে পাগল কামনার সমাধি ধারে
কেঁদে কেঁদে ঘুমায়েছে ভুলো না তারে,
সে উতাল ভরা নদী
সহসা শুকাল যদি
কি কাজ বাহিয়া আজ ভাঙা এ তরী॥

৬১

আমার যাবার সময় হল
দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো
দাও বিদায়।

ফুটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোরবেলাতে
আমায় তারা ডাকে সাথে
আয় রে আয়।
সজল করুণ নয়ন তোলো
দাও বিদায়॥

অন্ধকারে এসেছিলাম
থাকতে আঁধার যাই চলে
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে
চিরকালের না-ই হলে।

হলো চেনা হলো দেখা
নয়ন-জলে রইলো লেখা
দূর বিরহে ডাকে কেকা বরষায়।

ফাগুন স্বপন ভোলো ভোলো
দাও বিদায়॥

৬২

সজল কাজল শ্যামল এসো
কদম-তমাল কানন ঘেরি
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া
নাচুক তোমারে হেরি॥

ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘমায়া
আনো তৃষিত নয়নে মেঘল ছায়া।
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরী ব্যাকুল বিরহেরই
দাও পদরজঃ হে ব্রজবিহারী, মনের ব্রজধামে
রুমু ঝুমু ঝুমু বাজুক নূপুর চরণ ঘেরি॥

৬৩

ও কে বিকাল বেলা বসে নিরালা বাঁধিছে কেশ
হেরি আর্শিতে নিজেরই চারুমুখ
(চোখে) জাগে আবেশ॥

বসনের শাসন নাই অঙ্গে তাহার
উথলে পড়ে মুক্ত-দেহে যৌবন জোয়ার,
খুলে খুলে পড়ে কেশের কাঁটা—
বেণীর লেশ॥

আঙুলগুলি নাচের ভঙ্গিতে
খেলে বেড়ায় বেণীর বিনুনিতে,
কভু বাঁকায় ভুরু, কভু বাঁকায় গ্রীবা
ঠিকরে পড়ে আয়নায় রূপের বিভা
জাগে সহসা গালে তাঁর সিঁদুর-ডিবার
রঙের বেশ॥

৬৪

চলে কুসমী শাড়ি পরি বসন্তের পরী
নবীনা কিশোরী হেসে হেসে।
হেলিয়া দুলিয়া সমীরণে ভেসে ভেসে॥

রঙ্গিলা রঙ্গে নৃত্য-ভঙ্গে
চলিছে চপলা এলোকেশে।
পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' ডাকে শাখে
তাহারে ভালোবেসে॥

মদির চপল বায় অঞ্চল উড়ে যায়
সে বৈকালী সুর যেন চৈতী বেলাশেষে॥

মনে সে নেশ্যা লাগায়
বনে সে আঁখির ইঙ্গিতে ফুল ফোটায়
বেণুবনে তারি বাঁশী বাজে।
তারি নাম গুঞ্জরে বনে ভ্রমর
তার ঝিরঝির মিরমির বাজে মঞ্জীর
নাচের আবেশে
তার ঝুমুর ঝুমুর নূপুর ধ্বনি
হাওয়াতে মেশে॥

৬৫

বেলওয়ারি চুড়ি কে নিবি আয় পুর-নারী।
চুড়িওয়ালী আমি এনেছি চুড়ি রকমারি॥
যৌবন যার হল বাসি
বঁধু যার পরবাসী
এই চুড়ি কবচ তারি॥

কে আছ বিরহিণী
এই রেশমী চুড়ি কিনি
ভোলো বিরহ ভোলো ভোলো

মিলনের রাখী কাঁচের এ চুড়ি
কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী॥

যাদু জানে এই চুড়ি
বশ হয় ননদ শাশুড়ি
এ চুড়ি পরলে হাতে
রাঙা বর পায় যত আইবুড়ি।
চাই, চুড়ি চাই—আয় বধূ আয়,
আয় কিশোরী, আয় কুমারী,
নে ভোলা মনের এই চুড়ি মনোহারী॥

৬৬

জোছনা-স্নাহসিত মাধবী নিশি আজ।
পরো পরো প্রিয়া বাসন্তী রাঙা সাজ॥

রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণমূলে—
পরো সোনালি চেলি নব সোনালি ফুলে।
স্বর্ণলতার পরো সাতনরী হার—
আজি উৎসব-রাত, রাখ রাখ গৃহ-কাজ॥

পরো করবী মূলে নব আমের মুকুল,
হাতে কাঁকন পরো গেঁথে অতসীর ফুল
দূরে গাহুক ডাহুক পাখি
সখি, মুখর নিলাজ॥

৬৭

চৈতী হাওয়ার মাতন লাগে
হলুদ চাঁপার ডালে ডালে।
তালিবনে বাজে তারি করতালি তালে তালে॥

ভ্রমর-মুখে গুনগুনিয়ে
যায় মৃদু তার সুর শুনিয়ে

শুকনো পাতার মর্মরে তার
নূপুর বাজে রুনঝুনিয়ে।

ফুলে পাতায় রং মাখায় সে
ফিকে সবুজ নীলে লালে,
ওড়ে তাহার রঙের নিশান
প্রজাপতির পাখার পালে॥

৬৮

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে,
আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে॥

মোরে চেন কি?
মোর আঁচলে চাঁপা হেনা জুঁই অতসী
মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল
নব আমের মুকুল
মম উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে॥

আনি মলয় গিরি হতে চন্দন-গন্ধ
হৃদয় উদাস করা সমীর সুমন্দ,
ছড়াই আবীর হাসি জোছনার স্বর্ণে॥

৬৯

পুরুষ : এলে তুমি কে কে ওগো
তরুণা-অরুণা-করুণা-সজল চোখে॥
স্ত্রী : আমি তব মনের বনের পথে
ঝিরি ঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী
আমি যৌবন-উন্মনা হরিণী মানস-লোকে॥

পু : ভেসে যাওয়া মেঘের সজল ছায়া
ক্ষণিক মায়া তুমি প্রিয়া,

স্বপনে আসি বাজায়ে বাঁশী
স্বপনে যাও মিশাইয়া॥

স্ত্রী : বাহুর বাঁধনে দিইনে ধরা
আমি স্বপন-স্বয়ম্বরা॥
সঙ্গীতে জাগাই ইঙ্গিতে ফোটাই
তোমার প্রেমের জুঁই-কোরকে॥

পু : এস নেমে আমার মাটির কুটীরে
কঙ্কণ-তালে ডালিম্ব-ডালে
নাচাবে ময়ূর ময়ূরী দুটিরে।

স্ত্রী : চেয়ো না বন্ধু নামাতে মাটিতে
আসিবে উজান চলে যাব ভাটিতে।

উভয়ে : আধেক প্রকাশ আধেক গোপন
আধো জাগরণ আধেক স্বপন
খেলিব খেলা মোরা ছায়া-আলোকে॥

৭০

পুরুষ : কিশোরী বাসন্তী ডাকিছে আয় আয়
ফাগুন তোমারে ডাকিছে ফুলবন॥

স্ত্রী : ডাকে হে শ্যাম তোমায় তাল ও তমাল বন
শন শন॥

পু : তুমি ফুলের বারতা
স্ত্রী : তুমি বন-দেবতা
উভয়ে : আমরা আভাস ফাল্গুনের
দূর স্বর্গের পরশন॥

পু : কল্প-লোকের তুমি রূপরাণী গো প্রিয়া
অপাঙ্গে ফোটাও জুঁই চম্পা টগর মোতিয়া।

স্ত্রী : নিঠুর পরশ তব (হায়) যাচিয়া জাগে বনভূমি
ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারু পদ চুমি।
উভয়ে : আমরা ফুলশর-উর্বশী
দেব-সভার মোরা হরষণ॥

৭১

যাও মেঘদূত, দিও প্রিয়ার হাতে
আমার বিরহলিপি লেখা কেয়া-পাতে॥

আমার প্রিয়ার দীরঘ নিশ্বাসে
থির হয়ে আছে মেঘ যে-দেশেরই আকাশে॥

আমার প্রিয়ার ম্লান মুখ হেরি
ওঠে না চাঁদ আর যে-দেশে রাতে॥

পাইবে যে-দেশে কুন্তল সুরভি বকুল ফুলে
আমার প্রিয়া কাঁদে এলায়ে কেশ সেই মেঘনা-কূলে।
স্বর্ণলতা সম যার ক্ষীণ করে
বারে বারে কঙ্কণ চুড়ি খুলে পড়ে
মুকুল বাসে যথা বরষার ফুলদল
বেদনায় মুরছিয়া আছে আঙিনাতে॥

৭২

নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে।
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে
ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে॥

ফুরায় দিনের কাজ,
ফুরায় না রাতি

শিয়রের দীপ হায়
অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।

কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি
বিষাদ–মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি,
দিন যায় দিন গুণে, নিশি যায় নিরাশে॥

৭৩

বাদল ঝর ঝর আসিল ভাদর
বহিছে তরলতর পূবালি পবন।
মেঘলা যামিনী–দামিনী চমকায়
কালো মেয়ের ভীরু প্রেমের মতন॥

আমি ভুলিয়াছি মেঘেরা ভোলেনি
সেই কালো চোখ, সেই বিনুনী–বেণী
প্রিয়ার দূতীসম স্মরণে আনে মম
এসেছিল একদিন এমন শুভ–লগন॥

আর কিছু ছিল কিনা, ছিল নাতো স্মরণে,
শুধু জানি দুইজন ছিনু এই ভুবনে,
সহসা মোদের মাঝে ছুটে এল পারাবার
কে কোথায় হারাইনু কূল নাহি পেনু আর ;
মনে পড়ে বরষায়, তার সেই অসহায়
বিদায়–বেলায় আঁখি অশ্রু–সঘন॥

৭৪

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি,
হতাম ময়ুরপাখা। (সখা হে)
তোমার বাঁকা চুড়ায় শোভা পেতাম
ওগো শ্যামল বাঁকা॥

আমি হলে গোপী চন্দন, শ্যাম,
অলকা-তিলকা হতাম,
শ্যাম-চাঁদমুখে
শ্রী-অঙ্গের পরশ পেতাম
হলে কদম-শাখা ॥

আমি বৃন্দাবনের বন-কুসুম
হতাম যদি কালা,
তোমার কণ্ঠ ধরে ঝরে যেতাম
হয়ে বনমালা।
আমি নূপুর যদি হতাম হরি
কাঁদিতাম শ্রীচরণ ধরি
ব্রজধূলি হলে রইতো বুকে
চরণচিহ্ন আঁকা ॥

৭৫

সুন্দর অতিথি এসো, এসো কুসুমঝরা বনপথে
তোমার আশায় মুকুলগুলি চেয়ে আছে প্রভাত হ'তে ॥

পাতায় পাতায় শিহর লাগে
তোমার আসার অনুরাগে
কণ্ঠে কুহুর কূজন জাগে
প্রজাপতির পাখায় জাগে
চঞ্চলতা
ছাইল আকাশ রাঙা আলোতে ॥

চলতে যদি বেদনা পায় তব কোমল চরণ-কমল।
বন-বীথিকার পথ-ধূলি ছেয়েছে পাপড়ির দল
পেয়ে তোমার আসার আভাস
চেয়ে আছে উদাস আকাশ
উতল হল মন্দ বাতাস
তুমি আসবে কখন সোনার রথে ॥

৭৬

বনের ময়ূর কোথায় পেলি এমন চিত্র–পাখা
তোর পাখাতে হরির শিখী–পাখার স্মৃতি আঁকা॥

তারি মত হেলে দুলে
নাচিস রে তুই পেখম খুলে
তনুতে তোর শ্যামের আঁখির নীলাঞ্জন মাখা॥

হারিয়ে নওল কিশোরেরে দিবানিশি ঝুরি'
তাই কি শ্যামের বিভূতি তুই আনলি করে চুরি।
সান্ত্বনা কি দিতে মোরে
শ্যাম রেখে গেছে তোরে,
তাই তো তোরে হেরি, ওরে যায় না কাঁদন রাখা॥

৭৭

স্ত্রী : তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশী নেয়ে॥

পুরুষ : যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল–বরণী মেয়ে॥

স্ত্রী : তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে, কলস ভেসে যায়।

পু : তুমি পরো যে শাড়ি ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে যাই তারি সারি গান গেয়ে॥

স্ত্রী : গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে।

পু : সেই মালা চাহি
নিতি এই পথে গো আমি তরী বাহি।

উভয়ে : মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে খেয়ে॥

৭৮

নাচে নটরাজ মহাকাল।
অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া
আলো ছায়ার বাঘ-ছাল॥

কাল-সিন্ধুজলে তাথৈ তাথৈ রব
শুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব।
বিষাণ-মন্ত্রে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল॥

গঙ্গা-তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
ছন্দ জাগে সেই নৃত্য-বিভঙ্গে
জ্যোৎস্না-আশিসধারা ঝরে চরাচরে
ছাপিয়া ললাট-শশী-ভাল॥

৭৯

এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া
বেণুকুঞ্জ-ছায়ায় এসো তাল-তমাল-বনে
এসো শ্যামল,
ফুটাইয়া যূথী কুন্দ নীপ কেয়া॥

বারিধারে এসো চারিধারে ভাসায়ে
বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দশদিক হাসায়ে
বিরহী মনে জ্বালায়ে আশার আলেয়া
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম-পিয়া॥

শ্রাবণ বরিষণ হরষণ ঘনায়ে
এসো নব ঘন শ্যাম নূপুর শোনায়ে।
হিজল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে
তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে
যমুনা-স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের খেয়া
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম-পিয়া॥ ॥

৮০

তৃষিত আকাশ কাঁপে রে,
প্রখর রবির তাপে রে।
চাহিয়া তৃষ্ণার বারি
চাতক উঠে ফুকারি
করুণ শ্রান্ত বিলাপে রে॥

রুদ্র যোগী ওকে দূর বিমানে
নিমগ্ন রহিয়াছে যেন ধ্যানে।
শকুন্তলা সম ভয়ে
কাঁপে ধরা রয়ে রয়ে
অগ্নি-ঋষির অভিশাপে রে॥

৮১

আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে চেয়ে
আমায় চেয়ে দেখিসনে তাই
রূপ-গরবী মেয়ে॥

নাইতে গিয়ে নদীর জলে
দেরী করিস নানান ছলে
ভাবিস তোরে দেখতে কখন
আসবে জোয়ার ধেয়ে।
রূপ-গরবী মেয়ে॥

চাঁদের সাথে মিলিয়ে দেখিস
চাঁদ-পানা মুখ তোর
ভাবিস তুই-ই যেন আসল শশী
চাঁদ যেন চকোর।
ওলো চাঁদ যেন চকোর
বনের পথে আনমনে
দাঁড়িয়ে থাকিস অকারণে
ভাবিস তোরে দেখেই বুঝি
বিহগ ওঠে গেয়ে
ওলো রূপে-গরবী মেয়ে॥

৮২

বসিয়া বিজনে কে গো বিমনা
নিরালায় বাসনা-তুলিকায়
আঁকিছ কোন আলপনা॥

অনামিকায় কভু জড়াও অঞ্চল
(কভু) ভাসাও স্রোতে মালার ফুলদল
কভু আনমনে চাহ-গগন-কোণে
যেন কোন উদাসী কামনা॥

পলক নাই চোখে, মুখে নাহি বাণী
ফেলে-যাওয়া যেন কার বাঁশরীখানি।
তাহারি আগমনী অন্তরে শুনি
উছলি উঠিবে মৌন সুরধুনী
বাজিবে মধু-মুরছনা॥

৮৩

ও কে মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়।
রাঙা হাসির পরাগ-ফুল আননে ঝরায়॥

তার রঙের আবেশ লাগে চাঁদের চোখে
তার লালসার রং জাগে রাঙা অশোকে
তার রঙীন নিশান দোলে কৃষ্ণচূড়ায়॥

তার পুষ্পধনু দোলে শিমুল-শাখায়
তার কামনা কাঁপে গো ভোমোরা-পাখায়
সে খোঁপাতে বেলফুলের মালা জড়ায়॥
সে কুসমী শাড়ি পরায় নীল-বসনায়
সে আঁধার মনে জ্বালে লাল রোশনাই
সে শুকনো বনে ফাগুন আগুন ধরায়॥

৮৪

আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখী
দেখেছিস তুইও নাকি প্রিয়ার ডাগর আঁখি॥
মধু ও বিষ মেশা
সেই যে আঁখির নেশা
তোরে করেছে পাগল, তাই কি এত ডাকাডাকি॥

চোখে পড়লে বালি জ্বালাতে জ্বলিয়া মরি
চোখে যার পড়েছে চোখ, সে বাঁচে কেমন করি।
ফিরাই আঁখি যেদিক পানে
তারি ছবি মনে আনে
বলিস পাখী দেখা হলে প্রাণ শুধু আছে বাকি॥

৮৫

বেদনার সিন্ধু মন্থনে শেষ, হে ইন্দ্রাণী,
জাগো জাগো, করে সুধা–পাত্রখানি॥

রোদন–সায়রে ধুয়ে পুষ্পতনু
এস অশ্রুর বরষার ইন্দ্রধনু
হের কূলে অনুরাগে
জীবন–দেবতা জাগে
ধরিবে বলিয়া তব পদ্মপাণি॥

তব দুখ–রাত্রির তপস্যা শেষ
এলো শুভদিন,
অতল–তমসা–পারে প্রভাতের প্রায়
জাগো অমলিন।
সুরলোক–লক্ষ্মী গো তুমি অমরার
এসো এসো পার হয়ে ব্যথার পাথার॥
অশ্রুত অশ্রুর
নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি॥

৮৬

ঝরঝর অঝোর ধারায় ঝরিছে মনে
রঙের ঝুরি।
দোলন-খোঁপায় দোল দিয়ে যায়
দুলাল-চাঁপার তরুণ কুঁড়ি॥
চঞ্চলতার আবেশ লেগে
আঁচল আমার রয় না গায়ে,
জরিন ফিতার বাঁধন টুটে
ব্যাকুল বেণি লুটায় পায়ে।
খেলছে চোখে মন্মথ আজ
রতির সাথে লুকোচুরি,
নাচের তালে আপনি বাজে
চপল হাতে কাঁকন চুড়ি॥

৮৭

চাও চাও চাও নববধূ অবগুণ্ঠন খোলো
আনত নয়ন তোলো।
সই আমি যে ননদী খরতর নদী লজ্জা কি?
লজ্জায় ফুল-শয্যায় কাল ছিল না তো নত ওই আঁখি।
আমি সবই বলে দেবো যদি বউ কথা না বলো॥

'বউ কথা কও' ডাকে পাখি
তবুও নীরব রবে নাকি?
দেখি দেখি গালে লালী ও কিসের?
লজ্জায় বুঝি লাল হলো॥

ওকি অধীর চরণে যেয়ো না যেয়ো না
আন-ঘরে লুকাইতে, দেখে যদি কেউ।
সখি, পাশের ও-ঘরে মানুষ যে রহে,
তারও অন্তরে বহে বিরহের ঢেউ।

লজ্জাই যদি তব ভূষণ
সজ্জায় ছিল কি প্রয়োজন?
সুখে-সুখী হব দুখে দুখী
বসো মুখোমুখি
লাজ ভোলো॥

৮৮

মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন
ত্রিভুবন মাঝে প্রভু বাণীবিহীন॥
সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় গ্রহ-তারাদল
স্থির হয়ে রয় অপলক অচপল
ধ্যান-মৌনী মহাযোগী অটল
আপন মহিমায় তুমি সমাসীন॥

মৌন সে সিন্ধুতে জলবিম্বের প্রায়
বাণী ও সঙ্গীত যায় হারাইয়া যায়।
বিস্ময়ে অনিমেষ আঁখি চেয়ে রয়
তব পানে অনন্ত সৃষ্টি; প্রলয়,
তব ধ্রুব-লোকে, হে চির-অক্ষয়
সকল ছন্দ-গতি হইয়াছে লীন॥

৮৯

হায় আঙিনায় সখি
আজও কি সেই চাঁপা ফোটে।
হায় আকাশে সখি
আজও কি সেই চাঁদ ওঠে॥

সখি তাহার হাতের হেনা গাছে
বুঝি প্রথম মুকুল ধরিয়াছে?
হায় যমুনার বাঁশী বাজে কি আর ছায়ানটে॥

শিয়রের জানলা খুলে দে বাহিরে চাহিয়া দেখি
আমার বাগানে আবার বসন্ত আসিয়াছে কি?
দেখি সেই ডালিম ফুলে হায় আছে কি রং
সে আগেকার?
ও-বাড়ির ছাদের টবে সেই বেলফুল
ফুটলো কি আবার?
আজ আসিবে সে, মনে লাগে

তারি আসার আভাস বনে জাগে
হায় শত সাধ জাগে মরণ-মলিন মোর ঠোঁটে॥

৯০

বনে যায় যায় আনন্দ-দুলাল
বাজে চরণে নূপুরের রুনুঝুনু তাল।
বনে যায় গোঠে যায়
ও কি নন্দ-দুলাল ও কি ছন্দ-দুলাল
ওকি নন্দন-পথ-ভোলা নৃত্যগোপাল॥

তার বেণুরবে ধেনুগণ আগে যেতে পিছে চায়
ভক্তের প্রাণ গলে,
উজান বহিয়া যায়,
লুকিয়ে দেখিতে এল দেবতারি দল
হয়ে কদম তমাল॥

ব্রজগোপিকার প্রাণ তার চরণে নূপুর
শ্রীমতী রাধিকা তার বাঁশরীর সুর।
সে যে ত্রিলোকের স্বামী তাই ত্রিভঙ্গ-রূপ
করে বিশ্বের রাখালি সে চির-রাখাল॥

৯১

নবনীত সুকোমল লাবণি তব শ্যাম
অবনীতে টলে টলমল।
পত্রে পুষ্পে বনে সুনীল গগন-কোলে
সেই লাবণির মায়া ঝলে ঝলমল॥

বিল-ঝিল, তড়াগ, পুকুর
সাগর-নদীতে তব শ্যামলিমা
হেরি ভরপুর।

শিশির-মুকুরে তব করুণ-ছায়া, শ্যাম
করে ছলছল॥

নীলের সাগরে তব যেন বিন্দু-প্রায়
কোটি গ্রহ তারকা ভাসিয়া ভাসিয়া যায়
বিশ্ব ব্রহ্মলোক অহরহ করে ধ্যান,
শ্যামসুন্দর তব রূপ ঢল ঢল॥

৯২

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ,
হে মহাকাল প্রলয়-তাল ভোলো ভোলো॥

ছড়াক তব জটিল জটা
শিশু-শশীর কিরণ-ছটা
উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোলো দোলো॥

মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনী-তরঙ্গে
সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য-বিভঙ্গে।
ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি
জটাতে পর চম্পা বেলি
শ্মশানে নব জীবন, শিব, জাগিয়ে তোলো।

৯৩

দোলা লাগিল দখিনার
বনে বনে।
বাঁশরী বাজিল ছায়ানটে মনে মনে॥
চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে
যৌবনের বিহঙ্গ ঐ ডেকে ওঠে
ক্ষণে ক্ষণে॥

বাজে বিজয়-ডঙ্কা তার এল তরুণ ফাল্গুনী।
জাগো ঘুমন্ত জাগো ঘুমন্ত—দিকে দিকে ঐ গান শুনি।
টুটিল সব অন্ধকার
খোলো খোলো বন্ধ দ্বার
বাহিরে কে যাবি আয়—সে শুধায়
জনে জনে॥

৯৪

হের গোধূলি-বেলা সই ঘনিয়ে এলো ওই
কি ভয়ে কি জানি উঠল্ অঙ্গ ছম্‌কে!
কেন জল নিতে এলাম সই অবেলা
একে অল্প বয়স তাহে একেলা।
কাঁখে কাঁখে ঘড়া দেহে ডালি-ভরা
যৌবন-পসরা উঠি চম্‌কে॥

পিছে পিছে আসিছে কেন কে
হাসে চটুল চোখে।
আর চলতে নারি সখি ধর ধর
কাঁপে দেহলতা কেন থর থর।
ঐ কলঙ্কী কালারে বল্ যেতে বল্
দেশ ভরিবে মোদের কলঙ্কে।
বল্ তারে, জল নিতে কাল হতে
আসব না আর এ পথে॥

৯৫

পুরুষ : কোন ফুলের মালা দিই
তোমার গলে লো প্রিয়া।
বুলবুল গাহিয়া ওঠে
তব ফুলের পরশ নিয়া॥

স্ত্রী : হাতে দিও হেনার গুছি কেশে শিরীষ ফুল,
কর্ণে দিও টগরকুঁড়ি অপরাজিতার দুল।

কুন্দকলির মালা দিও না-হ পেলে বকুল
ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল॥

পু : কোন ভূষণে রাণী
ও রূপের করি আরতি,
হায় সোনার বরণ মলিন হেরি
তোমার রূপের জ্যোতি॥

স্ত্রী : তোমার বাহুর বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার
হাতে দিও মিলন-রাখী খুলবে না যা আর।
কানে দিও, কানে কানে কথার দুটি দুল
নিত্য নূতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার॥

পু : কোন নামেতে ডাকি
সাধ না মেটে কোনো নামে।
তব নাম গানে সব কবি
হার মানে ধরাধামে।

স্ত্রী : সুখের দিনে, সখি বলো সেই তো মধুর নাম
দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।
নিরালাতে রাণী বলো শ্রবণ-অভিরাম
বুকে চেপে প্রিয়া বলো সেই তো আমার নাম॥

৯৬

পুরুষ : বনদেবী এস গহন বন-ছায়ে।
স্ত্রী : এস বসন্তের রাজা নূপুর-মুখর পায়ে॥

পু : তুমি কুসুম-ফাঁদ
স্ত্রী : তুমি মাধবী চাঁদ
উভয়ে : আমরা আবেশ ফাগুনের
ভাসিয়া চলি স্বপন-নায়ে॥
পু : কল্প-লোকের তুমি
রূপরাণী লো প্রিয়া
অপাঙ্গে ফোটাও যুঁই, চম্পা, টগর, মোতিয়া

স্ত্রী : নিষ্ঠুর পরশ তব (হায়)
যাচিয়া জাগে ... বনভূমি
ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারু পদচুমি।
উভয়ে : সুন্দরের পথ সাজাই
ঝরা-কুসুমদল বিছায়ে

৯৭

মিনতি রাখো রাখো পথিক, থাকো থাকো
এখনি যেয়ো না গো—না না না॥
এখনি গেয়ো না গো—না-না-না॥
ক্ষণিক অতিথি বিদায়ের গীতি
এখনি গেয়ো না গো—না না না॥

চৈতী পূর্ণিমা চাঁদের তিথি, হে অতিথি,
পুষ্প-পাগল এ বনবীথি
ধূলায় ছেয়ো না গো—না-না-না॥

বলি বলি করে হয়নি যা বলা
যে কথা ভরিয়াছিল
বুকের তলা—
সে কথা না শুনে, সুন্দর অতিথি হে,
যেতে চেয়ো না গো
না না না।

৯৮

মোরে রাখিসনে আর ধরে।
পারের ঠাকুর ডাক দিয়েছে (ডাক দিয়েছে ওরে)
এই পারেরই অন্ধকারে মন যে কেমন করে॥

আয়ু-রবির অস্তপথে
এল ঠাকুর কনক-রথে
গোধূলি-রঙ হাসিটি তার ঝরছে চোখের 'পরে॥

চোখ দুটি মোর ভরে জলে
বলব ঠাকুর নাও গো কোলে,
রইতে নারি (আমি তোমায় ছেড়ে) রইতে নারি
আমার এ প্রাণ (পূজার ফুলের মত)
তোমার পায়ে পড়ুক ঝরে ॥

৯৯

তোমাদের দান তোমাদের বাণী
পূর্ণ করিল অন্তর
তোমাদের রস-ধারায় সিনানি
হল তনু শুচি-সুন্দর ॥
শান্ত উদার আকাশের ভাষা
মলিন মর্তে অমৃত পিপাসা
দিলে আনি, দিলে অভিনব আশা
গগন-পবন সঞ্চর ॥

বুলায়ে মায়ার অঞ্জন চোখে
লয়ে গেলে দূর কল্পনা-লোকে
রাঙালে কানন পলাশে অশোকে
তোমাদের মায়া-মন্তর ॥

ফিরদৌসের পথ-ভোলা-পাখি
আনন্দলোকে গেলে সবে ডাকি
ধূলি-ম্লান মন গেলে রঙে মাখি
ছানিয়া সুনীল অম্বর ॥

১০০

অনাদরে স্বামী পড়ে আছি আমি
তব কোলে তুলে নাও।
নিয়ে ধরণীর ধূলি আছি আমি ভুলি
চরণের ধূলি দাও ॥

বিভবে বিলাসে সংসার কাজে
অশান্ত প্রাণ কাঁদে বন্ধন-মাঝে
বৃথা দ্বারে দ্বারে চেয়েছি সবারে
এবার তুমি মোরে চাও॥

যাহা কিছু প্রিয় জীবনে মম
হরিয়া লহ তুমি প্রিয়তম।
সূর্যের পানে সূর্যমুখী ফুল
যেমন চাহিয়া রয় বিরহ-ব্যাকুল।
তেমনি প্রভু আমার এ মন
তোমার পানে ফিরাও॥

১০১

যোগী শিব-শঙ্কর ভোলা দিগম্বর
ত্রিলোচন দেবাদিদেব
ধ্যানে সদা মগন॥
চির শ্মশানচারী
অনাদি সমাধিধারী,
স্তব্ধ ভয়ে চরণে তাঁরি
প্রণতি করে গগন॥

ত্রিশূল বিষাণ রহে পড়িয়া পাশে
ললাটে শশী নাহি হাসে।
গঙ্গা তরঙ্গ-হারা ভীত ভুবন।
ত্রাহি হে শম্ভু শিব
ত্রাসে কাঁপে জড় ও জীব
ভোলো এ ভীষণ তপ
গাহিতেছে সঘন॥

১০২

ভোরে স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা
লুকালে সহসা।

মোর তপনের রাঙা কিরণ যেন
বিরিল তমসা॥

না ফুটিতে মোর কথার কুঁড়ি
চপল বুলবুলি গেলে উড়ি
গেল ভাসিয়া ভোরের সুর যেন
বিষাদ-অলসা॥

জেগে দেখি হায় ঝরা ফুলে আছে ছেয়ে
তোমার পথতল,
ওগো অতিথি কাঁদিছে বনভূমি
ছড়ায়ে ফুলদল।
মুখর আমার গানের পাখি
নীরব হলো হায় বারেক ডাকি
যেন ফাগুনের জ্যোৎস্না-হসিত রাতে
নামিল বরষা॥

১০৩

যুগ যুগ ধরি লোকে-লোকে মোর
প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই।
সংসারে গেহে, প্রীতি ও স্নেহে
আমার স্বামী বিনে সুখ নাই॥

তাঁর চরণ পাবার আশা লয়ে মনে
ফুটিলাম ফুল হয়ে কতবার বনে।
পাখি হয়ে তাঁরি নাম
শতবার গাহিলাম
তবু হায় কভু তার দেখা নাহি পাই॥

গ্রহ-তারা হয়ে খুঁজেছি আকাশে
দিকে দিকে ছুটেছি মিশিয়া বাতাসে
পর্বত হয়ে নাম কোটি যুগ ধেয়ালাম
নদী হয়ে কাঁদিলাম খুঁজিয়া বৃথাই॥

পশু-পাখি তরুলতা জড় জীব হয়ে হায়
শত রূপে শত লোকে আমি যাই খুঁজি তায়
ধরা দিই দিই করে
সহসা সে যায় সরে
যত নাহি পাই তত তাঁহারে ধেয়াই॥

১০৪

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল
যায় ভেসে যায় কালের স্রোতে।
ওগো সুদূর ওগো বিধুর
তোমার সাগর-তীর্থ-পথে॥
বিফল দিনের কমলগুলি
পড়লো ঝরে পাঁপড়ি খুলি,
নিও প্রিয় তাদের তুলি
দিনশেষের ম্লান আলোতে॥

সঞ্চিত মোর দিনগুলি হায়
ছড়িয়ে গেল অযতনে
তোমার বরণ-মালা গাঁথা
হল না আর এ জীবনে।

অন্য মনে কখন বেভুল
ভাসিয়ে দিলাম দলি সে ফুল,
বঞ্চিত তাই হবে কি হায়
তোমার চরণ-ছোঁয়া হতে॥

১০৫

বেণুকা ও-কে বাজায় মহুয়া বনে
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে॥

বলে আয় সে দুরন্তে, সখি,
আমারে কাঁদাবে সারা জনম ও-কি?
সে কি ভুলিতে তারে দেবে না জীবনে॥

সখি, ভালো ছিল তার তীর-মধুক সিন্ধুর
বাজে আরো সকরুণ তার বেণুকার সুর।
সখি, কেন সে বন-বিলাসী
আমারি ঘরের পাশে বাজায় বাঁশী?
আছে আরো কত দেশ
কত নারী ভুবনে॥

১০৬

আমার বিফল পূজাঞ্জলি
অশ্রু-স্রোতে যায় যে ভেসে
তোমার আরাধিকার পূজা
হে বিরহী, লও হে এসে॥
খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন
পূজে তোমায় বিশ্বভুবন
আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন
মিটবে কি সাধ ভালোবেসে॥

না দেখা মোর বন্ধু ওগো
কোথায় তুমি
কোথায় বাঁশী বাজাও একা,
প্রাণ বোঝে তা অনুভবে
নয়ন কেন পায় না দেখা।
সিন্ধু যেমন বিপুল টানে
তটিনীরে টেনে আনে
তেমনি করে তোমার পানে
আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে॥

১০৭

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল
(ওগো) তব চরণে।
আমার এ হৃদয় নাথ হোক তন্ময়
তোমারি স্মরণে॥

তব পূজার বেদী হোক আমার এ মন
হোক আরতি-প্রদীপ মোর এ দুটি নয়ন
নাথ, লহ মোরে পায় তোমারি সেবায়
জীবনে-মরণে॥

মম দুঃখ-সুখে মম তৃষিত বুকে
তুমি বিরাজ,
মোর সকল কাজে বীণা-বেণু সম
নিশিদিন বাজো॥

মোর দেহখানি, নাথ চন্দন প্রায়
হোক ক্ষয় তব মন্দির-পাষাণ-শিলায়
আমি পাই যেন লয়, নাথ, তব সৃষ্টির
রূপে বরণে॥

১০৮

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন,
ওগো অন্তর্যামী
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই
পাই না তোমারে আমি॥

প্রাণের মতন, আত্মার সম
আমাতে আছ হে অন্তরতম
মন্দির রচি বিগ্রহ পূজি
দেখে তুমি হাস স্বামী॥

সমীরণ সম, আলোর মতন
বিশ্বে রয়েছ ছড়ায়ে,
গন্ধ-কুসুমে সৌরভ সম
প্রাণে প্রাণে আছ জড়ায়ে।
তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন
তব লীলা হেরি অন্তবিহীন,
তব লুকোচুরি-খেলা সহচরী
আমি যে দিবসযামী॥

১০৯

নারায়ণ ! নারায়ণ !
যে নাম জপেন ইন্দ্র-চন্দ্র-ব্রহ্মা-মহেশ্বর,
যে নাম করেন ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর।
সীমা যাঁহার পায় না খুঁজি অসীম চরাচর।
যাঁর করে শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র সুদর্শন,
নারায়ণ ! নারায়ণ !

যাঁর অনন্তলীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
মধুকৈটভাসুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ
কভু করাল ভীষণ কভু মদনমোহন।
নারায়ণ ! নারায়ণ !
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ।
নারায়ণ ! নারায়ণ !

১১০

নাচে গৌরীদিব্য হিমগিরি-দুহিতা
নাচে দীপ্তিমতী নাচে উমা তপতী
নাচে রে চির-আনন্দিতা॥

তার কিরণ-আঁচল দোলে ঝলমল
গিরি-পাষাণ অটল করে টলমল
গলিয়া তুষার ঝরে নির্ঝর জল
তার চরণ-ছন্দ-চকিতা॥

তার নাচের মায়ায় প্রাণ পায় জড় জীব
ভুলি বিরহ সতীর জাগে যোগীন্দ্র শিব।
জাগে কুসুম-কলি গাহে বিহগ অলি
তার রূপে ত্রিদিব হল দীপান্বিতা॥

১১১

এলো এলো রে ঐ সুদূর বন্ধু এলো।
এলো পথ-চাওয়া এলো হারিয়ে পাওয়া
মনের আঁধার দূরে গেলো
ঐ বন্ধু এলো॥

এলো চঞ্চল বন্যার জল
মন্থর স্রোতনীরে,
এলো শ্যামল মেঘ-মায়া
তৃষিত-গগন ঘিরে।
তার পলাতকা মৃগে বন ফিরে পেলো॥

এলো পবনে চঞ্চল বিহ্বলতা
শান্ত ভবনে এলো সারা ভুবনের কল-কথা।
অলি গুঞ্জরি কয়, জাগো বন-বীথি
ডাকে দখিণা-মলয় এলো এলো অতিথি।
বাজে তোরণ-দ্বারে বাঁশরী-গীতি
দুখ-নিশি পোহালো আঁখি মেলো॥

১১২

পুরুষ : কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে বাজে বাজে লো
ঘুঙুর কাহার পায়ে।
স্ত্রী : হাতে তলতা বাঁশের বাঁশি, মুখে জওলা হাসি
কে ঐ বুনো গো বেড়ায় আদুল গায়ে লো
বেড়ায় আদুল গায়ে॥

পু : তার ফিঙের মত এলো খোঁপায় দোলে ঝিঙেরই ফুল
স্ত্রী : যেন কালো ভ্রমর-ঝাঁক ওই কালার ঝামর চুল।
উভয়ে : ও যদি না হতো পর, দুজনের হতো ঘর
একই গাঁয়ে লো একই গাঁয়ে॥

পু : ওর বাঁকা ভঙিমা দেখে, দ্বিতীয়ার চাঁদ বেঁকে
হতে চাহে ওর হাঁসুলি হার
স্ত্রী : ঝিলের শঙ্খ ঝিনুক বলে ঝিনুক বিনা-মূলে
আমরা হব কালার কণ্ঠেরই হার, লো!

পু : ও মেয়ে নয়, ও পাহাড়ী ঝর্ণার সুর
স্ত্রী : ও পুরুষ নয়, ও কষ্টিপাথরের ঠাকুর।
উভয়ে : ও যদি বাসতো ভালো আসতো কাছে
রাখতাম হিয়ায় লুকায়ে গো হিয়ায় লুকায়ে॥

১১৩

উভয়ে : ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো,
ঘুঙুর বেঁধে গায়।
নাচব দুজন মাদল বাঁশী নূপুর নিয়ে আয় লো,
নূপুর নিয়ে আয়॥
স্ত্রী : আর জনমে চোরকাঁটা তুই ছিলি রে
চোরকাঁটা তুই ছিলি,
এই জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি
পুরুষ : চোরকাঁটা নয়, ছিলাম গায়ের ঝিলি লো
গয়না ছিলাম গায়ে লো॥

স্ত্রী : ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল লো,
নাচায় শালুক ফুল।
পু : ঐ শালুক যেন চাঁদোপানা মুখখানি তোর লো,
ঝিলের ঢেউ যেন তোর এলোচুল।

স্ত্রী : কুহুকুহু ডাকে কোকিল কাহার কথা কহে, লো,
পু : সেই কথা কয় কোয়েলা সে জনমে করেছি যা
তোরই বিরহে লো তোরই বিরহে।

উভয়ে : সে জনমের দুটি হৃদয় এ জনমে হায়
এক হতে যে চায় লো এক হতে চায়॥

১১৪

ননদী ! হার মেনেছি তোর সনে।
তব নিলাজ ভাষা শুনে লজ্জা পেয়ে
বনে লুকালো
রাখিতে কি পারি ঘোমটা আর আননে॥

চারিপাশে সই কৌতুক-মাখানো
হের ঐ উকিঝুকি লুকিয়ে তাকানো,
থাকি তাই সই লুকায়ে নিরালা কোণে॥

কে জানে কোথা হতে এলো সই কেমনে
এত মধু এত লাজ আমারই নয়নে।

মধুরা মুখরা ওলো! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর-জামাই চোর?
প্রিয় সঙ্গী তুই সই এ নব ভবনে॥

১১৫

মদনমোহন শিশু নটবর
শ্যামল সুন্দর যশোদা-দুলাল
নেচে নেচে চলে মঞ্জু চরণতলে
বাজে সুমধুর মণি-মঞ্জীর তাল॥

সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
ধরণীতে উৎসব জাগে
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল জাগে
সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল॥

কোটি গ্রহতারা ভানু আলোকিত ধেনু
আসে গগন-গোঠে শুনি তারি বেণু।
নাচে দিবা শ্বেত রাজহংসী
তিমির কেকা নাচে শুনি তার বংশী,
পায়ে হয় বৃষ্টি অনন্ত সৃষ্টি
শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল॥

১১৬

মন জপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম
নব-দুর্বা-দলশ্যাম নয়নাভিরাম।

সুরাসুর কিন্নর যোগী মুনি ঋষি নর
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম ॥

সজল জলদ নীল নবঘন কান্তি
নয়নে করুণা আননে প্রশান্তি ;
নাম শরণে টুটে যায় শোক তাপ শ্রান্তি
রূপ নেহারি মুরছিত কোটি কাম ॥

১১৭

বাঁশী বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা
তব পথ চাহি ভারত–যশোদা জাগে নিরালা
বাঁশরীওয়ালা ॥
কৃষ্ণা তিথির তিমিরহারী
শ্রীকৃষ্ণ এসো, এসো মুরারি,
ঘরে ঘরে আজ পুতনা–ভীতি হানিছে কালা
বাঁশরীওয়ালা ॥

কংস–কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকের পাষাণ–ভার নামাও নামাও
যুগ–যুগ–সম্ভব পূর্ণাবতার।
নিরানন্দ এ–দেশ হাসুক আবার আনন্দে
হে নন্দলালা,
বাঁশরীওয়ালা ॥

১১৮

এ কি অপরূপ রূপের কুমার
হেরিলাম সখি যমুনা কূলে,
তার এ সুনীল লাবণি গলিয়া গলিয়া
ঢলিয়া পড়িছে গগন–মূলে ॥

যেন কমল ফুটেছে সখি,
সহস্রদল রূপে কমল ফুটেছে,
রূপের সাগর মন্থন করি সখি
চাঁদ যেন উঠেছে। সখি গো

কালো সে রূপের মাঝে হয়ে যায় হারা
কোটি আলো—রাধিকা রবি 'শশী' তারা,
প্রেম-যমুনার তীরে সই
নিরবধি দেখি তারে, দেখি আর চেয়ে রই।
আমি এইরূপ চেয়ে থাকি
সখি জনমে জনমে জীবনে মরণে
এইরূপ চেয়ে থাকি,
যেন এইরূপে চেয়ে থাকি।
ঐ মোহন কালোর গহন কাননে
হারাইয়া যাক আঁখি॥

১১৯

অচেনা চেনায় বৃথা আসা-যাওয়া
জনমে জনমে এই পথ-চাওয়া
কাঁদিয়া কাঁদায়ে ফুরাইয়া গেল
চোখের জলের পুঁজি॥

যত নাহি পাই দেবতা তোমায়
তত কাঁদি আর পূজি,
ধরা নাহি দাও যতই লুকাও
ততই তোমারে খুঁজি॥

কত সে রূপের রঙের মায়ায়
আড়াল করিয়া রাখ আপনায়
তবু তব পানে অশান্ত মন
কেন ধায় নাহি বুঝি॥

তোমারে যে চায় কাঁদাও তাহায়
কেন নিশিদিন, স্বামী—
তব অনন্ত লুকোচুরি-খেলা কভু শেষ হবে কি?

১২০

বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন
শম্ভু মাধব॥

দক্ষিণে শঙ্কর শ্রীহরি বামে
মিলিয়াছে যেন রে কানু বলরামে,
দেখি একসাথে যেন দেখি রে,
স্বয়ম্ভু কেশব॥
বিমল চেতনা আনন্দ মদন
শিব–নারায়ণের যুগল মিলন।
একসাথে ব্রজধাম শিবলোকে
অরূপ স্বরূপ নেহারি চোখে
শোন রে একসাথে বেণুকার প্রণব॥

১২১

বাঁশী বাজায় কে কদমতলায়, ওগো ললিতে!
শুনে সরে না পা পথ চলিতে।
তার বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝুরে ঝুরে
আমারে খোঁজে লো ভুবন ঘুরে।
তার মনের বেদন শত সুরে সুরে
ও সে কি যেন চাহে যে বলিতে॥

আছে গোকুল নগরে আরো কত নারী
কত রূপবতী বৃন্দাবন–কুমারী
আছে গোকুল নগরে।
কেন আমারই নাম লয়ে বংশীধারী
আসে নিতি নিতি মোরে ছলিতে॥

সখি, নির্মল কুলে মোর কৃষ্ণ–কালি
কেন লাগালে কালিয়া; কলঙ্কী!
আমার বুকে দিলে তুষের আগুন জ্বালি
আরও কত জনম যাবে জ্বলিতে॥

১২২

পুরুষ : জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি
তব হাসি–কান্না চোখের দৃষ্টি
তারও চেয়ে মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি।

স্ত্রী : কান্না–মেশানো পান্না নেবো না, বঁধু
এই পথেরই ধূলায় আমার মনের মধু
করে হীরা মানিক সৃষ্টি,
মিষ্টি আরো মিষ্টি॥

পুরুষ : সোনার ফুলদানি কাঁদে
লয়ে শূন্য হিয়া
এসো মধু–মঞ্জরি মোর !
এসো এসো প্রিয়া !

স্ত্রী : কেন ডাকে বউ কথা কও,
বউ কথা কও !
আমি পথের ভিখারিণি গো,
নহি ঘরের বউ
কেন রাজার দুলাল মাগে
মাটির মউ
বুকে আনে ঝড়,
চোখে বৃষ্টি অঝর
সকরুণ দৃষ্টি তবু মিষ্টি॥

১২৩

চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী।
চারিদিকে রঙ ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী॥

যে সকলের মন মাতায় কলকাতার চৌমাথায়,
ওপারে যে ফিল্মের ঝিলমিল আলোর দেয়ালি
এপারে যে পথের ভিখারিণী চোখের বালি।

গোরা কালো সাহেব মেমে
মন্দ ভালো বি-এ এম-এ
সবাই তাহার সঙ্গী॥

যে দক্ষিণ হাত তুলি দক্ষিণা চায়
আলো দেয় রবি শশী, ফুল দেয় দখিনা বায়।
ওকি গোলাপ ফুল নারঙ্গী?
নুয়ে পড়ে আকাশ দেখে তাহার নাচের ভঙ্গী॥

১২৪

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না
এ মিনতি করি হে।
হৃদয় কারেও নাহি দিও
আমারে বিস্মরি হে॥

চোখের বাহির হলে
মনের বাহির গেলে
মরমে মরিব সখা
প্রেম গেলে ঝরি হে॥

আমার সমাধি পরে
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে
জুড়াব হৃদয়-জ্বালা
ও-চরণ চুমি হে॥

১২৫

ওরে ও বিদেশী বন্ধু!
ও তুই সাঁঝের বেলায় গাঙের কূলে
রোজ বেয়ে যাস তরী।
আমি একলা ঘাটে বসে যে ভাবি
ভসায়ে গাগরী॥

ভাটির টানের সাথে সাথে
তোর ভাটিয়ালি সুরে
বন্ধু: সাধের কাজল যায় ধুয়ে গো
নয়ন আমার ঝুরে।
আর ঘরকে যেতে মন মানে না গো
আমি জল ফেলে জল ভরি॥

তোর লাগি মাথায় নিলাম
কলঙ্কেরই ডালা
সেই কলঙ্ক ফুল হল মোর
হল গলার মালা।
পাড়ার লোকে কয় আমারে
বলে ননদী
কলঙ্কিনীর মরণ ভালো
আজো শুকায়নি নদী।
বলি তুই যদি গাঙ হোসরে বঁধু
আমি তাইতে ডুবে মরি॥

১২৬

যেথায় দূরে গাঙের জলে ফুল ফুটেছে থরে থরে
যেথায় ও দুটি নয়ন—
কেন আমার আসা-যাওয়ার পানে
তাকায় সারাক্ষণ?
ওই ও-দুটি নয়ন॥
মাঠের পথে চলতে গিয়ে
শরমে যায় পা জড়িয়ে
অমন করে যায় না যেন
সই করেছে বারণ।
কেন আমার আসা-যাওয়ার পানে
তাকায় সারাক্ষণ?
ও-দুটি নয়ন॥

চুরি করে চাইতে গিয়ে
বিঁধল কাঁটা পায়ে,

মোর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়ে
দক্ষিণের বায়ে।
মাথার কিরে, বল সখি বল
নয়নে তার জল না সে ছল
মোর কাছে কি চায় বিদেশী গো
চায় মালা না মোর মন?
কেন আমার আসা-যাওয়ার পথে
তাকায় সারাক্ষণ
ও-দুটি নয়ন॥

১২৭

রসঘনশ্যাম কল্যাণ-সুন্দর।
প্রশান্ত সন্ধ্যার উদার শান্তি দাও
শ্রান্ত মনের ভার হর হে গিরিধর॥

যে নিবিড় সমাধির গভীর আনন্দে
হিমালয় লীলায়িত নীরব ছন্দে,
সেই মহাযোগে কর মোরে মগ্ন
যে মহাভাবে ভোর মৌন নীলাম্বর॥

অপগত দুখশোক নিশীথ সুষুপ্তির মাঝে
নিথর সিন্ধুর অতলতলে যে শান্তি বিরাজে।
যে সুধা লভিয়া ঋষি মধুছন্দা
আনিল বেদবাণী অলকানন্দা,
অন্তরে বাহিরে সেই অমৃত দাও
কর পুরুষোত্তম অজর অমর॥

১২৮

সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে
বিষাণ ত্রিশূল ফেলি
গভীর বিষাদে॥

জটাজুট গঙ্গা,
নিস্তরঙ্গা
রাহু যেন গ্রাসিয়াছে
ললাটের চাঁদে ॥

দুই করে দেবী-দেহ
ধরি বুকে বাঁধে
রোদনের সুর বাজে
প্রণব নিনাদে।
ভক্তের চোখে আজি
ভগবান শঙ্কর—
সুন্দরতর হল—
পড়ি মায়া-ফাঁদে ॥

১২৯

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ—
আছে শুধু প্রাণ—
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান ॥

নিরাশার বিবর হতে—
আয় রে বাহির পথে,—
দেখ্, নিত্য সেথায়—
আলোকের অভিযান ॥

ভিতর হতে দ্বার বন্ধ করে—
জীবন থাকিতে কে আছিস মরে।
ঘুমে যারা অচেতন,—
দেখে রাতে কু-স্বপন,
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান ॥

১৩০

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি,
হে প্রলয়ঙ্কর।

রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি—
সংহর, সংহর ॥

জ্ঞান-হীন তমসায় মগ্ন
পাপ-পঙ্কিলা,
বিশ্ব জুড়ি চলে শিবহীন
যজ্ঞের লীলা,
শক্তি যেথায় করে আত্ম-বিসর্জন
ঘৃণায়—
ধ্বংস কর সেই অশিব যজ্ঞ —
অসুন্দর ॥
যথা দেবীশক্তি—নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে—
ধরমের মোহে।
হানো সংঘাত, অভিসম্পাত
সেথা নিরন্তর ॥

১৩১

এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন।
ধেনু দেবো বেণু দেবো মালা-চন্দন ॥

কেঁদে কেঁদে কয়লা-খাদে যমুনা বহাব,
পলাশবনে জাগরণে নিশি পোহাব ;
রাধা হয়ে বাঁধা দেবো আমার প্রাণমন ॥
মোর নটকান রঙ শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে
পীত-ধড়া পরাব নীল অঙ্গ ঘিরে
পিয়াল-ডালে দোলনা বেঁধে দুলিব দু'জন ॥

ভাসুর শশুর দেখে যদি করব না কো লাজ
বলব আমার শ্যামের বাঁশী বাজ রে আবার বাজ
শ্যাম তোমার লাগি জাতি কুল দিব বিসর্জন ॥

১৩২

ওরে গো-রাখ রাখাল ! তুই কোথা হতে এলি
এমন আষাঢ় মাসের মেঘের বরণ কেমন করে পেলি।
কে দিয়েছে আলতা নোখ পায়
চলতে গেলে নূপুর বেজে যায়
আদুল গায়ে বাঁধা কেন গাঁদা-রঙের চেলি।।

তোর ঢলঢলে দুই চোখ যেন নীল শালুকের কুঁড়ি
তোকে দেখে কেন হাসে রে যত গয়লাপাড়ার ছুঁড়ি !
তোর গলার মালার সঙ্গে আমার মন
গুনগুনিয়ে বেড়ায় রে মৌমাছি যেমন।
মোর ঘর-সংসার ভুলালি রে কোন মায়াতে ফেলি।।

১৩৩

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইব না আর পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল, হারাইল যদি
তুমি এসো প্রাণে প্রেমধারা।।

ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে
প্রভু আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন-কারা।।

১৩৪

আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল বেচব তারে কেয়ামতের হাটে।।

পত্তনীদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবীজীর
বেহেশতেরি তালুক কিনে বসবো সোনার খাটে

মসজিদে মোর মরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি।
মনকীর–নকীর দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমামকে মোর সাথী করে
রদ হবে না–কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে॥

১৩৫

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী–পরী লাজ পায়॥

নর নহে, নারী ইসলাম 'পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান ;
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥

নবী–নন্দিনী ফতেমা মোদের সতীনারীদের রানী
যাঁর ত্যাগ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর পানি,
যাঁর গুণ–গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নরনারী আজো গায়॥

রহিমার মত মহিমা কাহার, তাঁর সম সতী কেবা ?
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি–সেবা,
মোদের খাওয়ালা জগতের আলো বীরত্বে গরিমায়॥

রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়,
শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময় ;
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥

আঁধার হেরেমে বন্দিনী হল সহসা আলোর মেয়ে
সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।
লক্ষ খালেদা আসিবে, যদি এ নারীরা মুক্তি পায়॥

১৩৬

তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি
শুকাতে হয় শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থামি॥
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, তিল হব ঐ কপোলের
দুলবো মণিমালা হয়ে ঐ গলে দিবস-যামি॥
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, ধূপ হব মিলন-রাতে
গহীন ঘুমে স্বপন হব, জল হব নয়নপাতে॥
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রানী হব, হে মোর রাজা।
চরণতলের ধূলি হব, হে মোর জীবনস্বামী॥

১৩৭

চোখ মুছিলে জল মোছে না বল সখি, এ কোন জ্বালা
শুকনো বনে মিছেই কেন একলা কাঁদে ফুলবালা॥
হায়, যে বাহু-লতার বাঁধন হেলায় খুলে যায় চলি
বাঁধবে কি তায় আজ নয়নের জলে ভেজা এই ফুলমালা॥
কালবোশেখী মিছেই কাঁদে ফাগুন রাতের আপসোসে
মিছেই মরুর বুক ভেজাতে হায় শিশিরের জল ঢালা॥
গাইতে যে গান আপনমনে সকাল হতে সুর সাধা
আর কেন সই, এই অবেলায় শেষ করে দাও তার পালা॥

১৩৮

তুমি আনন্দঘন শ্যাম
আমি প্রেম-পাগলিনী রাধা।
তব ডাক শুনে ছুটে যাই বনে
না মানি কুলের বাধা॥

শূন্য প্রাণের গাগরি ঘিরে
নিতি আসি রস-যমুনার তীরে,
অঙ্গ ভাসায়ে তরঙ্গ-নীরে
শুনি তব বাঁশী সাধা॥

যুগ-যুগান্ত অনন্তকাল হৃদয়-বৃন্দাবনে
তোমাতে আমাতে এই লীলা নাথ,
চলিছে সঙ্গোপনে।
মোর সাথে কাঁদে প্রেম-বিগলিতা
ভক্তি ও প্রীতি বিশাখা ললিতা
তোমারে যে চায় মোর মতো হায়
সার শুধু তার কাঁদা॥

১৩৯

উভয়ে : মোরা ছিলাম একা আজি মিলিনু দু'জন।
পাপিয়ার পিয়া-বোল কপোত-কূজন॥

বর : তুমি সবুজের স্রোত এলে ঊষর দেশে
বধূ : তুমি বিধাতার বর এলে বরের বেশে
বর : তুমি গৃহে কল্যাণ
বধূ : তুমি প্রভু মম ধ্যান।
উভয়ে সুন্দরতর হলো সুন্দর ত্রিভুবন॥

১৪০

নাত-জামাই

ঠানদি : ভাই নাতজামাই!
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—
তুমি বৌ-এর তীর্থে ন্যাড়া হও
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও,
বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।

ফোঁসফোঁসাবে বাইরে শুধু
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও,
দিনের বেলায় ফরফরাবে
রাত্রিবেলা খোঁড়া হও।

সূর্যি চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরটা কাল ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ম্যাড়া হও।
কার আজ্ঞে, না, কামরূপ
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে॥

১৪১

মা : তুমি হও মা, চির-আয়ুষ্মতী
সাবিত্রী সমান সতী।
অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে
চিরকাল এই ঘরে রও।
শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী
স্বামীর সুয়োরানী হও।
তোমায় পেয়ে বিধির বরে
যেন এ ঘর ধনে জনে ভরে।

সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যাবে
রুপোর খাটে চুল শুকাবে।
কন্যা পাবে উমার মত
শিবের মত জামাই পাবে।
পাবে পুত্র ভীমার্জুনের মত
সদা থাকবে স্বামীর শরণগত।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
দেহ রাখবে গঙ্গাজলে।
সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান॥

১৪২

দিদি : তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো
এই আলোতে মোদের ঘরে
কেটে যাবে আঁধার কালো।

রাঙা হাতে সাদা শাঁখা
অন্নপূর্ণার আশিস-মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও-হাতে,
অম্লান থাক সিঁদুর মাথে।

এই চাই ভাই ঘরে পরে
পড়বে সবার সু-নজরে।
হাসিমুখে থাকবে সদা
কথায় হবে প্রিয়ম্বদা।
আলতা সিঁদুর নোয়া পরে
থাক তিন কুল আলো করে।

অরুন্ধতী তারার মত
থাক স্বামীর অনুগত।
জানবে নাকো দুঃখ-শোক
অন্তে পাবে স্বর্গ-লোক॥

১৪৩

আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে
আশা-অরুণ রবি।
মৃত জনগণে বাঁচাতে এলো যেন
নূতন প্রাণ-জাহ্নবী॥
তন্দ্রা-মগন জাগিছে জনগণ নব আশার মোহে
গলি পাষাণগিরি প্রাণ-নিঝর বহে,
শোভিল ফুলে ফলে শুষ্ক অটবি॥

নতুন দিনের পাখীরা ছুটে আসে
শত রঙের খেলা মুক্ত আকাশে।
ছুটিল দিকে দিকে 'জয় ভারত' গাহি
শত চারণ কবি॥

১৪৪

কালের শঙ্খে বাজিছে আজও
তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ!

প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন
শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥

নিখিল মানবের প্রথমা ধাত্রী
শিক্ষা-সভ্যতা-দীক্ষাদাত্রী !
আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি
লভিতে তোমারি চরণস্পর্শ॥

শিল্প-সঙ্গীত বেদ-বিজ্ঞান
সাংখ্য-দর্শন পুণ্য প্রেমধ্যান।
যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহীয়ান
বিশ্ব সাক্ষী, মাগো, সকলি তোমার দান।
জগৎ-সভা মাঝে তাহারি সন্তান
আজি মলিন মুখ লাজে বিমর্ষ॥

১৪৫

এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই।
মেঘমুক্ত এমন আকাশ
চন্দনিত এমন বাতাস
ফুল-ফসলের ছড়াছড়ি কোথায় এতো পাই॥

জল চাইলেই হাতের কাছে ছুটে আসে নদী,
মাটিতে পাই খাঁটি সোনা একটু কাটি যদি।
গিরিদরী-সাগর-মরু
পশু-পাখী লতা-তরু
বিশ্বের সব দৃশ্য দেখি যখন যাহা চাই॥

পাঁচভূতে খায় লুটে রে ভাই আমার দেশের দান
(তবু) কম হল না কভু ইহার বিভব অফুরান।
মানুষ শুধু নাই এ দেশে
নইলে কি ভাই এ দীন বেশে
কেঁদে বেড়ায় দেশ-জননী অঙ্গে মেখে ছাই—
মোরা অবহেলে এই অফুরান বিভব যে হারাই॥

১৪৬

দে দোল, দে দোল
ওরে দে দোল, দে দোল
জাগিয়াছে ভারত-সিন্ধু-তরঙ্গে কল-কল্লোল!
তুষার গলেছে রে, অটল টলেছে রে,
জেগেছে পাগল রে, ভেঙেছে আগল
দে দোল, দে দোল॥
বন্ধন ছিল যত, হল খানখান রে
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি জুড়াইয়া প্রাণ রে
দুর্মদ-যৌবন আজি উতরোল।
যে দোল দে দোল
ওরে দে দোল, দে দোল॥

অভিশাপ-রাত্রির আয়ু হল ক্ষয় রে
আর নাহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে,
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে
আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল দ্বার খোল রে।
দে দোল, দে দোল
ওরে দে দোল, দে দোল॥

১৪৭

ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা-পথের
বাঁশী বাজলো বাজলো বাঁশী।
ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এলো তরুণ-পথিক এলো রাশি রাশি॥

তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে
প্রাণ জাগায় মৃতে
(তারা তরুণ—তরুণ প্রাণ জাগায় মৃতে)
সাহস জাগায় চিতে তাদের অট্টহাসি॥

মোরা প্রাচীরের পরে প্রাচীর তুলে
ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে।
আজ ভেঙে প্রাচীর হল ঘরের বাহির
একই অঙ্গনে দাঁড়ালো উন্নত শির
এলো মুক্ত-গগনতলে প্রাণ-পিয়াসী
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি॥

১৪৮

[দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে]

জাগো জাগো জাগো, হে দেশপ্রিয় !
ভারত চাহে তোমায়, হে বীর বরণীয়॥
চিতার ঊর্ধ্বে, হে অগ্নিশিখা
ঊর্ধ্বে কারার বন্ধহারা, হে বীর জাগো,
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয়॥

ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো
বজ্র-বাণী অম্বরে হানি জাগো,
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়ো॥

ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়ন-লীনা জাগো,
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥

১৪৯

[দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে]

বিশাল-ভারত-চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে
কাণ্ডারি হে দেখাও দিশা অসীম অশ্রু-সাগর-নীরে॥
নাই দিশারী নাই সেনানী আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে,
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে,
সাগর-দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে॥

রাজৈশ্বর্য বিলিয়ে, নিলে হে বৈরাগী ভিক্ষা-ঝুলি
সোনার অঙ্গে মাখলে তুমি পায়ে-চলা পথের ধূলি।
দেশজননী ত্রিংশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুলতে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্য তাহার মাতৃহিয়া;
কে পরাবে রানীর মুকুট বন্দিনী মা'র রিক্ত শিরে॥

১৫০

হে ভ্যাবাকান্ত!
দাও হে গানে ক্ষান্ত
তব তান শুনে তানসেন লুঙ্গি ফেলে ভেগে যায়
পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বঁড়শীর প্রায়।
ধরিয়া সুরের কাছা করিছ গামছা কাচা
বেচারি গানেরে যেন করিছ বাপান্ত॥

তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়িভাড়া
সা-রে-গা-মা সাধা শুনে প্রাণ হল খাঁচাছাড়া
হয় মনে সন্দেহ ধরিয়া টানিছে কেহ
যেন জীব বিশেষের লাঙ্গুল-প্রান্ত॥

সুরের অসুর তুমি গানের আফগান
সরস্বতীরে ধরে পরাইছ চাপকান,
দেখে বীণা ফেলে দেয় নারদ পিঠটান
বাহনের গান শুনে শিব উদভ্রান্ত॥

১৫১

[শুক-সারীর গোঁফ-দাড়ি সংবাদ]

শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপ-নারী।'
সারী বলে, 'গোঁফের বাহার আছে বলে দাড়ি
(ও) আমার গোঁফ-পিয়ারী॥'

শুক বলে, 'মোর গোঁফেশ্বরে দেখে ভুবন ভোলে।'
সারী বলে, 'ঝুলন রাসের দোলনা যে দোলে
(ও) আমার দাড়ির কোলে॥'

শুক বলে, 'গোঁফ ওষ্ঠে থাকেন, গোষ্ঠে যেন কালা।'
সারী বলে, 'আমার দাড়ি কুলের কুলবালা
(ও) চলেন হেলে দুলে॥'

শুক বলে, 'বীর শিকারীরা এই গোঁফে দেয় চাড়া
সারী বলে, 'মুনি-ঋষির দেখবে দাড়ি ন্যাড়া।'
(ও) কিবা বাহার তোলে
শুক বলে, 'মোর ত্রিভঙ্গিম ঠোঁটবিহারী গোঁফ।'
সারী বলে, 'তমাল-কানন আমার দাড়ির ঝোঁপ
দখিণ-হাওয়ায় দোলে॥'

শুক বলে, 'গোঁফ খুরির দধি চুরি করে খায়।'
সারী বলে, 'দাড়ি মেদীর রং মেখেছে গায়
যেন হোরীর আবীর।
দাড়ি বড় তাই গোঁফের গরব মিছে।'
শুক বলে, 'দাড়ি যতই বাড়ুক তবু গোঁফের নীচে,
সারী, কি যে বল॥'

১৫২

'বউ মেনিয়া'

নিউমোনিয়ায় ভুগে ভুগে কোন ক্রমে সেরে উঠে
বউ-মেনিয়া রোগে এবার বেড়ান দাদা ছুটে ছুটে॥

যেদিন বাপের বাড়ি গেলেন রাগ করে মোর বৌদিরানী
দাদা আমার শয্যা নিলেন ছেড়ে দিয়ে দানাপানি।
'উঃ কী ঘন প্রেম'—বললে সবাই,
যতই বুঝাই আমরা ক' ভাই,
শুকিয়ে ততই গোবর-গনেশ দাদা আমার হলেন ঘুঁটে॥

বউ-মেনিয়া রোগ সে ভীষণ। বউ বলে সে যাকে তাকে
যথায় তথায় ঠেসে ধরে, এমন কি ভীমরুলের চাকে।
সেদিন পাড়ার ডোমনী বুড়ী
এসেছিল বেচতে ঝুড়ি
ঝাপটে ধরে বৌ ভেবে তার পায়ে দাদা পড়ল লুটে॥

(ওরে) দামড়া সে এক ছিল শুয়ে আরাম করে গলির মোড়ে
বৌদিরাণীর বেণী ভেবে (দাদা) কাঁদেন তাহার ল্যাজুড় ধরে।
বলে-ছাড়ি এ সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরি এ'
গিন্নী-ধরার ভয়ে দাদার
হল ক্রমে লোকের পথচলা ভার।
(ভয়ে) আসে না আর এ পাড়াতে কাবুলিওয়ালা ঝাঁকামুটে॥

১৫৩

খোকার মাসী

(ওগো) আমার খোকার মাসী শ্রীঅমুক বালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক করে হাসি॥

তার চোখ প্রায় পুঁটি মৎস্যই
চেহারাও নয় জুৎসই,
আবার (তার) আছে তিনটি বৎসই
কিন্তু সে স্বাস্থ্যে খোদার খাসি॥

সে খায় বটে পান-জর্দা
আর, চেহারাও মর্দা মর্দা।
তবু, বুঝলে কিনা বড়দা
আমি তারেই ভালোবাসি॥

শালী, অর্থাৎ কিনা, বৌ সে পনর আনাই,
তারে দিয়ে একটা আনি দাদা ঘরে যদি আনি
সে বৌ হয় ষোল আনাই,
কি বল দাদা এঁ্যা?

আমি তারই লাগি জেলে
মরবো ঘানি ঠেলে
তারে নিয়ে ভাগবো রেলে
না হয় পরবো গলায় ফাঁসি ॥

১৫৪

নাটিকা : 'প্রীতি-উপহার'

বেয়াই-বেয়ান

(বেয়াই মেয়ের বাপ, বেয়ান বরের মা)

বেয়াই : আলাপের যে ফুরসত নেই, এসো এসো এসো বেয়ান।
(আহা) বেয়ান যেন জিরান রসের কড়াপাকের ভিয়ান ॥

বেয়ান : রসের কথা কে বলে ও? ময়রা মিনসে বুঝি?
কে ও? বেয়াই? মাফ কর ভাই!
গরু-খোঁজা করে আমি তোমায় ফিরছি খুঁজি!

বরের বাবা : (ওগো গিন্নী, গিন্নী কোথায় গো?
অ! বেয়াই-এর সাথে ভিড়ে গেছ বুঝি!)
আহা, এঁরা যেন রাধা-কেষ্ট আমি মাঝে আয়ান ॥

বেয়াই : হাবা-গোবা গো-বেচারী
দেখতে মোদের এ বেয়ান,
কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার
ঘড়েল শেয়ান ॥

বেয়ান : বেয়াই, তুমি জানোয়ার লোক, জানো অনেক কিছু
ল্যাজের মত উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু।
(আমরা) মুখখুসুখখু পাড়াগেঁয়ে
নাই তো তেমন বুদ্ধি-গেয়ান ॥

বরের বাবা : দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জমে না ভালো!

বেয়াই : আমার গিন্নী! আরে রাম! কদা কুচ্ছিত কালো!

বেয়ান : বেয়াই! খাসা তোমার মুখমিষ্টি,
কথা তো নয় সুধা-বৃষ্টি!

বরের বাবা : কারণ, তুমি বর্তমানে বেই-মশায়ের ধেয়ান।

১৫৫

ঝি ও চাকর

চাকর : (ওগো ও কনে–বাড়ির ঝি !)
বলি, ও বিন্দে ! এই গোবিন্দের পানে চাহ
চোখ মেলে।
আমি সত্যি বলি, বত্তে যাবি আমার মত লোক পেলে॥

ঝি : তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পর্কে বেয়াই,
তাই, পেলি আজ রেহাই।
নইলে তোর পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসী
আখার ছাই !

চাকর : বলি, কে বললে বিন্দে, মোদের সম্পর্ক নাই ?
আমি তোমার ননদের একমাত্র ভাই।

ঝি : আ মর মিনসে। সয় না সবুর, হাড় জ্বালাতে এলে !
ঘেমে নেয়ে উঠছে যে বিরহের বোঝা ঠেলে ! (ষাট ষাট)
(একটু দাওয়ায় বসো, হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে।
দাওয়ায় বসো। প্রেম–পাগলের দাওয়াই যে ঐ,
দাওয়ায় বসো)

চাকর : আজ হ্যাকচ প্যাকচ প্রাণ সবারই আনন্দেরই ঠেলায়।

ঝি : আর, এক যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায় !

চাকর : আমি ন্যাজের মত দিবানিশি
তোমার ঘুরছি পিছে পিছে।

ঝি : আবার যদি জ্বালাস দিব গামলার জল হিঁচে।

উভয়ে : আমরা গিলব অঢেল আনন্দে আজ একটু ছাড়া পেলে
যেমন দুর্ভিক্ষের দেশের মানুষ গোগ্‌গেরাসে গেলে॥

১৫৬

কোরাস : চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক !
সাম্যের জয় হোক !
ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে।

পুরুষ : সহিব না আর এই অবিচার
খুলিয়াছে আজি চোখ॥

কোরাস : প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়—
আজ এই কথা যেন কয়—
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে—
ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্বজয়ী আমরা সর্বহারার দল
সুন্দর হবে শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল।
পুরুষ কণ্ঠ : আমরা আনিব অভেদ ধর্ম
কোরাস : নব বেদ-গাথা শ্লোক॥

১৫৭

হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি
পলাশী, হায় পলাশী॥
আত্মঘাতী স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুমকুম
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ কুসুম।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ সূর্য ওঠে যেন
দিগন্ত উদ্ভাসি॥

শেষ গান

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি॥

ফুল ফুটিয়ে ভোরবেলাতে গান গেয়ে
নীরব হল কোন নিষাদের বাণ খেয়ে,
বনের কোণে বিলাপ করে
সন্ধ্যারাণী চুল খুলি॥

কাল হতে আর ফুটবে না হায়
লতার বুকে মঞ্জরি
উঠছে পাতায় পাতায় কাহার
করুণ নিশাস মর্মরি।

গানের পাখী গেছে উড়ে, শূন্য নীড়—
কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়।
আলেয়ার এ আলোতে আর
আসবে না কেউ কূল ভুলি॥

গীতিনাট্য :
'শাল-পিয়ালের বনে'

ঝুমরো : শাল-পিয়ালের বনে গো পাহাড়তলীর কাছে
একটি ছেলে শিস দেয় আর একটি ছেলে নাচে।
নূপুর : সেই ছেলেটির বুনো স্বভাব ভারি
বাঁশীর সাথে বর্শা-ধনুক-ধারী
সেই মেয়েটি দোলনা বেঁধে দোলে মহুল গাছে॥

মেয়েটির গান

(অ) ঝুমরো! তীর ধনুক নিয়ে বল না কোথায় যাস?
পাখী যদি মারিস ঝুমরো আমার মাথা খাস।
ঐ শোন 'চোখ গেল' পাখী—
জামের ডালে উঠল ডাকি'
শুনিস নাকি মহুল-বনে উঠছে দীঘল শ্বাস॥

ছেলের গান

শোন রে নূপুর, পাহাড়তলীর মেয়ে।
খুশী হলুম দেখতে তোরে পেয়ে॥

বন-বরাহ শিকারে
যাব পঞ্চকোট পাহাড়ে

(মোর) তীর থেমে যায় বুনো পাখীর
আঁখির পানে চেয়ে॥

মেয়ের গান

হলুদ-বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে
দেখ না কেমন দুটি ফিঙে নাচে।
দেখ না চেয়ে ভাই
মোর শ্যামলী গাই
মায়ের মতন কেমন চেয়ে আছে॥

আজ মানা বনে যেতে,
আমি বসব আঁচল পেতে
তুই বাঁশী বাজা বসে অশথ-গাছে॥

ছেলের গান

কুনুর-নদীর ধারে—শোন ডাকছে বালি-হাঁস।
মানিক-জোড়ের ঝুমকো পরে হাসছে নীল আকাশ॥

ওদের সাথে হায়
মন বাইরে যেতে চায়
বাঁশী হাতে নিলে, পরান আরো হয় উদাস॥

(মাদল ও বাঁশীর সাথে ফেড-ইন)
কোরাস গান

পুং : কয়লা খাদে যাব না
করব ধানের পাটি।
পাতার পাটি বিছিয়ে শুই
চাইনে পালং-খাট॥

পুং : খড়ের পালই ধানের মরাই নিয়ে
রাত কাটাব মহুয়ার মউ পিয়ে।

ছেলে এবং মেয়ে

আমরা কেমন সুখী।
জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকী॥
যেন বনের মৌটুসী
থাকি সদাই খুশী।

স্ত্রী-১—বট-অশথের তরুর মতন আমায় ছায়া দিস
স্ত্রী-২—আমার মনের মাঠে হাসিস হয়ে ধানের শীষ।

ছেলের গান

আমি যাবই যাব বনে
বুনো বাঘের অন্বেষণে॥
ফিরি যদি, রাতের বেলা
বাঁশী নিয়ে করব খেলা
কয়লা আমি কাটব নাকো খাদে
মাঠে যেতে পরান আমার কাঁদে
তার চেয়ে ব্যাধ হওয়া ভালো নূতন যৌবনে॥

মেয়ের গান

শোন ঝুমরো, শোন
তোর কাঁদবে যে মা-বোন।
ভাইবোনের চেয়ে বন কি রে তোর
এতই আপনজন॥
কুহু উহু উহু বলে দেখ উড়ে গেল চলে
কুসুম নদীর দুই কূল দেখ উঠল ভরে জলে,
তোর কনে বৌ কাঁদবে যে ভাই নিয়ে ঘরের কোণ॥

ছেলের গান

গিরিমাটির দেশে গো
নাই যদি আর ফিরি
আমার কথা বলবে কেঁদে ঝরনা ঝিরিঝিরি ৷৷

কয়লাখাদে উঠবে ধোঁওয়া, চাঁদ ঢাকবে মেঘে,
(সেই) চাঁদের বুকে আমার কালো ছায়া উঠবে জেগে
আমার নূপুর বাজাবে গো শিরীষ পাতা
ঝিরিঝিরি ৷৷

আমার কনে বৌ-এর বুকে বাজবে বাঁশী একা
রামধনুতে হারানো মোর ধনুক যাবে দেখা।
তাল-পুকুরে শালুক হয়ে
যার আশাপথ রইব চেয়ে—
দেখলে তারে অমনি করে যাব থিরিথিরি ৷৷

'সন্ধ্যামালতী'র অন্তর্গত অনেক গান বিশেষতঃ সংলাপ-ধর্মী গান নজরুলের রচিত বিভিন্ন রেকর্ড-নাটিকা এবং নাট্য-গীতি থেকেও গৃহীত।

রাঙা জবা

১

বল রে জবা বল !
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল ॥

মায়া-তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল !
তোর সাধনা আমায় শেখা, জবা, জীবন হোক সফল ॥

কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা !

তোর মত মা-র পায়ে রাতুল
হব কবে প্রসাদী-ফুল
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁওয়া লেগে উঠবে রেঙে,
কবে তোরই মতো রাঙবে রে মোর মলিন চিত্ত-দল ॥

২

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হলো মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হলো মোর রূপের-ডালি ॥

তবু মায়ের রূপ কি হারায়
(সে যে) ছড়িয়ে আছে চন্দ্র-তারায়

মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি ॥

উমা হলো ভৈরবী হায়
বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।

অন্ন দিয়ে ত্রিজগতে,
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজ-দুলালি ॥

৩

ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ এলাম মনের পশু নিয়ে ॥

তুই যে বলিদান চেয়েছিস,
কাম-ছাগ, ক্রোধরূপী মহিষ ;
মা তোর পায়ে দিলাম লোভের জবা মোহ-রিপুর ধূপ জ্বালিয়ে ॥

মাগো দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর মদ-সলিল তোর চরণে,
মাৎসর্যের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।
ষড় রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস মা বারে বারে
সেই পূজারই মন্ত্র মা গো ভক্তরে তোর দে শিখিয়ে ॥

৪

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢাকতে নারে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন ॥

মাখিয়ে কালো আমার চোখে
লুকিয়ে রাখিস তোর কালোকে,
(তোর) কালো রূপে মা গো অখিল বিশ্ব নিমগন॥

আঁধার নিশীথে সে যেন তোর কালো রূপের ধ্যান
(তোর) গহন কালোয় গাহন করে পুড়ায় ধরার প্রাণ॥
হেরি তোর কালো রূপ স্নিগ্ধ করা
শ্যামা হলো বসুন্ধরা,
নিবল কোটি সূর্য, তোরে খুঁজে অনুক্ষণ॥

৫

(ও মা) দুঃখ অভাব ঋণ যতো মোর
রাখলাম তোর পায়ে
(এবার) তুই দিবি মা, ভক্তের তোর
সকল ঋণ মিটায়ে॥

মাগো সমন-হাতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এখন,
তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন
ছেলের ঋণের দায়ে॥

ও মা সুদ-আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে দেনা,
এবার ঋণ-মুক্তির তুই নে মা ভার, রইবো তোরই কেনা।

আমি আমার আর নহি তো,
(আমি) তোর পায়ে যে নিবেদিত,
এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার-
দে ওদের বুঝায়ে॥

৬

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
রাখবি মায়ার ঘোরে।

মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে
ফেললি এমন করে॥
ও মা কতো জনম করেছি পাপ
কতো লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তোর নাই কি গো মাফ
ভুগব চিরতরে॥

এমনি করে সন্তানে তোর
ফেললি মা অকূলে,
তোর নাম যে জপমালা
তাও যাই হায় ভুলে।

পাছে মা তোর কাছে আসি
তাই বাঁধন দিলি রাশি রাশি,
কবে মুক্ত হবো মুক্তকেশী
(তোর) অভয় চরণ ধরে॥

৭

ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে
ও মা দে ফিরিয়ে মোর হারানিধি!
তুই দিয়ে নিধি নিলি কেড়ে
মা তোর এ কেমন নিঠুর বিধি॥
বল মা তারা কেমন করে
নয়ন-তারা নিলি হরে,
দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে
নিঠুর মরণ-সায়ক বিঁধি॥
তরু যেমন শিকড় দিয়ে তাহার মাটির মা' কে
জড়িয়ে ধরে থাকে স্নেহের সহস্র যে পাকে;
মা গো তেমনি করে তাহার মায়া
আঁকড়ে ছিলো আমার কায়া,
তারে নিলি কেন মহামায়া
শূন্য করে আমার হৃদি॥

৮

মোরে আঘাত যতো হানবি শ্যামা
ডাকব তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে॥

(ও মা) চারধারে মোর দুখের পাথার,
(তুই) পরখ কতো করবি মা আর,
(আমি) জানি তবু হবো মা পার
চরণ-তরী ধরে
(তোরই) চরণ-তরী ধরে॥

(আমি) ছাড়ব না তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে,
(আমায়) দুঃখ দিয়ে নাম ভুলাবি, নই মা তেমন ছেলে।

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
(তুই) স্মরণ করিস পলে পলে,
আমি সেই আনন্দে দুঃখের অসীম
সাগর যাব তরে॥

৯

এসো আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা
করো দীপান্বিতা আঁধার অবনী মা।
ব্যাপিয়া চরাচর শারদ অম্বর
ছড়াও অভভ্র হাসির লাবণি মা॥

সারাটি বরষ নিখিল ব্যথিত
চাহিয়া আছে মা তব আসা-পথ,
ধরার সন্তানে ধর তব কোলে
ভোলাও দুঃখ শোক চির করুণাময়ী মা॥

অটুট স্বাস্থ্য দীর্ঘ পরমায়ু
দাও আরো আলো নির্মল বায়ু,

দশ হাতে তব আনো মা কল্যাণ,
পীড়িত চিত্ত গাহে অকাল জাগরিণী মা॥

১০

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দে রে, শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর॥
(এলো মা, আমার মা॥)

মাকে ভুলে ছিলাম ওরে
কাজের মাঝে মায়ার ঘোরে,
আজ বরষ পরে মাকে ডাকার মিলল অবসর।
(এলো মা, আমার মা॥)

মা ছিলো না বলে সবাই গেছে পায়ে দ'লে
মার খেয়েছি যতো ততো ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে ছুটে রে তাই,
ভয় নাই রে আর ভয় নাই,
মা অভয়া এনেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এলো মা, আমার মা॥)

১১

কে বলে মোর মাকে কালো
মা যে আমার জ্যোতির্মতী।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
নিত্য করে যার আরতি॥

কালো রূপের মায়া দিয়ে
মহামায়া রয় লুকিয়ে,
মাকে আমার খুঁজে খুঁজে
নিবল কোটি রবির জ্যোতি॥

যোগীন্দ্র যাঁর চরণ-তলে
ধ্যান করে রে যাঁর মহিমা

(মোরা) দুটি নয়ন-প্রদীপ জ্বেলে
খুঁজি সেই অসীমার সীমা॥

মোরা সাজিয়ে কালি গৌরী মাকে
পূজা করি তমসাকে
মায়ের শুভ্রা রূপ দেখে সে
শুভ্র-শুচি যার ভকতি॥

১২

মা গো আমি তান্ত্রিক নই,
তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা।
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা
ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা॥

যাইনা আমি শশ্মান মশান
দিই না পায়ে জীব বলিদান,
খুঁজতে তোকে খুঁজি না মা
অমাবস্যা ঘোর ত্রিযামা॥

ঝিল্লি যেমন নিশীথ রাতে
একটানা সুর গায় অবিরাম,
তেমনি করে নিত্য আমি
জপি শ্যামা তোমারি নাম।

শিশু যেমন অনায়াসে
জননীরে ভালোবাসে,
তেমনি সহজ সাধনা মোর
তাতেই পাব তোর দেখা মা॥

১৩

মা গো তোমার অসীম মাধুরী
বিশ্বে পড়িছে ছড়ায়ে।

তোমার আঁখির স্নিগ্ধ লাবণি
ঝরিছে গগন গড়ায়ে॥

কুমুদে কমলে দিঘি সরোবরে
তোমার পূজাঞ্জলি থরে থরে
তব অপরূপ রূপ বিহরে
নিখিল প্রকৃতি জড়ায়ে॥

অরুণ-কিরণে হেরি মা তোমারি
মুখের অভয় হাসি,
নাচে আনন্দে নদী-তরঙ্গ
প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি।

আগমনী গায় সৃষ্টি অশেষ
ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ,
তোমারে পূজিতে পূজারিণী বেশ
ধরণীরে দিল পরায়ে॥

১৪

(তুই) মা হবি না মেয়ে হবি
দে মা উমা বলে।
তুই আমারে কোল দিবি না
আমিই নেবো কোলে॥

মা হয়ে তুই মা গো আমার
নিবি কি মোর সংসার-ভার,
দিন ফুরালে আসব ছুটে
মা তোর চরণ-তলে।
(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখ-জ্বালা তোর স্নেহ-অঞ্চলে॥

এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তি-শতদল,
আর এক হাতে ক্ষীর নবনী, কি নিবি তুই বল।

মেয়ে হয়ে মুক্ত-কেশে
(ওমা) খেলবি ঘরে হেসে হেসে,
ডাকলে মা তুই ছুটে এসে
জড়াবি মোর গলে।
(তোর) বক্ষে ধরে শিব-লোকে যাব আমি চলে।

১৫

মা গো, আজো বেঁচে আছি তোরই প্রসাদ পেয়ে।
তোর দয়ায় মা অন্নপূর্ণা তোরই অন্ন খেয়ে॥

কবে কখন খেলার ছলে
ডেকেছিলাম শ্যামা বলে,
সেই পুণ্যে ধন্য আমি
আজ তোর নাম গেয়ে॥
তোর নাম-গান বিনা আমার পুণ্য কিছু নাই,
পাপী হয়েও পাই আমি তাই যখন যাহা চাই॥

দুঃখে শোকে বিপদ-ঝড়ে
বাঁচাস মা তুই বক্ষে ধরে,
দয়াময়ী নাই কেহ মা
ভবানী তোর চেয়ে॥

১৬

দুর্গতিনাশিনী আমার
শ্যামা মায়ের চরণ ধর।
ঘোর বিপদ তরে যাবি
মাকে বারেক স্মরণ কর॥

তোর সংসার-ভাবনার ভার
সঁপে দে রে চরণে মা-র

যে চরণে বক্ষ পেতে
আছেন ভূমানন্দে মেতে
দেবাদিদেব দিগম্বর ॥

যে দিয়েছে এ সংসারের শিকল পায়ে বেঁধে,
সেই মহামায়ার শ্রীচরণে শরণ নে তুই কেঁদে।
কেটে যাবে সকল মায়া,
পাবি মায়ের চরণ-ছায়া,
শান্তি পাবি রোগে শোকে,
অন্তে যাবি মোক্ষ-লোকে
শিবানীরে বরণ কর ॥

১৭

যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে
সেই নাম তুই শিখিয়ে দে মা, ডাকব আমি তেমন করে ॥
বেদ-পুরাণে যে নাম শুনি,
যে নাম জপে ঋষি-মুনি,
সেই নাম দে, যে নাম নিতে
বক্ষ ভাসে অশ্রু-লোরে ॥

ভয় যদি তোর ভক্তি দিতে, কর মা অসুর দানব মোরে,
(তুই) আসবি যখন শাস্তি দিতে, দেখব তোরে নয়ন ভরে।
তোর হাতে মা মরণ হলে
ঠাঁই পাব যে তোরই কোলে ;
আঘাত করে ছেলেকে মা কাঁদে যেমন বক্ষে ধরে ॥

১৮

পরম পুরুষ সিদ্ধ-যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ॥
জাগালে ভারত-শ্মশান তীরে
অশিব-নাশিনী মহাকালীরে,

মাতৃনামের অমৃত নীরে
বাঁচালে মৃত ভারত আবার॥

সত্যযুগের পুণ্য স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থ বারি–কলস॥
মন্দিরে মসজিদে গির্জায়
পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নাম মাখা প্রেম–নিকেতনে
ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥

১৯

আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো
রাঙা জবার চেয়ে।
আমি সেই জবাতে ভবানি তোর
চরণ দিলাম ছেয়ে॥

মোর বেদনার বেদীর 'পরে
বিগ্রহ তোর রাখব ধরে,
পাষাণ–দেউল সাজে না তোর
আদরিণী মেয়ে॥

স্নেহ–পূজার ভোগ দেবো মা, অশ্রু পূজাঞ্জলি,
অনুরাগের থালায় দেবো ভক্তি কুসুম–কলি।

অনিমেষ আঁখির বাতি
রাখব জ্বেলে দিবারাতি,
(তোর) রূপ হবে মা আরো শ্যামা
আমার অশ্রুজলে নেয়ে।
(আমার) অশ্রুজলে নেয়ে॥

২০

মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী
মিষ্টি বেশি মেয়ের চেয়ে।

চঞ্চলা এই লীলাময়ী
মুক্তকেশী কালো মেয়ে॥
(সে মিষ্টি যতো দুষ্টু তত এই কালো মেয়ে
গিরিঝর্ণা-সম এলো ধেয়ে এই পার্বতী মেয়ে :
করুণা-অমৃত-ধারায় ভুবন ছেয়ে
এলো রে এই কালো মেয়ে॥)

মা-কে তবু চোখে চোখে রাখি
যদি কভু দেয় সে ফাঁকি
(আমি ভয়ে ভয়ে থাকি গো
এই মায়াময়ী মেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি গো
আমি বহু সাধ্য-সাধনাতে পেয়েছি এই মাকে রে
আমি কোটি জন্মের তপস্যাতে পেয়েছি এই মাকে রে।)
কোথায় রাখি আমি কাঙালিনী,
স্বর্গের এই রত্ন পেয়ে॥

২১

কেঁদো না কেঁদো না মাগো কে বলেছে কালো।
(মা) ঈষৎ হাসিতে তোর ত্রিভুবন আলো॥

কে দিয়েছে গালি তোরে, মন্দ সে মন্দ
কে যে বলেছে কালি তোরে, অন্ধ সে অন্ধ।
(মোর তারায় সে দেখে নাই।
তার নয়ন-তারায় নাই আলো, তাই
তারায় সে দেখে নাই।)
(রাখে) লুকিয়ে মা তোর নয়ন-কমল
কোটি আলোর সহস্র-দল,
(তোর) রূপ দেখে মা লজ্জায় শিব অঙ্গে ছাই মাখালো,
তোর নীল কপোলে কোটি তারা
চন্দনেরই ফোঁটার পারা
ঝিকিমিকি করে গো,
(যেন আলোর অলকা-তিলক ঝলমল করে গো)

মা তোর দেহ-লতায় অতুল কোটি রবি শশীর মুকুল
ফুটে আবার ঝরে গো।
তুমি হোমের শিখা বহ্নি-জ্যোতিঃ
তুমিই স্বাহা দীপ্তমতি,
আঁধার ভুবন-ভুবনে মা কল্যাণী দীপ জ্বালো
তুমিই কল্যাণ-দীপ জ্বালো॥

২২

তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হলি
পাষাণ ভালোবাসিস বলে।
মা গলবে কি তোর পাষাণ-হৃদয়
তপ্ত আমার নয়ন-জলে॥

তুই বইয়ে নদী পিতার চোখে
লুকিয়ে বেড়াস লোকে লোকে;
মহেশ্বরও পায় না তোকে
পড়ে মা তোর চরণ-তলে॥

কোটি ভক্ত যোগী ঋষি
ঠাঁই পেল না তোর চরণে।
তাই ব্যথায়-রাঙা তাদের হৃদয়
জবা হয়ে ফোটে বনে।
আমি শুনেছি মা ভক্তি-ভরে
মা বলে যে ডাকে তোরে,
(তুই) অমনি গলে অশ্রু-লোরে
ঠাঁই দিস তোর অভয় কোলে॥

২৩

মা গো, আমি মন্দমতি
তবু যে সন্তান তোরই।

(হায়) পুত্র বেড়ায় কাঙাল বেশে
মা যার ভুবনেশ্বরী॥

তুই যে এত হানিস হেলা
(তবু) তোরেই ডাকি সারা বেলা ;
মার খেয়ে মা'র শিশুর মত
মা গো তোকেই জড়িয়ে ধরি॥
মা হয়ে তুই কেমন করে
কোল থেকে তোর দিলি ফেলে,
(মা গো) কেন দিলি ধুলায় ফেলে ?
(আমি) মন্দ এতো হতাম না মা
মায়ের স্নেহ-সুধা পেলে।
(মা) তোর উপরে অভিমানে
দু-চোখ যায় যেদিক পানে
সেই দিকে তাই ধাই মা এখন
মরণ-বাঁচন ভয় না করি॥

২৪

শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা
(তোরে) যায় না পাওয়া কেঁদে।
(তাই) শাক্ত-সাধক রাখে তোরে
ভক্তি -ডোরে বেঁধে॥
(মা) শাক্ত বড় শক্ত ছেলে
(সে) জানে, দড়ি আলগা পেলে
যাবি পালিয়ে চোখে ধূলা দিয়ে
মায়া জালে বেঁধে।

(তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস্ ইন্দ্রত্বের মোহে,
(ওমা) গুণের কিছু ঘাট নাই তোর নির্গুণ তাই কহে
(তোরে) নির্গুণ তাই কহে॥
তোর মায়াতে ভুলে গিয়ে
বিষ্ণু ঘুমান লক্ষ্মী নিয়ে,
(তোর) অন্ত খুঁজে শিব হয়েছেন ভবঘুরে বেদে॥

২৫

মা গো আমি আর কি ভুলি।
চরণ যখন ধরেছি তোর
মা গো, আমি আর কি ভুলি।
(আমায়) বহু জনম ঘুরিয়েছিস মা
পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি॥
(তোর) পা ছেড়ে যে মোক্ষ যাচে
(তুই) বর নিয়ে যাস তাহার কাছে;
আমি যেন যুগে যুগে পাই মা প্রসাদ চরণ-ধূলি॥

(মোরে) শিশু পেয়ে খেলনা দিয়ে
রেখেছিলি মা ভুলিয়ে,
(এখন) খেলনা ফেলে কোলে নিতে
মাকে ডাকি দু'হাত তুলি'॥
তোর ঐশ্বর্য যা কিছু মা
সে ভক্তগণ বিলিয়ে উমা,
তোর ভিখারি এই সন্তানে দিস্
মাতৃনামের ভিক্ষা-ঝুলি॥

২৬

ও মা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে
তোর মত কেউ নাই।
তোর পায়ে মা তাই রক্তজবা
গায়ে শ্মশান ছাই।
দৈত্য-অসুর হনন-ছলে
ঠাঁই দিস তুই চরণ-তলে,
আমি তামসিকের দলে মা গো
তাই নিয়েছি ঠাঁই॥

কালো বলে গৌরী তোরে
কে দিয়েছে গালি,
(ও মা) ত্রিভুবনের পাপ নিয়ে তোর
অঙ্গ হল কালি।

অপরাধ না করলে শ্যামা
ক্ষমা যে তোর পেতাম না মা,
(আমি) পাপী বলে আশা রাখি
চরণ যদি পাই॥

২৭

আমায় যারা দেয় মা ব্যথা, আমায় যারা আঘাত করে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী।
আমায় যারা ভালোবাসে, বন্ধু বলে বক্ষে ধরে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥

আমায় অপমান করে যে
মা গো তোরই ইচ্ছা সে যে,
আমায় যারা যায় মা ত্যেজে,
যারা আমার আসে ঘরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥
আমার ক্ষতি করতে পারে অন্য লোকের সাধ্য কি মা,
দুঃখ যা পাই তোরই সে দান, মা গো সবই তোর মহিমা।
তাই পায়ে কেহ দলে যবে
হেসে সয়ে যাই নীরবে,
কে কারে দুখ দেয় মা কবে
তোর আদেশ না পেলে পরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥

২৮

করুণা তোর জানি মা গো
আসবে শুভদিন।
হোক না আমার চরম ক্ষতি
থাক না অভাব ঋণ॥

আমায় ব্যথা দেওয়ার ছলে
টানিস মা তোর অভয় কোলে,

সন্তানে মা দুঃখ দিয়ে
রয় কি উদাসীন॥

তোর কঠোরতার চেয়ে বেশি দয়া জানি বলে
ভয় যত মা দেখাস তত লুকাই তোরই কোলে।
সন্তানে ক্লেশ দিস যে এমন
হয়ত মা তার আছে কারণ,
তুই কাঁদাস বলে বলব কি মা
হলাম মাতৃহীন॥

২৯

আয় নেচে নেচে আয় এ বুকে
দুলালী মোর কালো মেয়ে।
দগ্ধ দিনের বুকে যেমন
আসে শীতল আঁধার ছেয়ে॥

আমার হৃদয়-আঙিনাতে
খেলবি মা তুই দিনে রাতে,
মোর সকল দেহ নয়ন হয়ে
দেখবে মা তাই চেয়ে চেয়ে॥

হাত ধরে মোর নিয়ে যাবি
তোর খেলাঘর দেখাবি মা,
এইটুকু তুই মেয়ে আমার
কেমন করে হস অসীমা।
নিবি লুটে চতুর্ভুজা
আমার স্নেহ প্রেম-পূজা,
নাম ধরে তোর ডাকব মা যেই
যেথায় থাকিস আসবি ধেয়ে॥

৩০

আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ
আজও মুক্ত নহি।

আজও অন্যে আঘাত দিয়ে
কঠোর ভাষা কহি॥

মোর আচরণ, আমার কথা
আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা,
আজও আমার দাহন দিয়ে
শতজনে দহি॥

শত্রু–মিত্র মন্দ–ভালোর যায়নি আজও ভেদ,
কেহ ব্যথা দিলে, প্রাণে আজও জাগে খেদ।
আজও মাগো দুঃখশোকে
অশ্রু ঝরে আমার চোখে
আমার আমার ভাব মা আজও
জাগে রহি রহি॥

৩১

কোথায় গেলি মা গো আমার
খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে।
ক্লান্ত আমি খেলে খেলে
এ সংসারের ধূলি মেখে॥

বলেছিলি সন্ধ্যা হলে
ধূলি মুছে নিবি কোলে,
(ও মা) ছেলেরে তুই গেলি ছলে–
(এখন) পাই না সাড়া ডেকে ডেকে॥
একি খেলার পুতুল মা গো
দিয়েছিলি মন ভুলাতে,
আধেক তাহার হারিয়ে গেছে
আধেক ভেঙে আছে হাতে।

এ পুতুলও লাগছে মা ভার,
তোর পুতুল তুই নে মা এবার
(এখন) সন্ধ্যা হল, নামল আঁধার,
ঘুম পাড়া মা আঁচল ঢেকে॥

৩২

মা কবে তোরে পারব দিতে
আমার সকল ভার।
ভাবতে কখন পারব মা গো
নাই কিছু আমার॥
(কারেও) আনিনি মা সঙ্গে করে,
রাখতে নারি ক্যারেও ধরে
তুই দিস, তুই নিস মা হরে-
কোথায় অধিকার
আমার কোথায় অধিকার॥
হাসি, খেলি, চলি, ফিরি ইঙ্গিতে মা তোরই,
তোর মাঝে মা জনম লভি, তোরই মাঝে মরি।

পুত্র মিত্র কন্যা জায়া
মহামায়া তোর এ মায়া,
মা তোর লীলার পুতুল আমি
ভাবতে দে এবার॥

৩৩

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।
(তোর) মায়ার জালে মহামায়া
বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে॥
পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে,
তোর মায়াজাল তত বাঁধে
পালাতে চায় যত ধেয়ে॥

চতুর যে মীন সে জানে মা,
জাল থেকে কি মুক্তি আছে?
(তাই) জেলে যখন জাল ফেলে, সে
লুকায় জেলের পায়ের কাছে।
ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে।

তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ,
(আমি) এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোর অভয় চরণ পেয়ে॥

৩৪

কালী কালী মন্ত্র জপি
বসে শোকের ঘোর শ্মশানে।
মা অভয়ার নামের গুণে
শান্তি যদি পাই এ প্রাণে।

এই শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে
যে ছিল মোর বুকের কাছে,
সে হয়ত আবার উঠবে জেগে
মা ভবানীর নাম-গানে॥

সকল সুখ শান্তি আমার
হরে নিল যে পাষাণী,
শূন্য বুকে বন্দী করে
রাখব আমি তারেই আনি।

মোর, যাহা প্রিয় মাকে দিয়ে
জাগি আশার দীপ জ্বালিয়ে,
মার সেই চরণের নিলাম শরণ
যে চরণে মা আঘাত হানে॥

৩৫

আদরিণী মোর কালো মেয়েরে
কেমনে কোথায় রাখি।
(তোর) রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে
(তারে) বুকে রাখিলে দুখে ঝুরে আঁখি॥

কাঙাল যেমন পাইলে রতন
লুকাতে ঠাঁই নাহি পায়।
তেমনি আমার শ্যামা মেয়েরে
জানি না রাখিব কোথায়।

দুরন্ত মোর এই মেয়েরে
বাঁধিব আমি কি দিয়ে রে,
(তাই) পালিয়ে যেতে চায় সে যবে
অমনি মা বলে ডাকি॥

৩৬

শ্যামা তোর নাম যার জপমালা
তার কি মা ভয় ভাবনা আছে॥
দুঃখ অভাব রোগ শোক জরা
লুটায় তাহার পায়ের কাছে॥
যার চিত্ত নিবেদিত তোর চরণে
ও মা কি ভয় তাহার জীবনে মরণে,
যেমন খেলে শিশু মায়ের সনে
তোর অভয় কোলে সে তেমনি নাচে॥
রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম
সকল বিপদ তারে করে প্রণাম।

সদা প্রসন্ন মন তার ধ্যানে মা তোর,
ভূমানন্দে মা গো রহে সে বিভোর;
(তার) নিকটে আসিতে নারে কাল কঠোর
তব নাম প্রসাদ যে লভিয়াছে॥

৩৭

আমি নামের নেশায় শিশুর মত
ডাকি গো মা বলে।
নাই দিলি তুই সাড়া মা গো
নাই নিলি তুই কোলে॥

শুনলে 'মা' নাম জেগে উঠি,
ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটি,

ঐ নামে মোর নয়ন দুটি
ভরে উঠে জলে॥
ও নাম আমার মুখের বুলি, ও নাম খেলার সাথি,
ও নাম বুকে জড়িয়ে ধরে পোহায় দুখের রাতি।
মা-হারানো শিশুর মত
জানি ও-নাম অবিরত,
ঐ নামের মন্ত্র আমার বুকে
কবচ হয়ে দোলে॥

৩৮

(ও মা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
শরণ নিলাম সেই চরণে।
জীবন আমার ধন্য হল,
ভয় নাই মা আর মরণে॥
যা ছিল মা মোর ত্রিলোকে
তোকে দিলাম ,দিলাম তোকে,
আমার বলে রইল শুধু
তোর চরণের ধ্যান এ মনে॥

(তোর) কেশ নাকি মা মুক্ত হল
ছুঁয়ে তোর ঐ রাঙা চরণ,
(ও মা) মুক্তকেশি, মুক্ত হব
ঐ চরণে নিয়ে শরণ।
(তোর) চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে
বিশ্বজনে বলব ডেকে,
দেখে যা কোন রত্ন রাজে
এই হৃদয়-সিংহাসনে॥

৩৯

রক্ষা-কালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে।
মায়ের পায়ের ফুল কুড়িয়ে বেঁধেছি মোর শিরে॥

মার চরণামৃত খেয়ে
অমৃতে প্রাণ আছে ছেয়ে,
দুঃখ –অভাব ভাবনার ভার
দিয়েছি মা ভবানীরে॥
তারা নামের নামাবলি জড়িয়ে আমার বুকে
মায়ের কোলের শিশুর মত ঘুমাই পরম সুখে।

মা–র ভক্তের চরণ–ধূলি
নিয়েছি মোর বক্ষে তুলি,
(মায়ের) পূজার প্রসাদ পেতে আমি
আসি ফিরে ফিরে॥

৪০

(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা,
আমি তোরেই চাই।
স্বর্গ আমি চাই না মা গো
কোল যদি তোর পাই॥
মা কী হবে সে মুক্তি নিয়ে
কী হবে সে স্বর্গে গিয়ে,
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার
আর প্রয়োজন নাই॥

যুগে যুগে যে লোকে মা প্রকাশ হবে তোর,
আমি পুত্র হয়ে দেখব লীলা, এই বাসনা মোর।

তুই মাখাস যদি মাখব ধূলি,
শুধু তোকে যেন নাহি ভুলি,
তুই মুছিয়ে ধূলি নিবি তুলি,
বক্ষে দিবি ঠাঁই॥

৪১

(মায়ের) অসীম রূপ–সিন্ধুতে রে
বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে,

কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
অনন্ত এই বিশ্ব জুড়ে॥

যোগীন্দ্র শিব পায়ের তলায়
ধ্যান করে রে সেই অসীমায়,
কোটি ব্রহ্মা মহিমা গায়
প্রণব ওঙ্কারের সুরে॥

কোটি গ্রহের নিবল জ্যোতি মহাকালীর সীমা খুঁজে,
সৃষ্টি-প্রলয় বলয় হয়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।
মায়ের একটি আঁখির চাওয়ায়
যুগ-যুগান্ত হারিয়ে যায়,
মায়ের রূপের ঈষৎ আভাস পেয়ে
সাগর দুলে, তিমির ঝুরে॥

৪২

(আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়
কে দেবে তায় ধরে।
(তারে) যেই ধরেছি মনে করি
অমনি সে যায় সরে॥

বনের ফাঁকে দেখা দিয়ে
চঞ্চলা মোর যায় পালিয়ে,
(দেখি) ফুল হয়ে মা-র নূপুরগুলি
পথে আছে ঝরে।
তার কণ্ঠহারের মুক্তাগুলি আকাশ-আঙিনাতে
তারা হয়ে ছড়িয়ে আছে, দেখি আধেক রাতে।
কোন মায়াতে মহামায়ায়
রাখব বেঁধে আমার হিয়ায়
কাঁদলে যদি হয় দয়া তার
তাই কাঁদি প্রাণভরে॥

৪৩

আঁধার-ভীত এ চিত যাচে মা গো আলো আলো।
বিশ্ববিধাত্রী আলোকদাত্রী

নিরাশ পরানে আশার সবিতা জ্বালো
জ্বালো আলো আলো॥

হারিয়েছি পথ গভীর তিমিরে,
লহ হাতে ধরে প্রভাতের তীরে,
পাপ তাপ মুছি কর মা গো শুচি
আশিসে অমৃত ঢালো॥
দশ প্রহরণধারিণী দুর্গতিহারিণীর দুর্গে
মা অগতির গতি
সিদ্ধিবিধায়িনী দনুজদলনী
বাহুতে দাও মা শকতি।

তন্দ্রা ভুলিয়া যেন মোরা জাগি
এবার প্রবল মৃত্যুর লাগি
রুদ্র-দাহনে ক্ষুদ্রতা দহ
বিনাশো গ্লানির কালো॥

৪৪

মা তোর চরণ-কমল ঘিরে
চিত্ত-ভ্রমর বেড়ায় ঘুরে।
(ও মা) সাধ মেটে না দেখে দেখে
(যত) দেখি, তত নয়ন ঝুরে॥
(ঐ) চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে
চরণ-পরাগ-ধূলি মেখে
গ্রহ-তারায় লোকে লোকে
(তোর) নাম গেয়ে যাই সুরে সুরে॥
তোর চরণের ধূলি নিয়ে ললাটে মোর তিলক আঁকি
ঐ চরণের পানে চেয়ে ধ্রুবতারা হল আঁখি।

তোর চরণের মধু যদি
পাই মা আমি নিরবধি
আমি লক্ষ কোটি জনম নিয়ে
বেড়াব ত্রিভুবন জুড়ে॥

৪৫

আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী।
নেচে নেচে আয় বুকে আয় দিয়ে তাথৈ তাথৈ করতালি॥
দশদিক আলো করে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর পরে
দুরন্ত রূপ ধরে
আয় মায়ার সংসারে আগুন জ্বালি॥

আমার স্নেহের রাঙা জবা পায়ে দলে
কালো রূপ তরঙ্গ তুলে গগন-তলে
সিন্ধু জলে আমার কোলে
আয় মা আয়।
তোর চপলতায় মা কবে
শান্ত ভবন প্রাণ-চঞ্চল হবে,
এলোকেশে এনে ঝড়
মায়ার এ খেলাঘর
ভেঙ্গে দে মা আনন্দ-দুলালী॥

৪৬
(কৌশী তেতালা)

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ
চিতার আগুন-ঢেকে স্নেহ-আঁচলে॥
সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখ-কৈলাস
বরাভয়-রূপে মা শ্মশানে করেন বাস;
কি ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণ-তলে॥

জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার-জ্বালায়-
তাহারে ডাকিছে মা, 'কোলে আয় কোলে আয়!'

জীবনে শান্ত ওরে
ঘুম পাড়াইতে তোরে
কোলে তুলে নেয় মা মরণেরি ছলে॥

৪৭

আয় অশুচি আয় রে পতিত,
এবার মায়ের পূজা হবে।
(যেথা) সকল জাতির সকল মানুষ
নির্ভয়ে মা–র চরণ ছোঁবে।
(সেথা) এবার মায়ের পূজা হবে॥

(সেথা) নাই মন্দির নাই পূজারী,
নাই শাস্ত্র নাই রে দ্বারী,
(যেথা) মা বলে যে ডাক্‌বে এসে
মা তাহারেই কোলে লবে॥

(মা) সিংহ–আসন হতে নেমে বসেছে দেখ ধূলির তলে,
(মা–র) মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে সবার ছোঁয়া তীর্থ–জলে।

মোরা, জননীকে দেখেনি, তাই
ভাইকে আঘাত হেনেছে ভাই,
(আজ) মাকে দেখে বুঝবি মোরা
এক মা–র সন্তান সবে।
(এবার) ত্রিলোক জুড়ে পড়বে সাড়া
মাতৃ–মন্ত্রের মাভৈঃ–রবে॥

৪৮

দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যেথা থাকে
ভিখারিনী বেশে সেথা দেখেছি মোর মাকে
(মোর) অন্নপূর্ণা মাকে॥

অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে মাকে খুঁজি,
(মা) ফেরেন ধূলির পথে যখন ঘটা করে পুজি,
ঘুরে ঘুরে দূর আকাশে
প্রণাম আমার ফিরে আসে
যথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে॥
সেথা দেখেছি মোর মাকে
মোর অন্নপূর্ণা মাকে
নামতে নারি তাদের কাছে সবার নীচে যারা
যাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।
অপমানের পাতাল-তলে লুকিয়ে যারা আছে
তোর শ্রীচরণ রাজে সেথায়, নে মা তাদের কাছে
আমায় নে মা তাদের কাছে।
আনন্দময় তোর ভবনে
আনব কবে বিশ্বজনে
আমি দেখব জ্যোতির্ময়ী রূপে সেদিন তমসাকে॥

৪৯

(মা) একলা ঘরে ডাকব না আর
দুয়ার বন্ধ করে।
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকব মা সেই ঘরে॥
রুদ্ধ আমার একলা এ মন্দিরে
পথ না পেয়ে যাস বুঝি মা ফিরে
(ঘরে) জ্যোতির্লোকে ঘুম পাড়িয়ে
তাপিত সন্তান নিয়ে
কাঁদিস মা তুই বুকে ধরে॥
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকব মা সেই ঘরে॥
(আমি) একলা মানুষ হতে গিয়ে হারাই মা তোর স্নেহ,
(আমি) যে ঘর যেতে ঘৃণা করি, মা! সেই তোর গেহ।
দুর্বল মোর ভাই বোনদের তুলে
দাঁড়াব মা সেদিন চরণমূলে,
কোলে তুলে নিবি হেসে
(আর) হারাব না তোরে॥

৫০

(তুই) বলহীনের বোঝা বহিস যেথায় ভৃত্য হয়ে
যথা দাসী হয়ে করিস সেবা, যা মা সেথায় লয়ে
(মোরে) যা মা সেথায় লয়ে॥
(যথা) রুগ্ন ছেলে বক্ষে ধরে
নিশীথ জাগিস একলা ঘরে
(যথা) দুঃখী পিতার সাথে কাঁদিস উপবাসী রয়ে।
(মোরে) যা মা সেথায় লয়ে॥
শ্রমিক, চাষার তরে যথা আঁধার খাদে মাঠে
ক্ষুধার অন্ন নিস মা বয়ে, নে মা তাদের হাটে
(মোরে) নে মা তাদের হাটে॥
তুই ত্রিজগতের পাপ কুড়ালি
(তাই) সোনার অঙ্গ হল কালি
তোরে সেই কালোতে পাব মহাকালীর পরিচয়ে॥

৫১

কেন আমায় আনলি মা গো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে
(মোর) ক্ষুদ্র ঘটে এ সিন্ধুজল কেমন করে নেবো তুলে॥
চতুর্বেদে এই সিন্ধুর জল
ক্ষুদ্র বারিবিন্দু হয়ে করছে টলমল
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ তারা গগন-মূলে।
ইহারই বেগ ধরতে শিরে, শিবের জটা পড়ে খুলে॥

অনন্তকাল রবি শশী এই সে মহাসাগর হতে
সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগতে॥
বাঁশিতে মোর স্বল্প এ আধারে
অনন্ত সে বাণীর ধারা ধরতে কি মা পারে,
শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্রও তোর চরণ ছুঁলে॥

৫২

ভাগীরথীর ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে
মা গো এবার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের পরে॥

যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময়, পড়ুক আলো,
সকল জীব শিব হোক মা,সেই সুধাতে সিনান করে॥
তোর শক্তি-প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা,
দিব্যি জ্যোতির্দেহে পাবে,দানব-অসুর ভয় রবে না।

এই পৃথিবী ব্যথাহত
শ্বেত শতদলের মত
মা তোর পূজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে সেই সাগরে॥

৫৩

মা গো তোরি পায়ের নূপুর বাজে
এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে॥

জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে
সাগর রোলে নদীর কলতানে
সমীরণের মরমরে শুনি সকাল সাঁঝে।
মা গো তোরি পায়ের নূপুর বাজে॥

আমার প্রতি নিঃশ্বাসে মা রক্তধারার মাঝে
প্রাণের অনুরণনে তোর চরণ-ধ্বনি বাজে।

গভীর প্রণব ওঙ্কারে তোর কালী
(মা গো মহাকালী)
তাথৈ নাচের শুনি করতালি
সেই নৃত্যলীলার স্তবগাথা গান
চরণতলে নটরাজে॥

৫৪

জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়
ত্রিভুবনবাসী ছেলেমেয়ে আয় রে ছুটে আয়॥
আনন্দ আজ লুট হতেছে কে কুড়াবি আয়
আনন্দিনী দশভূজা দশ হাতে ছড়ায়।

মা অভয় দিতে এল 'ভয়ের অসুর' দলে পায়॥
আজ নিনব জগৎ মাভৈঃ বাণীর বিপুল ভরসায়॥
বুকের মাঝে টইটুম্বুর ভরা নদীর জল
ওতে দুলছে টলমল,
ঝিলের জলে ফুটল কত রঙের শতদল
ছুঁতে মায়ের পদতল।
দেব-সেনারা বাচ খেলে রে আকাশ-গাঙের স্রোতে,
সেই আনন্দে যোগ দিবে কে, আয় রে বাহির-পথে।
আর যেতে দেবো না মাকে রাখব ধরে পায়-
মাতৃহারা মা পেলে কি ছাড়তে কভু চায়॥

৫৫

তোর কালো রূপ দেখতে মা গো
কাল হল মোর আঁখি
চোখের ফাঁকে যাস পালিয়ে
মা তুই কালো পাখি॥
আমার নয়ন-দুয়ার বন্ধ করে এই দেহ-পিঞ্জরে
চঞ্চলা গো বুকের মাঝে রাখি তোরে ধরে,
চোখ চেয়ে তাই খুঁজি তোরে পাইনে ভুবন ভরে,-
সাধ যায় মা জন্ম জন্ম অন্ধ হয়ে থাকি॥
তোর কালো রূপের বিজলি-চমক কোটি লোকের জ্যোতি,
অনন্ত তোর কালোতে মা সকল আলোর গতি।
তোর কালো রূপ কে বলে মা 'তমঃ',
ঐরূপে তুই মহাকালী মা গো নমো নমঃ

তুই আলোর আড়াল টেনে মা গো
দিসনে মোরে ফাঁকি॥

৫৬

বল মা শ্যামা বল, তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে,
(আমি) যত দেখি তত কাঁদি ঐরূপ দেখি মা সকল খানে॥

মাতৃহারা শিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে
চোখ ফিরাতে না রে মা গো, কাঁদে বুকে রেখে,
তোর মূর্তি মোরে তেমনি করে টানে মা গো মরণ-টানে॥

ওমা রাত্রে নিতুই ঘুমের ঘোরে দেখি বুকের কাছে
যেন প্রতিমা তোর মায়ের মত জড়িয়ে মোরে আছে।
জেগে উঠে আঁধার ঘরে
কাঁদি যবে মা তোরই তরে,
দেখি প্রতিমা তোর কাঁদছে যেন চেয়ে চেয়ে আমার পানে॥

৫৭

মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিব ঘরে,
শূন্য ভুবন শূন্য ভবন কাঁদে হাহাকার করে॥

মা যে নদীর ঢেউ-এর মত,
পালিয়ে বেড়ায় অবিরত,
হৃদয়-ঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় সরে॥

বিসর্জনের প্রতিমা এ নয়
(এরে) নিত্য কাছে রাখতে সাধ হয়
পাষাণ দেউল ঘিরে রে ভাই বেঁধে ভক্তি-ডোরে॥

সেই মাকে মোর ভাসিয়ে নদীর জলে
মাতৃহারা শিশুর মত কাঁদি 'মা মা' বলে।
তেমনি সুদিন আসবে কবে
(মার) নিত্য আগমনী হবে
বিশ্ব-চরাচরে॥

৫৮

কে সাজালো মাকে আমার
বিসর্জনের বিদায়-সাজে।

আজ সারাদিন কেন এমন
করুণ সুরে বাঁশি বাজে॥
আনন্দেরি প্রতিমাকে, হায়।
বিদায় দিতে পরান নাহি চায় ;
মাকে ভাসিয়ে জলে কেমন করে
রইব আঁধার ভবন মাঝে॥
মার আগমনে বেজেছিল
প্রাণে নতুন আশার বাঁশি,
দুখ-শোক-ভয় ভুলেছিলাম
দেখে মা অভয়ার মুখের হাসি॥
মা দশ হাতে আনন্দ এনেছিল,
বিশ হাতে আজ দুঃখ ব্যথা দিল ;
মা মৃন্ময়ীকে ভাসিয়ে জলে
পাব চিন্ময়ীকে বুকের মাঝে॥

৫৯

(আমার) আনন্দিনী উমা আজো
এল না তার মায়ের কাছে।
হে গিরিরাজ দেখে এস
কৈলাসে মা কেমন আছে॥
মোর মা যে প্রতি আশ্বিন মাসে
মা মা বলে ছুটে আসে ;
মা আসেনি বলে আজও
ফুল ফোটেনি লতায় গাছে॥
তত্ত্ব-তালাস নিইনি মায়ের
তাই বুঝি মা অভিমানে
না এসে তার মায়ের কোলে
ফিরিছে শ্মশানে মশানে।
ক্ষীর নবনী লয়ে থালায়
কেঁদে ডাকি, 'আয় উমা আয়'!
যে কন্যারে চায় ত্রিভুবন
তাকে ছেড়ে মা কি বাঁচে॥

৬০

আমার উমা কই, গিরিরাজ!
কোথায় আমার নন্দিনী।
এ যে দেবী দশভুজা
এ কোন রণ-রঙ্গিণী॥

মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে,
এ কোন দেবী মূর্তি নিয়ে এলে।
এ যে মহীয়সী মহামায়া বামা মহিষ-মর্দিনী॥
মোর মধুর স্নেহে জ্বালতে আগুন
আনলে কারে ভুল করে,
এরে কোলে নিতে হয় না সাহস,
ডাকতে নারি নাম ধরে।
কে এলি মা দনুজ-দলনী বেশে,
কন্যারূপে মা বলে ডাক হেসে হেসে,
তুই চিরকাল যে দুলালী মোর
মাতৃস্নেহে বন্দিনী॥

৬১

সংসারেরই দোলনাতে মা
ঘুম পাড়িয়ে কোথায় গেলি?
আমি অসহায় শিশুর মত
ডাকি মা দুই বাহু মেলি॥

মোর অন্য শক্তি নাই মা তারা
'মা' বুলি আর কান্না ছাড়া,
তোরে না দেখলে কেঁদে উঠি
(তোর) কোল পেলে মা হাসি খেলি।
(ও মা) ছেলেরে তোর তাড়ন করে
মায়ারূপী সৎমা এসে
আবার ছয় রিপুতে দেখায় মা ভয়
পাপ এল পুতনার বেশে।

মরি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে মা,
শ্যামা আমায় কোলে নে মা
আমি ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি
দয়াময়ী মা কি এলি॥

৬২

আয় বিজয়া আয় রে জয়া
উমার লীলা যা রে দেখে।
সেজেছে সে মহাকালী
চোখের কাজল মুখে মেখে॥
সে ঘুমিয়েছিল আমার কোলে
জেগে উঠে কেঁদে বলে :
আমায় কালী সাজিয়ে দে মা
ছেলেরা মোর কাঁদছে ডেকে॥
চেয়ে দেখি মোর উমা নাই নাচে কালী দিগম্বরী ;
হুঙ্কার দেয় কোটি গ্রহের মুণ্ডমালা গলায় পরি।

আমি শুধু উমায় চিনি,
এ কোন মহা মায়াবিনী,
কালো-রূপে বিশ্বভুবন
আকাশ পবন দিল ঢেকে।

৬৩

সর্বনাশী ! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই ?
শ্মশান ছাড়া খেলবার তোর জায়গা কি আর নাই॥
মুক্তকেশী, কেশ এলিয়ে
বেড়াস কখন কোথায় গিয়ে,
এক নিমেষও তোকে নিয়ে শান্তি নাহি পাই॥
হাড়-জ্বালানী মেয়ে ! হাড়ের মালা কোথায় পেলি ?
ভুবন-মোহন গৌরী-রূপে কালি মেখে এলি।
তোর গায়ের কালি চোখের জলে
ধুইয়ে দেবো, আয় মা কোলে।
তোরে বুকে ধরেও মরি জ্বলে, দিই মা গালি তাই॥

৬৪

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে,
কে দিয়েছে গালি
(তোরে) কে দিয়েছে গালি।
রাগ করে সে সারা গায়ে
মেখেছে তাই কালি॥
যখন রাগ করে মোর অভিমানী মেয়ে
আরো মধুর লাগে তাহার হাসি মুখের চেয়ে।
কে কালো দেউল করল আলো
অনুরাগের প্রদীপ জ্বালি॥
পরেনি সে বসন-ভূষণ, বাঁধেনি সে কেশ,
তারি কাছে হার মানে রে ভুবন-মোহন বেশ।
রাগিয়ে তারে কাঁদি যখন দুখে,
দয়াময়ী মেয়ে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে ;
(আমার) রাগী মেয়ে, তাই তারে দিই
জবা ফুলের ডালি॥

৬৫

শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম।
মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু
ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম॥
ডুবে শ্যাম-যমুনাতে
খেলব খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোর হানবে হেলা
মা পুরাবেন মনস্কাম॥
আমার মনের দো-তারাতে
শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার,
সেই দো-তারায় ঝঙ্কার দেয়
ওঙ্কার রব অনিবার॥

মহামায়ার মায়ার ডোরে
আনবে বেঁধে শ্যাম কিশোরে,

কৈলাসে তাই মাকে ডাকি
দেখব সেথায় ব্রজধাম॥

৬৬

ও মা ত্রিনয়নী ! সেই চোখ দে
যে চোখ তোরে দেখতে পায়।
সে নয়ন-তারায় কাজ কি তারা
যে তারা লুকায় মা তারায়॥
আমি চাইনে সে চোখ যে চোখ দেখে মায়া,
অনিত্য এই সংসারেরই ছায়া,
যে দৃষ্টি দেখে নিত্য তোরে
সেই দৃষ্টি দে আমায়॥
ও মা নিভিয়ে দে এ নয়ন-প্রদীপ
দেখায় যাহা দুঃখ-শোক,
এই আলেয়া পথ ভুলিয়ে
যায় মা নিয়ে নরক-লোকে।
তোর সৃষ্টি চির-আনন্দময় না কি !
দেখব সে লোক, দে মোরে সেই আঁখি ;
দেখে না রোগ-মৃত্যু-জরা যা
তোর সন্তান সেই দৃষ্টি চায়॥

৬৭

মা ! আমি তোর অন্ধ ছেলে,
হাত ধরে মোর নিয়ে যা মা !
পথ নাহি পাই, যে দিকে যাই
দেখি আঁধার ঘোর ত্রিযামা॥
আমি নিজে পথ চলিতে চাই
বারে বারে পথ ভুলি মা তাই,
মায়া রূপে পড়ে কাঁদি
কোথায় দয়াময়ী শ্যামা॥

মা তুই যবে হাত ধরে চলিস, রয় না পতন-ভয়,
তুই যবে পথ দেখাস মা গো, সে পথ জ্যোতির্ময়।

কী হবে জ্ঞান-প্রদীপ নিয়ে সাথে,
বৃথা এ দীপ জন্মান্ধের হাতে
মা তুই যদি হস নির্ভর মোর
পথের ভয় আর রবে না মা॥

৬৮

আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে
কেবলি সে লুকাতে চায়।
আলো আঁধার পর্দা টেনে
(ভিরু) বালিকা সে পালিয়ে বেড়ায়॥
নিখিল ভুবন আছে তারে ঘিরে,
আমার মেয়ে তবু বসন খুঁজে ফিরে;
তারে দেখে সে এক নিমেষে
তারি মাঝে লয় হয়ে যায়॥
কোটি শিব ব্রহ্মা হরি অনন্তকাল গভীর ধ্যানে
তার সে লুকোচুরি খেলার পায় না দিশা, পায় না মানে।

রবি-শশী গ্রহ-তারার ফাঁকে
যে দেখেছে পালিয়ে যেতে মাকে;
সে আপনাকে আর পায় না খুঁজে
মায়াবিনীর মহামায়ায়॥

৬৯

আমার মা আছে রে সকল নামে,
মা যে আমার সর্বনাম।
যে নামে ডাক শ্যামা মাকে
পুরবে তাতেই মনস্কাম॥
ভালোবেসে আমার শ্যামা মাকে
যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে,

সেই নামে মা দেয় রে ধরা
কেউ শ্যামা কয়, কেহ শ্যাম।
এক সাগরে মিশে গিয়ে
সকল নামের নদী
সেই হরিহর কৃষ্ণ ও রাম,
দেখিস তাঁকে যদি,
নিরাকারা সাকারা সে কভু,
সকল জাতির উপাস্য সে প্রভু,
নয় সে নারী নয় সে পুরুষ,
সর্বলোক তাঁহার ধাম॥
মা যে আমার সর্বনাম॥

৭০

ও মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
আমি কেন অন্ধ মা গো–
দেখি শুধু কালো॥
সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি,
ও মা আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি?
ও মা ছেলে কেন মন্দ হলো, জননী যার ভালো?
তুই নিত্য মহাপ্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি,
চির-শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা-ঝুলি?
বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধুজলে রয়ে,
তোর চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে
মোর জীবন্মৃত এই দেহে মা চিতার আগুন জ্বালো॥

৭১

ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস
আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া।
তোর কৃপা বিনা শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তিধারা॥

ওমা তুই আশ্রয় দিলি না তাই
আমি যা পাই তা পথে হারাই
তোর রসময় ভুবন আমার শ্মশান হল, ও মা তারা ॥
আজ আনন্দ -যমুনা ফেলে এসেছি তাই যমের দ্বারে,
ও মা জীবনে যা পেলাম না তা মরণ যদি দিতে পারে।
ও মা তত বাড়ে বুকের জ্বালা
পাই যত যশ খ্যাতির মালা,
রাজ-প্রাসাদে শুয়ে, মাগো শান্তি কি পায় মাতৃহারা ॥

৭২

আমার মানস-বনে ফুটেছে রে শ্যামা-লতার মঞ্জরী।
সেই মঞ্জুবনে ফিরছে রে তাই ভক্তি-ভ্রমর গুঞ্জরি ॥

সেথা আনন্দে দেয় করতালি
প্রেমের কিশোর বনমালী
সেই লতামূলে শিবের জটায় গঙ্গা ঝরে ঝর্ঝরি ॥

কোটি তরু শাখা মেলি এই সে লতার স্পর্শ চায়,
শিরে ধরে ধন্য হতে এই শ্যামারই শ্যাম-শোভায়।
এই সে লতার স্পর্শ চায় ॥

এই লতারই ফুল সুবাসে
কোটি চন্দ্র সূর্য আসে
নীল আকাশে
এই লতার ছায়ায় প্রাণ জুড়াতে ত্রিলোক আছে প্রাণ ধরি ॥

৭৩

শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ-ধূপকাঠিতে
যত জ্বলি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে ॥
ভক্তি আমার ধূপের মতো
উর্ধ্বে ওঠে অবিরত,
শিবলোকের দেব-দেউলে মা-র শ্রীচরণ পরশিতে ॥

ওগো অন্তর-লোক শুদ্ধ হল পবিত্র সেই ধূপ-সুবাসে,
মা-র হাসিমুখ চিত্তে ভাসে চন্দ্রসম নীল আকাশে।
সব কিছু মোর পুড়ে কবে
চিরতরে ভস্ম হবে,
মা-র ললাটে আঁকব তিল; সেই ভস্ম-বিভূতিতে॥

৭৪

ও মা খড়গ নিয়ে মাতিস রণে,
নয়ন দিয়ে বহে ধারা।
(এমন) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা তোরই সাজে তারা॥

করে অসুর মুণ্ডরাশি
অধরে না ধরে হাসি
(তুই) জানিস মরলে তোর আঘাতে তোরই কোলে যাবে তারা।

(মা) দুই হাতে তোর বর ও অভয়
আর দু-হাতে মুণ্ড অসি,
ললাটে তোর পূর্ণিমা চাঁদ
কেশে কৃষ্ণা চতুর্দশী।

(তুই) জননী-প্রায় আঘাত করে,
দিস মা দোলা বক্ষে ধরে,
(তুই) পাপ-মুক্ত করার ছলে অসুর বধিস ভব-দারা॥

৭৫

আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা, দেহ বিল্বদল।
মুক্তি পাবো ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল॥
মোর বলির পশু হবে সর্বকাম,
মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম,
মোর অশ্রু দেবো মা-র চরণে, সেই তো গঙ্গাজল॥

মোর আনন্দ মাকে দেবো তাই হবে চন্দন,
মোর পুষ্পাঞ্জলি হবে আমার প্রাণ মন।

মোর জীবন হবে আরতি-দীপ,
মোর গুরু হবেন শঙ্কর শিব,
মোর কাঁটার জ্বালা পদ্ম হবে শুভ্র সুনির্মল॥

৭৬

যে কালীর চরণ পায় রে
কালীর চরণ পায়
সে মোক্ষ মুক্তি কিছুই নাহি চায়॥

সে চায় না স্বর্গ, চায় না ভগবান,
শ্রীকালীর চরণ আত্মা তাহার, দেহ-মন ও প্রাণ ;
সে কালীর চরণ ছেড়ে ব্রহ্মলোকেও নাহি যায়॥
শিবের জটার গঙ্গা নিত্য চরণ ধোয়ায় যাঁর
যোগ-সাধনা আরাধনা সে জানে না তাই
ঐ চরণ তাহার সার॥
ধর্মাধর্ম ভেদ জানে না, সে বলে সবাই মায়ের ছেলে,
বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরে চাঁড়াল কাছে এলে ;
সে বেদ-বেদান্ত জানে না শ্রীকালীর নাম গায়॥

৭৭

তোর নামেরই কবচ দোলে
দোলে আমার বুকে, হে শঙ্করী !
কি ভয় দেখাস আমি তোকেও
ভয় করি না, ভয় করিনা ভয়ঙ্করী॥
মৃত্যু-প্রলয় তাদের লাগি
নয় যারা তোর অনুরাগী,
মা গো তোর শ্রীচরণ আশ্রয় মোর
(দেখে) মরণ আছে ভয়ে মরি॥

তোর যদি না হয় মা বিনাশ
মা আমিও অবিনাশী॥
আমি তোরই মাঝে ঘুমাই জাগি,
তোরই কোলে কাঁদি হাসি ;

(তোর) চরণ ছেড়ে পালায় যারা
মায়ার জালে মরে তারা
তোর মায়াজাল এড়িয়ে গেলাম
মা তোর অভয়-চরণ ধরি॥

৭৮

মাতৃনামের হোমের শিখা
আমার বুকে কে জ্বালালো।
সেই শিখা আজ হরবে যেন মা
ত্রিজগতের আঁধার কালো॥

আজ মনে হয় দিবস যামী
অমৃতেরই পুত্র আমি মা
আনন্দময় হল ত্রিলোক
যেদিকে চাই কেবল আলো॥

সূর্য যেমন জানে না তার
আলোয় কত জগৎ জাগে,
বিকার-বিহীন তেমনি আমি,
জ্বলি নামের অনুরাগে।
হয়তো আমার আলোকে লেগে
নতুন সৃষ্টি উঠছে জেগে,
তাই কি বিপুল আকর্ষণে
সবারে চাই বাসতে ভালো॥

৭৯

আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি।
যা আছে সব কিছু মোর লুটে নে মা রাতারাতি॥

আয় মা মশাল জ্বেলে ডাকাত ছেলে ভৈরবদের করে সাথি ;
জমেছে ভবের ঘরে অনেক টাকা যশঃ খ্যাতি।
কেড়ে মোর ঘরের চাবি সে মা সবই পুত্রকন্যা স্বজন জ্ঞাতি॥
মায়ার দুর্গে আমার দুর্গা নামও হার মেনেছে ;
ভেঙে দে সেই দুর্গ, আয় কালিকা তাথৈ নেচে।

রবে না কিছুই যখন রইবে ভাঁড়ে মা ভবানী
মুক্তি পাবো সেদিন টানব না আর মায়ার ঘানি।
খালি হাতে তালি দিয়ে কালী বলে উঠবো মাতি,
কালী কালী বলে খালি হাতে তালি দিয়ে উঠব মাতি।

৮০

আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা
ওমা, তোর মুক্তি–সাগর –কূলে।
মোর ভিক্ষা ঝুলি হতে মায়ার মুক্তামানিক নে মা তুলে॥
মা তুই সবই জানিস অন্তর্যামী,
সেই চরণ–প্রসাদ–ভিক্ষু আমি,
শবেরও হয় শিবত্ব লাভ, মা, তোর যে চরণ ছুঁলে॥

তুই অর্থ দিয়ে কেন ভুলাস
এই পরমার্থ–ভিখারিরে,
তোর প্রসাদী–ফুল পাই যদি মা
গঙ্গাধরাও চাই না শিরে॥

তোর শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী
আমি হতে পারি ব্রহ্ম–জয়ী,
সেই মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতে নাহি ভুলে॥

৮১

আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের
নাম রেখেছি কালী।

পাছে লোকের দৃষ্টি লাগে
মাখিয়ে দিলাম কালি
তার সোনার অঙ্গে মাখিয়ে দিলাম কালি॥

হাড়ের মালা গলায় দিয়ে
দিয়েছি তার কেশ এলিয়ে,
তবু আনন্দিনী-নন্দিনী মোর দেয় রে করতালি।
নেচে নেচে দেয় রে করতালি॥
চোখে চোখে রাখি তারে, পাছে সে হারায় ;
তাই কালো মেয়ের রূপ লেগেছে মোর আঁখি-তারায়।
সে শ্মশান-পথে বেড়ায় একা,
সহজে সে দেয় না দেখা রে,
শুধু বনের জবা জানে আমার মেয়ে রূপের ডালি॥

৮২

আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে
শ্যামা-ভাবসমাধিতে।
শ্যামা রসে যে-মন আছে ডুবে
কাজ কি রে তার যশ-খ্যাতিতে॥

মধু যে পায় শ্যামা-পদে
কাজ কি রে তার বিষয়-মদে,
যুক্ত যে-মন যোগমায়াতে
ভাবনা কি তার রোগ-ব্যাধিতে॥

কাজ কি রে তার লক্ষ টাকায়, মোক্ষ-লক্ষ্মী যাহার ঘরে ;
কত রাজার রাজা প্রসাদ মাগে সেই ভিখারির পায়ে ধরে।

ও মা শক্তিময়ী অন্তরে যার,
দুঃখ-শোকে ভয় কি রে তার,
সে সদানন্দ সদাশিব জীবন্মুক্ত ধরণীতে॥

৮৩

থির হয়ে তুই বস দেখি মা
খানিক আমার আঁখির আগে।

দেখবো নিত্য-লীলাময়ী
থির হলে তুই কেমন লাগে॥
শান্ত হলে ডাকাত মেয়ে
কেমন দেখায় দেখবো চেয়ে,
চিন্ময় শিবশম্ভু কেন চরণতলে শরণ মাগে॥
দেখব চেয়ে জননী তুই সাকারা না নিরাকারা,
কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতির্ধারা।
কোলে নিতে কোলের ছেলে
শ্মশান জাগিস বাহু মেলে,
কেমন করে মহামায়া তোরও বুকে মায়া জাগে॥

৮৪

কি নাম ধরে ডাকবো তোরে
মা তুই দে তা বলে।
ওমা কি নাম ধরে কাঁদলে পরে
ধরে তুলিস কোলে,
মা তুই দে তা বলে॥

বনে খুঁজি মনে খুঁজি,
পটে দেখি, ঘটে পূজি ;
মন্দিরে যাই কেঁদে লুটাই, মা গো !
পাষাণ প্রতিমা মা তোর
একটুও না টলে॥
কোল যদি না দিবি মা গো
আনলি কেন ভবে ?
আমি জন্ম নিয়ে এসেছি যে
তোর কোলেরই লোভে।
আমি রইতে নারি মা না পেয়ে,
মরণ দে মা তাহার চেয়ে ;
এ ছার জীবনে কোন প্রয়োজন, মা গো !
আমি কোটি বার মা মরতে পারি
মা যদি পাই ম'লে॥

জি. ই. ২৫৫৪

৮৫

নিশি–কাজল শ্যামা আয় মা নিশীথ রাতে।
যেমন কালো বাদল নামে
নীল আকাশের নয়ন–পাতে॥
কুলকুণ্ডলিনী রূপে
ওঠ মা ওঠ মা জেগে চুপে চুপে,
মা ছেলেতে যাব মা চল
ভোলানাথের ঘুম ভাঙাতে॥

তোর বরাভয় রূপ দেখায়ে
দূর কর মা আঁধার–ভীতি ;
কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মা
দেখা পূর্ণ চাঁদের জ্যোতি।

পাতার কোলে কুঁড়ি–সম
মা গো হৃদয়–কমল মম
তোর চরণ অরুণ দেখার আশায়
রাত্রি জাগে রাতের সাথে॥

এন. ২৭৩৭৩

৮৬

ও মা ! তোর চরণে কি ফুল দিলে পূজা হবে বল।
রক্তজবা অঞ্জলি মোর হলো যে বিফল॥
বিশ্বে যাহা আছে মা গো,
তাতেও পূজা হবে না কো ;
তাই তো দুঃখে নয়নে মোর শুধুই আসে জল॥
মনের কোণে অর্ঘ রচি আঁধার ঘরে একা ;
ডাকলে তোরে সকল ভুলে দিবি নে তুই দেখা ?
তখন কি মা দুঃখ–হরা
শেষ হবে না অশ্রুধারা ?
কি ফুলে তোর পূজা হবে বল
কেন করিস ছল॥

৮৭

তোর নাম গানেরই দীপক রাগে
ধূপের মতন জ্বালা ঘোরে(মা)
নামের মন্ত্র নিতে নিতে
শোধন হব গহন চিতে ;
পরান-পাখি চরণ পাবে-
দেহ আমার থাকবে পড়ে (মা)॥
রক্ত হোক মা রক্তজবা,
দেহ আমার কোষাকুষি ;
অশ্রু হবে গঙ্গোদক মা-
সেই পূজাতে হও মা খুশি।
রসনা হোক মা নামাবলী,
দেহ আমার পূজার বলি ;
ঐ নাম-অনলে যেন পুড়ি
চলবো যখন যাত্রা করে (মা)॥

৮৮

শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে দেখি, আয় !
পীত ধড়া মোহন চূড়া কেমন মানায়॥

করেতে দেবো মা বাঁশি, বনমালা গলে ;
দাঁড়াবি ত্রিভঙ্গ হয়ে কদম্বেরই তলে ;
নতুবা ত্যজিব প্রাণ যমুনারই জলে ;
অহরহ এ- বিরহ সহা নাহি যায়॥

৮৯

রাঙা জবায় কাজ কি মা তোর
অরুণ-রাঙা চরণতলে।
লক্ষ কোটি উষা রবির
আঁধার-ভাঙা কিরণ ঝলে॥

সাজাতে মা ঐ রাঙা পায়
রত্নপতি হার মেনে যায় ;
পাগল ভোলা বুক পেতে দেয়
চরণ-রেণু পাবার ছলে ॥
পূজব আমি তোমার চরণ
এমন আমার কি বা আছে।
জবা সে যে তোরই জবা
কেমনে দিই চরণ মাঝে।
তবু আমি করবো মা ভুল,
সাজাব ঐ চরণ রাতুল ;
ভক্ত যেমন অঞ্জলি দেয়
গঙ্গা-পূজায় গঙ্গা-জলে ॥

৯০

তোর মেয়ে যদি থাকতো, উমা,
বুঝতিস তোর মায়ের ব্যথা।
যেমন বাবা তেমনি মেয়ে,
এতটুকু নাই মমতা ॥

ও-মা কেউ আছে কি ত্রিসংসারে
এই চাঁদমুখ ভুলতে পারে ;
মোর ঘর-বিরাগী জামাই গাহেন
পঞ্চমুখে তোরই কথা ॥
ও-মা দিনগুণে আর পথ চেয়ে মোর
যে অনলে পরাণ জ্বলে,
তুই যদি তা জানতিস উমা,
তোর পাষাণ-হিয়াও যেত গলে।
তোর আগমনী বাঁশি বাজে
নিশিদিন এ বুকের মাঝে,
কেঁদে কেঁদে শুধাই সবে –
আসবি কবে—সেই বারতা ॥

৯১

বর্ষা গেল, আশ্বিন এল, উমা এল কই।
শূন্য ঘরে কেমন করে পরান ধরে রই॥
ও গিরিরাজ! সবার মেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে
আমারই ঘর রইল আঁধার, আমি কি মা নই?

নাই শাশুড়ি ননদ উমার,
কেউ আদর করার নাই—
মা অনাদরে কালী সেজে
বেড়ায় না কি তাই!
মোর গৌরী বড় অভিমানী,
সে বুঝবে না মার প্রাণ-পোড়ানি,
আনতে তারে সাধতে হবে ওর যে স্বভাব ওই॥

৯২

শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্ত সিন্ধু-কল্লোল-রোল জেগেছে সপ্ত-তারে।
জননী এসেছে দ্বারে॥
সুর-সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে,
সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত-গ্রহের টানে;
অন্তরে মোর সপ্ত দোলের নব-জাগরণ সাড়ে।
জননী এসেছে দ্বারে॥
সাত-রঙা রবি রামধনু হাতে বরণের বাণ হানে,
সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয়-মাল্য আনে;
সপ্ত তীর্থ এক সাথ হয় হৃদি-মন্দির-দ্বারে।
জননী এসেছে দ্বারে॥

৯৩

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্য হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন॥

সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-বেদী
মা তোর পীঠস্থান;
সেথা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতবো মা তোর সিংহাসন॥
সেথা রইবে না কো ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চ-নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।
মোরা এক জননীর সন্তান সব, জানি,
ভাঙবো দেয়াল,ভুলবো হানাহানি;
দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন॥

৯৪

জাগো অরুণ-ভৈরব
জাগো হে শিব ধ্যানী!
শোনাও তিমির-ভীত বিশ্বে
নব-দিনের বাণী॥

তোমার তপঃতেজে, হে শিব!
দগ্ধ বুঝি হয় ত্রিদিব;
শরণাগত চরণে তব
হের নিখিল প্রাণী॥

ধ্যান হোক ভঙ্গ তব
শক্তি লয়ে সঙ্গে;
সৃষ্টির আনন্দে, হর!
লীলা করো রঙ্গে!
ললাটের বহ্নি ঢাকো,
শশী-লেখার তিলক আঁকো!
ফণি হোক মণি-হার,
হে পিণাক-পাণি॥

৯৫

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি,
হে প্রলয়ঙ্কর!
রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি
সংহর সংহর॥

জ্ঞানহীন তমসায় মগ্ন
পাপ-পঙ্কিলা
বিশ্ব জুড়ি চলে শিবহীন
যজ্ঞের লীলা!
শক্তি যেথায় করে আত্ম বিসর্জন—
ঘৃণায় ধ্বংস করো সেই অশিব
যজ্ঞ অসুন্দর॥

যেথা দেব শক্তি—নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে
ধর্মের মোহে।
হানো সংঘাত অভিসম্পাত
সেথা নিরন্তর॥

৯৬

শান্ত হও শিব বিরহ-বিহ্বল।
চন্দ্রলেখায় বাঁধো জটাজুট পিঙ্গল॥

ত্রি-বেদ যাহার দিব্য ত্রিনয়ন,
শুদ্ধ জ্ঞান যার অঙ্গ-ভূষণ,
সেই ধ্যানী শম্ভু কেন শোক-উতল॥

হে লীলা-সুন্দর! কোন লীলা লাগি
কাঁদিয়া বেড়াও হয়ে বিরহী বিবাগী।

হে তরুন যোগী, মরি ভয়ে ভয়ে-
কেন এ মায়ার খেলা, মায়াতীত হয়ে;
লয় হবে সৃষ্টি তুমি হলে চঞ্চল॥

৯৭

ভগবান শিব জাগো জাগো,
ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী।
শান্তিহীন আজ সৃষ্টি-
চন্দ্র সূর্য তারা হীন-জ্যোতি॥

হে শিব সতীহারা, হয়ে নিষ্প্রাণ
ভূ-ভারত হইয়াছে শবের শ্মশান;
কোলে লয়ে প্রাণহীন জড় সন্তান
শিব-নাম জপে ধরা অশ্রুমতী॥

৯৮

নমো নমো নমো হিমগিরি-সূতা
দেবতা-মানস-কন্যা!
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্ত্যে করিলে ধন্যা॥

আছাড়ি পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি পাষাণ ভীম তরঙ্গে;
কাঁপিছে ধরণী ভ্রূকুটি-ভঙ্গে
ভুজগ-কুটিল বন্যা॥

কূলে কূলে তব কন্যা কমলা
শস্যে কুসুমে হাসিছে অচলা;
বন্দিছে পদ শ্যাম-চঞ্চলা
ধরণী-ঘোরা অরণ্যা॥

৯৯

মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়!
মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা,
তাই দুর্গতি কাটিল না, হায়!
যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন,
অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ,
মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দী–
সেই দুর্গারে দেশ চায়॥

আমাদের দ্বিভুজে দশভুজা-শক্তি
দে পরব্রহ্মময়ী!
শক্তিপূজার ফল ভক্তি কি পাবো শুধু,
হব না কি বিশ্বজয়ী?
এই পূজা-বিলাস সংহার করো
যদি পুত্র শক্তি নাহি পায়॥

মধুমালা

কুশীলব

পুরুষ

মদন কুমার (কাঞ্চন নগরের যুবরাজ)
চিত্র সেন (মগদেশের রাজা)
বিচিত্রকুমার (ঐ রাজপুত্র)
দণ্ডধর (কাঞ্চন নগরের রাজা)
তাম্বুল (মধুমালার পিতা, সন্দ্বীপের রাজা)
রুদ্রকুমার (সেনাপতির পুত্র, কুমারের বন্ধু)
অয়স্কান্ত (বয়স্য)
ইন্দ্রজিত (ত্রিপুরার রাজা)
ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী, কাঞ্চননগরের প্রধান মন্ত্রী,
মগদেশের মন্ত্রী প্রভৃতি।

নারী

মধুমালা (সন্দ্বীপের রাজকুমারী)
কাঞ্চনমালা (ত্রিপুরার রাজকুমারী)
ঘুমপরি
স্বপ্নপরি
তিলোত্তমা (সন্দ্বীপের রানি)
পাটেশ্বরী (কাঞ্চননগরের রানি)
বৃশ্চিকা (মগদেশের রানি)
রোহিণী (ত্রিপুরার রানি)

প্রথম অঙ্ক

[হিমালয়ের অঙ্কদেশে বিশাল বনভূমি। চৈতালী চাঁদিনি রাতি। পশ্চাতে বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার বিমণ্ডিত শিরে অর্ধোদিত পূর্ণিমা চাঁদ শশীশেখর দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেই রজত গিরিনিভ বিপুল তনুতে উহা সর্প উপবীতের মতো শোভা পাইতেছে। আঁকাবাঁকা বিগলিত তুষারধারা। বর্ষপরে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে বিরহিণী বনলক্ষ্মী আজ অপরূপ মাধুরীতে শ্রীতে রূপসজ্জা করিয়াছে—যেন তপস্যার শেষে উমা নববধূর বেশে চন্দ্রমৌলি মহাদেবের প্রতীক্ষায় নিশি জাগিতেছেন। বনবিহগের সংগীতে, ভ্রমরের কলগুঞ্জনে, দশদিশি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কমল-দিঘির লাল নীল শ্বেত রক্তকমল কুমুদের মাঝে জোড়ায় জোড়ায়

বনহংস-হংসী খেলা করিতেছে। হরিণ ময়ূর নাচিয়া ফিরিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে বনপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার জাল বুনিয়াছে। দেবদারু পলাশ শাল পিয়াল কৃষ্ণচূড়া কুরুবুক "সিলভার-ওক" "রডোডনড্রন" প্রভৃতি তরু গুল্মলতা নানারঙের ফুলের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই আলোছায়াসরসীর তীরে নৃত্য-গীত করিতেছে বন-বালিকার দল। সরোবরে পদ্মাসনে বীণা হাতে বসিয়া ঘুমপরি এবং সূক্ষ্ম-মায়াময় জালে আবৃতা হইয়া শ্বেতহংস বাহিনী স্বপন পরি সেই গান শুনিতেছে।]

বন-বালিকাদের গান

জাগো বনলক্ষ্মী! জ্যোৎস্না বিহ্বলিত চৈতালী নিশীথে।
রাঙাও দশদিশি লজ্জা-অরুণ রূপ সজ্জায় বনশ্রীতে॥
তব আলোছায়ার ডুরে শাড়ির আঁচল
লুটাক বকুল-তলে সুখ-বিহ্বল,
তব লতা কবরী হের পুষ্প ভারে
হল অবনমিতা অয়ি অসম্বৃতে॥
পর গিরি-ঝর্নার শতনরী হার
হে বনলক্ষ্মী!
বিরহ-শীর্ণা দেহে জাগুক জোয়ার
নব যৌবনের জাগুক জোয়ার
হে বনলক্ষ্মী!
ঝঙ্কৃত হোক বনভূমি নিঝঝুম
পুষ্পিত মাধবীর পর কঙ্কণ
আলতা পর কলি পলাশ রঙ্গন
ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর গীতে॥

ঘুমপরি ও স্বপনপরির গান

হে বিজয়ী! হে না-দেখা রূপের কুমার! (এস এস)
তন্দ্রা-অলস এই চন্দ্রা নিশির ভাঙো ভাঙো দ্বার॥

ঘুমপরি : স্বপনকুমারীর খোলা গুণ্ঠন
স্বপনপরি : ঘুম কিশোরীর আনো জাগরণ
দস্যুসম এসে কর লুণ্ঠন
কুণ্ঠিত প্রেম—মধুনিশি গন্ধার॥

(সহসা অদূরে বিপুল সেনা-বাহিনীর উল্লাস কলরোল ও উদ্দাম সংগীতের দমকা হাওয়া ভাসিয়া আসিল। ঘুমপরী ও স্বপনপরী মুদিত কমলের অন্তরালে অন্তর্হিতা হইলেন। বন-বালিকারা বনের তরুলতাকে আশ্রয় করিয়া অদৃশ্য হইয়া রহিলেন।
শিকারের সজ্জায় সজ্জিত বর্ম-আচ্ছাদিত যুবরাজ মদনকুমার ও তাঁহার সঙ্গী সেনাদলকে দূরে পর্বত শিখরে দেখা গেল—মুদিত কমল হইতে অর্ধ নিস্ক্রান্তা ঘুমপরি, স্বপনপরি ও অর্ধ লুক্কায়িতা বনবিহারিণীর দল একসঙ্গে গাহিয়া উঠিল—)

সুন্দর ! সুন্দর
অপরূপ ! নন্দন-আনন্দ মনোহর ॥
এক হাতে মালা তার এক হাতে তরবার
শুভ্রপদ্মজ্যোতি ও কি দেবসেনাপতি
ও কি রতির পতি কিশোর মুরলীধর ॥

মদনকুমার : সুন্দর ! সুন্দর ! সখা ! সেনাপতি ! সৈন্যগণ ! চন্দ্রদেব অযুত কুমুদিনী লয়ে এই সরোবরে বিহার করছেন। তাঁর এই লীলা সরসী আনন্দিত তীরে উন্মুক্ত তরবারি অবনমিত করে তাঁকে প্রণাম কর। তাঁর এই মধুর প্রশান্তির মাঝে যেন কোলাহলের আবর্ত এনে পঙ্কিল না করে তুলি।

(প্রথমে যুবরাজ ও পরে সকলে তরবারি নামাইয়া প্রণাম করিল। কেবল বয়স্য অয়স্কান্ত বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।)

এ কি ! বয়স্য অয়স্কান্তের মুখে এমন বায়স-কান্তি ফুটে উঠেছে কেন? আরে, এখন ত নির্ভয় হলে এই আনন্দ সরসীর তীরে এসে।

অয়স্কান্ত : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) যুবরাজ। আমাকে এক্ষুণই আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন।

মদনকুমার : স্ত্রীর কাছে? এখনই?

অয়স্কান্ত : হ্যাঁ যুবরাজ, এখনই ! আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমি অত্যন্ত অপরাধ করে এসেছি সেই দেবীর কাছে (উদ্দেশ্যে প্রণাম) !

মদনকুমার : কি বলছ তুমি বন্ধু? তুমি পথক্লেশে পাগল হয়ে গেলে নাকি?

অয়স্কান্ত : যুবরাজ, পা গোল নয় যুবরাজ, পেট গোল হয়ে উঠছে। দেখছেন না রাজপ্রাসাদের গম্বুজ—মন্দিরের চূড়ো—হাতির হাওদা—কামারের হাপর হয়ে উঠল হাঁপানীর বেমোয় ! বাপ ! এর নাম শিকার? তাও যদি কিছু শিকার পাওয়া যেত, শিকার ত হল ছাই, হল শুধু কষ্ট স্বীকার ! চড়াই আর উতরাই, ওঠা আর নামা করতে করতে পেট হয়ে উঠল পটহ !

মদনকুমার : শিকার যে পেলাম না তার জন্য দায়ি তুমি। তোমার জন্য কেউ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারিনে। দুক্রোশ পথ এসে দেখি, তোমার ঘোড়া গদাইলস্করী চালে টিকুতে টিকুতে আসছে সবার পিছনে।

অয়স্কান্ত : যুবরাজ ! যে যাই বলুন, ঘোড়া ত ঘোড়া আমার ঘোড়া, আমাদের সব ঘোড়াকে আমার ঘোড়া খেদিয়ে নিয়ে যায়। আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ার ভয়েই না আপনাদের ঘোড়া এমন করে ছুটতে

থাকে। কত কষ্টে আমার ঘোড়াকে থামিয়ে রাখি, বলি, যাক না বাবা, ওরা বড় ভয় পেয়েছে; ওদের যেতে দে!

রুদ্রকুমার : কিন্তু বয়স্য দা, বৌ-ঠাকরুনের কাছে কেন যেতে চাচ্ছিলেন, তা ত বললেন না?

অয়স্কান্ত : আরে ভাই, আমি যেদিন শিকারে আসি, তার আগের দিন বৌ-এর সাধভক্ষণ উৎসব ছিল, দোতলায় উঠে আসতে তাঁর অবস্থা দেখে হেসেছিলাম, আজ তোমার বৌঠান এখানে থাকলে হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁ গো, তোমার সাধভক্ষণ কবে? (সকলের হাসি)

মদনকুমার : এই তিনদিন ধরে সত্যি সত্যিই শুধু কষ্ট স্বীকারই হল, কোনো শিকার পাওয়া গেল না। যাক, জ্যোৎস্না-ধোওয়া এই অপূর্ব বনশ্রী আর এই কমল দিঘি দেখে পথের সমস্ত ক্লান্তি আমার জুড়িয়ে গেছে। আজ রাত্রিটা এইখানেই তরুতলে লতা-কুঞ্জের ছায়ায় শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক। কী বল সেনাপতি? সখা অয়স্কান্তের কী মত?

অয়স্কান্ত : আজ্ঞে, যদি কাছে শ্যাওড়া গাছ না থাকে, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। এই তিনদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোখ-মুখ হয়ে গেছে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মত, পেট হয়ে গেছে মাড়োবারের, পা ফুলে হয়ে গেছে উড়িষ্যার, পেটের ভিতর ঝগড়া করছে মাদ্রাজি। আমি একেবারে আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়েছি! এখন একটু ঘুমুতে না পারলে প্রাণ চলে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে- -দেহ নিয়ে টানবে শ্যাওড়া গাছের পেত্নি। (ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন)

রুদ্রকুমার : আচ্ছা বয়স্যদা, পেত্নি নিয়ে যে ঘর করে, তার এত পেত্নির ভয় কেন? তা ছাড়া তোমার শ্বশুরালয়ও ত পেত্নিতলা গ্রামে আর মামার বাড়ি শেওড়া-ফুলিতে। কাজেই শেওড়া গাছ বা পেত্নিকে ত তোমার ভয় করার কথা নয়।

অয়স্কান্ত : তুমি থাম ত হে ছোকরা। তুমি শুধু মানুষ জবাই করতে শিখেছ। মানুষকে পোষ মানানোর গুরুভার কখনো বহন করেছ? বৃষস্কন্ধ পুরুষই নারীকে বয়ে বেড়াতে পারে সংসারে। যুদ্ধে তোমার শোভা যেমন তোমার কোমরের তলোয়ার, তেমনি সংসার-যুদ্ধে পুরুষের শোভা তার কাঁধের স্ত্রী, বুঝেছ?

মদনকুমার : আঃ, এমন রাত্রিটা তোমরা কচকচিতেই কাটিয়ে দিলে। তার চেয়ে কেউ খোঁজ করে দেখতে পার কোথাও দু'চারটে নর্তকী

পাওয়া যায় কিনা—যারা তাদের নাচে ও গানে পানসে চাঁদের জ্যোৎস্নাতে ঘন সুরার নেশা ঘনিয়ে তুলবে।

অয়স্কান্ত : এই জঙ্গলে নর্তকী খুঁজতে হলে আকাশে জাল ফেলে দু'চারটে পরি ধরা ছাড়া ত আর উপায় দেখিনে যুবরাজ। গভীর অরণ্যের দু'দশ যোজনের মধ্যেও জন-মনিষ্যি আছে বলে ত মনে হয় না। তা অভাবে যখন সবই চলে আমাদেরই বা চলবে না কেন?

মদনকুমার : (হাসিয়া) অর্থাৎ?

অয়স্কান্ত : অর্থাৎ নর্তকীর বদলে নর্তকার নাচ দেখুন, যুবরাজ। সৈনিকগুলো সব এরই মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে আরম্ভ করেছে—ওদের খুঁচিয়ে তুলে নাচবার হুকুম দিন।

রুদ্রকুমার : তা মন্দ হবে না, যুবরাজ। অন্তত খানিক হুল্লোড় করা যাবে ত। অর্ধেক রাত ত এমনি কাটিয়ে দেওয়া যাক। (ঘুমন্ত সৈনিকদের) এই-এই-সব ওঠো—উঠে পড় সব—বাঘ বাঘ।

(সকলে শশব্যস্তে "এঁা-এঁা-কি বাঘ। বাড়ি কোথায়? বয়েস কত?" ইত্যাদি শব্দ করিয়া বিচিত্র মুখভঙ্গি করিয়া জাগিয়া উঠিল)

অয়স্কান্ত : এই আবাগের বেটা ভূত সব! বাঘ নয় বাঘ নয়—ভয় নেই—জাগ জাগ! তোদের নাচতে হবে।

সকলে : নাচতে হবে?

রুদ্রকুমার : হ্যাঁ, নাচতে হবে। বাঁচতে যদি চাও সবে, আজ নাচতে হবে।

অয়স্কান্ত : গাইতে হবে, কাশতে হবে, হাঁচতে হবে, গোঁফ দাড়ি সব চাঁচতে হবে!

রুদ্রকুমার : আলবৎ! নাচতে হবে! নাচতে হবে!

অয়স্কান্ত : ওরে তোদের ভয় নেই। আমি আগে আগে নাচব, গাইব, ভাব বাতলাব, আর তোরাও তারই অনুকরণে গাইবি, নাচবি, ভাবভঙ্গি করবি, বুঝলি?

মদনকুমার : আচ্ছা। তা হলে আর দেরি নয়, নাচ শুরু হোক।

অয়স্কান্ত : (উষ্ণীষ খুলিয়া উড়ানি করিল—অন্যান্য সকলে তাহাই করিল—নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া) আমার নাম পাত্‌লিজান, ওরা গায় ক্ষীণতনু যৌবনভার বইতে নারে, আমি গাইব পাত্‌লি কোমর ভুঁড়ির ভার বইতে নারে! আচ্ছা, এইবার সব গান ধর!

গান

মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা।
(ওদের) আছে শাড়ির আঁচল মোদের আছে কোঁচা কাছা॥

ওরা বাঁকায় ভুরু, মারে চোখ, নাড়ে ঘাড়,
আমরা চেমরাই গোঁফ দেখাই বঙ্কিম হাঁটুর হাড়,
ওদের আছে বেণী মোদের আছে দাড়ি
ওরা দুলায় মাজা আর আমরা ভুঁড়ি নাড়ি
(ওদের) কণ্ঠ যেন কোকিল মোদের কণ্ঠ হাঁড়িচাচা॥

(হঠাৎ সকলের হাসির হুল্লোড় কমিয়া আসিল, সকলে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া যেন কোন মায়ার প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। এই নিদ্রা আসিবার পূর্ব হইতেই বেণু বীণা ইত্যাদির ঘুম-আসা অলস সুর বাজিতেছিল এবং ইহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইবার সাথে সাথে কমল-দিঘিতে ঘুমপরি ও স্বপনপরি গাহিয়া উঠিল—বন-বালিকারা সাথে সাথে চাপা গলায় গাহিতে লাগিল।)

গান

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম।
আকাশ বাতাস জল থল উপবন
সব হোক নিঝ্‌ঝুম॥
শান্ত হোক সব অশান্ত কলরোল
রে পথিক ! জীবন পথের ক্লান্তি ভোল
নয়নে লাগুক সুখস্বপনের কুঙ্কুম॥

স্বপনপরি : (মুদিত যুবরাজকে দেখাইয়া) কী অপরূপ রূপ দেখেছিস ঘুমপরি ?

গান

এরই লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি॥
সই দেখ লো চেয়ে রূপ সায়রে জ্বলে এ কোন বাতি
লক্ষ চাঁদের জ্যোৎস্না হেথা কে রেখেছে পাতি ?

ঘুমপরি : সত্যিই স্বপনপরি ! এই পৃথিবীর পাঁকে এমন নন্দন পারিজাত কেমন করে ফুটল তাই ভাবছি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

গান

যেন দুধ সাগরের ননী দিয়ে তৈরি লো এর গা
পৃথিবী কি শিউরে ওঠে এ রাখে যখন পা।

স্বপনপরি : তা হলে তুমিও মরেছ ?
ঘুমপরি : তুমিও মরেছ মানে, "আমি ত মরেইছি সাথে সাথে তুমিও মরেছ," এই ত ?
বন-বালিকাগণ : আমাদের কথা বন-দেবতাই জানেন।

গান

তুমি কে গো (কে কে কে)
তুমি মোদের বন-দেবতা॥
আমরা বনশ্রী—তোমার পূজারিণী ধ্যান-রতা
হে বন-দেবতা॥

১মা : আমি মালতি মুকুল
২য়া : আমি ব্যাকুল বকুল
৩য়া, ৪র্থ, ৫মা : মোরা গুণহীনা অশোক পলাশ শিমুল
৬ষ্ঠা : আমি জলের কমল (আঁখি জলের কমল)
৭মা : আমি মাধবীলতা
৮মা : আমি গিরিমল্লিকা
৯মা : আমি হাস্নাহনা
১০মা : আমি ছোট ডুমো ফুল রই চির অজানা
১১শী : আমি ঝর্নাধারা কেঁদে কেঁদে বয়ে যাই।
১২শী : আমি দিনের ভাদ্র-বৌ চাঁদের কুমুদ
১৩শী : আমি পাখির গান বনভূমির কথা॥

ঘুমপরি : ওলো বনের মেয়ে! তোরা ফুল আনতে পারবি—অনেক ফুল চাই—সেই ফুল দিয়ে এই সুন্দরকে সাজাব।

স্বপনপরি : আচ্ছা তাই হবে। যা তোরা ফুল আন।

সকলে : (সোৎসাহে) চল ভাই ফুল আনি—চল আমাদের বন-দেবতাকে সাজাব।

(নৃত্যের ভঙ্গিতে একে একে চলিয়া গেল)

ঘুমপরি : ওদের আসার আগেই আমাদের মাঝে একটা রফা হওয়া দরকার। একে কে নেবে, তুমি না আমি?

স্বপনপরি : ছি ছি ঘুমপরি, তুমি এই মানব-পুত্রকে ভালোবেসে পরির কুলে কলঙ্ক দেবে? আমি ওকে কখখনো ভালোবাসি নি—বাসব না। মানুষকে আমি ঘৃণা করি, মাটিতে ওদের জন্ম, ওদের বাইরে ভিতরে ধুলার আবর্জনা। তুই যদি চাস ওকে নিতে পারিস। কিন্তু আমি আজই গিয়ে পরির দেশে রটিয়ে দেবো তোর কলঙ্কের কথা। তুই আর জীবনে পরিদের মাঝে মুখ দেখাতে পারবি নে। ইন্দ্রসভায় নাচতে পারবি নে।

ঘুমপরি : মুখ দেখাতে পারব না কিন্তু এ মুখ ত দেখতে (কতকটা স্বগতভাবে) কিন্তু পরির দেশ ত আমার কাছে হবে নিষিদ্ধ। তখন এই পৃথিবীতে—না না, একে মাটির গন্ধ তাতে দিনের

আলোক সইতে পারব না। শুকিয়ে যাব, মরে যাব। আচ্ছা ভাই স্বপনপরি, এই সুন্দরের পাশে শোভা পায় এমন সুন্দরী তুই দেখেছিস?

স্বপনপরি : কেন বলত?

ঘুমপরি : আমার প্রয়োজন আছে, যদি তার দেখা পাই তার কাছে রেখে দেখি, কে বেশি সুন্দর। দেখি পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কি না।

গান

ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি করে বিধির পুঁজি শেষ
এই চাঁদের পাশে চাঁদ শোভা পায় আছে সে কোন্ দেশ!

স্বপনপরি : আমি এমন সুন্দরী দেখেছি যাকে দেখে মনে হবে বিধাতার বিলাসলক্ষ্মী। বিধাতা-পুরুষ তাকে তাঁর মনের সকল মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন।

গান

এ তো একা চন্দ্রমণি সে মানিকের ডালা।
এ সারা বনে একটি কুসুম, সে কুসুমের মালা॥
হাসলে কন্যা ফুটে ওঠে পৃথিবীতে ফুল
সে কাঁদলে পরে ভেঙে পড়ে সাত সাগরের কূল
ইন্দ্রলোকে দেখেনি কেউ তেমন দেব-বালা॥

ঘুমপরি : অসম্ভব! বাতুলের কথা। তা যদি হয় আমি এর ওপর আমার সমস্ত দাবি ছেড়ে দেবো।

স্বপনপরি : সত্যিই?

ঘুমপরি : সত্যি সত্যি তিন সত্যি। এই ফুল ছুঁয়ে শপথ করছি।

স্বপনপরি : আমিও চাঁদের দিকে চেয়ে শপথ করে বলছি, সে যদি এর চেয়ে সুন্দর না হয় আমিও এর ওপর সমস্ত দাবি ছেড়ে দেবো।

ঘুমপরি : বেশ, তা হলে চলো একে উড়িয়ে নিয়ে যাই সেই দেশে কিন্তু কোথায় সে দেশ? তার নাম কি?

স্বপনপরি : এখন বলব না সে দেশের নাম—তারও নাম। সে দেশে পৌছে তার পাশে একে রেখে জাগিয়ে দিলেই সব জানতে পারবি। কিন্তু আমি যে পথে যেতে বলব কোনো প্রশ্ন না করে সেই পথে যেতে হবে। কেমন রাজি?

ঘুমপরি : রাজি। তা হলে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, বনের মেয়েরা দেখলে আর ছেড়ে দিতে চাইবে না।

স্বপনপরি : দাঁড়া, আমার ময়ূরপঙ্খি বিমানকে স্মরণ করি, সে এলে দুজনে ওকে তাতে শুইয়ে নিয়ে যাব।

স্বপনপরির গান

আয় আয় মোর ময়ূর বিমান আকাশ নদী বেয়ে।
ফুল ফোটানো হাওয়ায় ভেসে চাঁদের আলোয় নেয়ে॥

(ময়ূর বিমান মধুর শব্দ করিয়া আসিয়া পৌঁছিল। ফুলপরিরা কুমারকে সেই বিমানে লইয়া গাহিতে গাহিতে উড়িয়া গেল।)

স্বপনপরির গান

সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপার খাটে কেশ
ময়ূরপঙ্খি যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ।

ঘুমপরি : কি বললি? তার নাম মধুমালা? কি মিষ্টি নাম?

স্বপনপরির গান

তার নামের চেয়ে রূপে সখি অনেক বেশি মউ
নব লক্ষের মালা পাবে সে হবে যার বউ
তারায় তারায় ছড়িয়ে আছে তারি রূপের রেশ
ময়ূরপঙ্খি যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ॥

(পটপরিবর্তন—মধুমালার প্রাসাদ সাগরপুরির মধ্যে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রাত্রি তৃতীয় প্রহর—চারিদিকে সমুদ্রের জল-কল্লোল—মাঝে সন্দ্বীপ—তারই কূলে মধুমালার সোনার প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিপার্শ্বে ভীমাকৃতি প্রহরী মুক্ত তরবারি হস্তে পায়চারি করিতেছে। নিশুতি রাত্রের কালো ছায়ায়-ঢাকা সেই প্রাসাদ যেন জল-দেবীর বিলাসপুরী বলিয়া মনে হইতেছে। উপরে পরিদের ময়ূরপঙ্খি-রথের শব্দ ভ্রমরগুঞ্জনের মতো শুনাইতেছে—নিচে জলোচ্ছ্বাস সংগীতের মধ্যে দূরাগত ঘুমহারা পাখির শ্রান্ত কণ্ঠস্বর—(এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিলে ভাল হয়)। পুরীর ছত্রিশ প্রাচীর সাতমহলা তের কুঠরীর পারে মধুমালার শয়নকক্ষ। শয়ন শিয়রে তিন সারি ঘৃত প্রদীপ। তের থাক পালঙ্কে মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাগত-তীরে এক নৌ-সেনা গান গাহিতে গাহিতে তরী বাহিয়া চলিয়া গেল।]

নৌ-সেনা বা মাঝির গান

নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি
যায় নিদ্রা নিদ্রা যায় রূপের কেয়ারি রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি॥
ঝলমল করে কন্যার এলোকেশ
পালঙ্কে লুটায় রে তার আলুথালু বেশ
ফুল শয্যায় ঘুমায় যে চাঁদের পিয়ারি রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি॥

(অদূরে ঘুমপরি ও স্বপনপরির গান শোনা গেল)
ঘুম আয় ঘুম আয় ঘুম ঘুম ঘুম
মধুমালার দেশ ঘুমে নিশুতি নিঝঝুম।

(দেখিতে দেখিতে হাই তুলিয়া সকল প্রহরী দাস-দাসী ঘুমাইয়া পড়িল। মদন-কুমারের পালঙ্ক লইয়া ঘুমপরি ও স্বপনপরি মধুমালার পালঙ্কের দক্ষিণে রাখিল—অমনি হাজারো সাপ হাজারো ফণাতে মাণিক-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। অসম্বৃত-কেশ- বেশ রাজকন্যা মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখা গেল। "কন্যার সিঁথিতে পাটিতে ফুল, ফুল-ঢাকা সারা অঙ্গ গায়"। শতদলের পাপড়ি দিয়ে বিছানা শয্যা। ঘুমপরি নিমেষহারা নয়নে সে রূপসুধা পান করিতে লাগিল। তাহার মুখে কথা নাই। স্বপনপরীর গান—)

গান

ভোরের তরুণ অরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদে
পাশপাশি শুয়ে লো দেখ্ এক শয্যায় কাঁদে।
রাজার কুমার গড়া যেন ভোরের আলো দিয়ে
রাজকন্যার সৃষ্টি যেন পদ্ম পাপড়ি নিয়ে
(আমি) দেখি সুন্দর বিধাতারে এই দুই রূপের ফাঁদে॥

স্বপনপরি : (ঠেলিয়া) ঘুমপরি ! ঘুমপরি ! তুই ঘুমুচ্ছিস নাকি ?

ঘুমপরি : (দুই হাতে চোখ কচ্‌লে) বোন স্বপনপরি, আজ নয়ন আমার সার্থক হল। আমার রূপের তৃষ্ণা মিটল। এ রূপের দুই ডালা নিঠুর বিধি কোন্ প্রাণে ঠাঁই করে রেখেছিল, তাই ভাবছি।

গান

কী অনল জ্বলে লো সই কী অনল জ্বলে
নয়ন ভরল জলে লো সই আমার হিয়ার তলে
কী অনল জ্বলে॥
(আমি) উদাসী পাগল হয়ে না ত্যজিলাম কায়া
এই চাঁদের মুখে পড়ল আমার রাহুল প্রেমের ছায়া
মোর বুকের মাঝে সাত সিন্ধুর এ কি ঢেউ উথলে
কী অনল জ্বলে॥

স্বপনপরি : কে জিতল?

ঘুমপরি : তুই! আমারই হার!

গান

আমি হেরে এবার নেবো লো সই বঁধুর গলার হার।

স্বপনপরি : না, তুইই জিতেছিস, আমার হার

গান

হার মেনে তুই জিতবি ওলো হবে না তা আর॥

ঘুমপরি : শুধু হার হলো না লো, গলার হার হলো—এই দুঃখ এই বেদনাকে গলার হার করে চল দেশে দেশে কেঁদে বেড়াই।

ঘুমপরি : কাঁদতে তো হবেই তার আগে যার কাছে আমাদের হার হলো তার সঙ্গে আঁখিতে আঁখিতে রাখি বেঁধে দিয়ে যাই, তবে না বেদনার পাত্র কানায় কানায় পুরে উঠবে। ওদের জাগিয়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখি ওরা কি করে।

(ফুলের পাখা দিয়ে বাতাস দিল)

স্বপনপরি : ওরে হতভাগী! করলি কি, এদের যে যাকে দেখবে সেই যে উদাসী হয়ে যাবে!

[বলিতে বলিতে ঘুমের ঘোরে মদনকুমারের একখানা হাত মধুমালার গায়ে আসিয়া পড়িল। মধুমালা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া পার্শ্বে নিদ্রিত রাজপুত্রকে দেখিয়াই শিয়র হইতে তরবারি লইয়া রাজকুমারের বক্ষের উপর ধরিল—ধরিয়াই নিদ্রিত কুমারের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া শিহরিয়া ঝনঝনাৎ শব্দে তরবারি দূরে ফেলিয়া দিল—সেই শব্দে রাজপুত্রও চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়াই সম্মুখে সৌন্দর্যের প্রতিমা রাজকন্যাকে দেখিয়া অভিভূতের মত নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল।]

মধুমালা : কে? কে তুমি, চোর? দেব হও, দানব হও কিংবা অন্য কোনো জন হও সুন্দর মুখে সত্য পরিচয় দাও।

মদনকুমার : আমি?—আমি—

(রাজপুত্রের চোখে জল দেখা দিল)

মধুমালা : হ্যাঁ, তুমি। কোথায় তোমার দেশ, তোমার নাম কি? তুমি সাত সাগর সাত শ' প্রহরীর পাহারা এড়িয়ে কেমন করে এখানে এলে? তুমি মায়াবী, তুমি জাদুকর, তুমি চোর! এর প্রতিফল মৃত্যু।

(মধুমালা দুষ্ট হাসি লুকাইল অন্যদিকে চাহিয়া)

মদনকুমার : আমি সত্য বলছি—আমায় বিশ্বাস কর দেবী, আমি চোর নই—দেব নই মায়াবী নই—আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ—আমার নাম মদনকুমার। আমার পিতার নাম রাজাধিরাজ দণ্ডধর। আর তুমি—তুমি কে? আমি স্বপ্নে চাঁদের দেশে এসেছি? তুমি চাঁদের দেশের রাজকন্যা?

মধুমালা : (বালিকার মত চঞ্চল হাসি হাসিয়া ফুলের পর ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে বলিতে লাগিলেন) আমার নাম মধুমালা—আমি সন্দ্বীপের রাজকন্যা—আমার পিতার নাম মহা-রাজাধিরাজ তাম্বুল।

(রাজপুত্রও এইবার নির্ভয়ে হাসিয়া উঠিলেন)

মদনকুমার : কিন্তু, আমি এখানে এতদূরে তোমার দেশে এই সাগর-ঘেরা দ্বীপে এলুম কি করে? আমরা বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি, না?

মধুমালা : স্বপ্নই যদি হয়—তবে এ মধুর স্বপ্নকে মধুরতর করে নিতে বাধা কি বন্ধু? একটু পরেই ত স্বপ্ন যাবে টুটে—দিনের ফুল উঠবে ফুটে—তুমি চলে যাবে তোমার দেশে আর—আর আমি কাঁদব ঐ সাগরের সাথে চিরদিন চিররাত্রি।

মদনকুমার : না, না, ও কথা বলো না! (হাত ধরিতে গিয়া পিছাইয়া আসিল) আমাদের এ রাত্রির আর শেষ হবে না, স্বপ্ন আর টুটবে না—সেই আশার কথা বলো।

মধুমালা : তুমি কাছে এসে চলে গেলে কেন? ধরো, আমার, হাত ধরো, আমার বুক কাঁপছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের গাঙ-চিল সিন্ধুকপোত ডেকে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে এখনই বুঝি প্রভাত হয়ে যাবে। (বাতায়নে গিয়ে) ঐ দেখ, এখনো শুকতারা ওঠে নি—ধরো, আমার হাত ধরো।

(রাজপুত্র হাত ধরিলেন। অশ্রুমুখি মধুমালা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।)

মদনকুমার : তুমি এত কাঁপছ কেন? এই যে আমি তোমার হাতের কাছে—আমায় হাত দিয়ে ধরো।

গান

(তোমার) চন্দন রং উত্তরীয় মেঘডম্বুর শাড়ি
কাজল-বরণ কেশ কন্যা চল আমার বাড়ি॥
চির হয়ে কি নেমে এল চঞ্চল বিজলি
ফুটল কি আজ তোমার দেহে পূর্ণ চাঁদের কলি।
রতি কি আজ নেমে এল পতিরে তার ছাড়ি
কন্যা চলো আমার বাড়ি॥

মধুমালার গান

সাগরে কি ফিরে এলে নীল সাগরের চাঁদ?
তাই কান্নার জোয়ারে তার ভাঙল কূলের বাঁধ।
দূর আকাশের লক্ষ তারা
চেয়ে আছে তন্দ্রাহারা
তারা তোমার রূপ নিয়ে কি করে কাড়াকাড়ি
কুমার! থাক আমার বাড়ি।

মধুমালা : দেখ কুমার! সাত সমুদ্র সাত শ' প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সাত–ছত্রিশ তের কুঠরি পার হয়ে তুমি যখন বিধাতার বর হয়ে এসেছ—তখন—

(রাজকন্যা লজ্জায় চুপ করিলেন)

মদনকুমার : থাম্‌লে কেন? বলো বলো কি বলছিলে, বলো। বলো।

মধুমালা : (লজ্জা-বিজড়িত স্বরে) এ সেই লীলা রসিক বিধাতা পুরুষেরই ইঙ্গিত যে তুমি আমার বর হও।

মদনকুমার : আমি? আমি—তোমার বর হব?

মধুমালা : (ব্যাকুল স্বরে) কেন? কেন তা হয় না?

মদনকুমার : তোমার এই অপরূপ রূপের মালা যার গলায় শোভা পাবে—তাকে বোধহয় বিধাতা আজও সৃষ্টি করে উঠতে পারেন নি।

মধুমালা : তুমি কি তোমার নিজেকে কোনদিন দেখেছ? দেখলে এ কথা বলতে না। এই নাও আমার অঙ্গুরি—তুমি নাও, তোমার অঙ্গুরি আমায় পরিয়ে দাও। এই নাও আমার নবলক্ষের রত্নহার—তুমি দাও তোমার ঐ পদ্মমণির মালা।

(মালা বদল। অপর কক্ষে উলুধ্বনির শব্দ)

মদনকুমার : ওকি, উলু দেয় কে?

মধুমালা : (হাসিয়া) আমার শুকসারি। কিছু দিন আগে আমার দিদির বিয়েতে উলুধ্বনি শুনে ওরা পুরুষ নারীকে কাছাকাছি দেখলেই উলুধ্বনি করে ওঠে।

মদনকুমার : মালা! প্রিয়া! অঙ্গুরি যদি নিলে, মালা যদি দিলে, তোমার গায়ের চন্দন–রং চাদর আমায় দাও, আমার ধানী রঙের চাদর তুমি নাও। (গুন্‌গুন্ সুরে গান)

গান

আহা! সুনীল নীরদে ঢাকিল অরুণ
নীহারে ঢাকিল শশী

মধুমালার গান

চন্দন মেখে শুকতারা হাসে
মোর বাতায়নে বসি।

মধুমালা : এ কি! এ কি! ঐ দেখ, শুকতারা উঠেছে পূর্ব-তোরণে! আমায় জড়িয়ে ধর, একেবারে প্রাণের কাছে লুকিয়ে রাখ, তুমি চলে যেয়ো না—তুমি যেয়ো না!!

(বলিতে বলিতে মধুমালা পালঙ্কে ঘুমে অভিভূত হইয়া লুটাইয়া পড়িল—মদনকুমারও তাহারই পার্শ্বে ঘুম বিজড়িত নয়নে লুটাইয়া পড়িল)

ঘুমপরি : আমি ওদের চোখে ঘুম দিয়েছি—আর দেরি নয়—মালা কেঁদে বলছিল "তুমি যেয়ো না", কিন্তু ওদের যেতেই হবে!

গান

পূর্ব সাগরে ডুব দিয়ে ঐ সোনার রবি উঠল রে।
রাতের চোখের অশ্রু ঝরে কুসুম হয়ে ফুটল রে॥
যাত্রী ওরে যেতে হবে
গভীর ব্যথা পেতে হবে
তাই মিলন রাতের বালুর মালা জাগরণে টুটল রে॥

স্বপনপরি : না, না, ওদের মাঝে এই বিরহের যবনিকা ফেলে দিস্ নে ঘুমপরি। আমি এখনও যেন শুনছি মধুমালার করুণ মিনতি—

গান

তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না
মিলনের সাধ না মিটিতে চাঁদ বিদায় চেয়ো না চেয়ো না॥
শোনো গো আমার বক্ষের মাঝে
সাত সাগরের ক্রন্দন বাজে,
জোয়ারের তরী এখনই বন্ধু ভাঁটার স্রোতে বেয়ো না॥

ঘুমপরি : বিরহের আগুনে পুড়ে ওদের প্রেমের সোনা খাঁটি হবে সই, চল্ আর দেরি করিসনে। দাঁড়া তার আগে ওদের পালঙ্ক বদল করে নিই।

পালঙ্ক বদল করিতে করিতে গান

ঘুম যবে ভাঙবে কন্যা—স্বপন যাবে টুটে
সুখ স্বপন যাবে টুটে।
ফুল-শয্যার ফুটবে কাঁটা প্রভাত বেলা উঠে

(পালঙ্ক ময়ূরপঙ্খিরতে লইয়া উঠিয়া গেল—পটপরিবর্তন—আবার সেই হিমালয়ের সানুদেশ দেখা গেল। তখন রক্ত-আঁখি তরুণ অরুণ জাগিয়াছে—তারই রঙে হিমালয়ের চূড়ায় রঙের আবির খেলা চলিয়াছে। পরি দুইজন রাজপুত্রের পালঙ্ক যেখানে ছিল সেইখানে রাখিয়া দিল।)

স্বপনপরি : ঘুমপরি! তুই কি আর ইন্দ্রসভায় স্বর্গপুরীতে ফিরতে পারবি? যে তরুণ অরুণকে তাঁবুতে রেখে এলি, তারই মায়া পূর্ব তোরণে চুপ করে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

(হই হই শব্দে রাজার প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল—তাঁবুতে প্রভাতী সানাই—কাড়ানাকাড়া বাজিয়া উঠিল।)

রুদ্রকুমার : কুমার! বন্ধু! বহুক্ষণ হলো প্রভাত হয়েছে, ওঠো।

মদনকুমার : (জাগিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে চাহিয়া) এ কোথায়? এ আমি কোথায় এসেছি? আমার মধুমালা—মধুমালা কই?

রুদ্রকুমার : (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) তোমার বুঝি এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটে নি! কোথাকার কে মধুমালা? (আবার হাসিয়া উঠিল)

মদনকুমার : হ্যাঁ, আমার মধুমালা! সন্দ্বীপের রাজকুমারী, কাঞ্চননগরের বধুরানি, আমার প্রিয় মধুমালা! কে—কে আমায় এখানে আনলে? কোথায় সেই সাগর-ঘেরা দ্বীপ? কোথায় তার সেই সাগর তীরের সোনার পুরী? তুমি—তুমি কে? তোমাকে ত আমি চিনি নে। মধুমালা! মধুমালা!

(রাজপুত্র উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া যাইতে চাহিলেন)।

রুদ্রকুমার : (রাজকুমারকে ধরিয়া ফেলিয়া) বন্ধু! রাজপুত্র! আমি—আমি তোমার সখা রুদ্রকুমার—তোমাদের সেনাপতির পুত্র—আমায় চিনতে পারছ না?

মদনকুমার : (খানিক উন্মাদের মত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া) তুমি? সখা তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে? এর চারিধারে মহাসিন্ধু গভীর গর্জনে নৃত্য করছে—দ্বারে দ্বারে যমদূতের মতো প্রহরী। চুপ—আস্তে—শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে না—হয় হত্যা করবে—না হয় পাষাণ কারাগারে নিক্ষেপ করবে। রাজকন্যার এ ঘরে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু মধুমালা কোথায় গেল! আমার মধুমালা!

রুদ্রকুমার : তুমি কি বলছ সখা? কোথায় মধুমালা! কাল শিকার করতে এসে এইখানে রাত্রে শুয়েছিলে, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে না?

মদনকুমার : শুয়েছিলাম মনে পড়ে, কিন্তু তারপর যে গেলাম আমার মধুমালার দেশে—সেইখানে শুকতারাকে সাক্ষী রেখে আমাদের

মালা বদল হলো—এই দেখো—এই দেখো তার গলার নবলক্ষের রত্নমালা—এই দেখো—তার অঙ্গুরি—এই দেখো তার চন্দন রং চাদর—দেখেছ—দেখেছ। কোথায় গেল আমার মধুমালা—আমার মধুমালা।

রুদ্রকুমার : তাইত! এ কি! কোন্ মায়াধরের খেলা? মায়াপুরীতে আমরা শুয়েছিলোম—শুনেছি হিমালয়ের সানুদেশে অভিশপ্ত এক অরণ্য আছে—সেখানে এলেই লোকে নানারূপ মায়া দেখে—একি তবে সেই রম্য কানন? হে দেবাদিদেব শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ, রক্ষা করো—আমরা অজ্ঞ নিরপরাধ—না জেনে যদি পাপ করে থাকি, সর্ব-পাপ-হর, তুমি ছাড়া কে তা ক্ষমা করবে?—এ কি! এ সোনার পালঙ্ক কার? এ পালঙ্ক ত এখানে ছিল না। অয়স্কান্ত! অয়স্কান্ত!

অয়স্কান্ত : সব দেখছি বন্ধু, সব শুনছি আড়ালে দাঁড়িয়ে। অয়স্কান্ত পয়স্বিনী কামধেনু নয় যে দুইয়ে যা চাইবে তাই পাবে। ব্রজে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীমদনমোহনের বসন বদলের কথা শুনেছিলাম, খাট বদলের কথা ত শুনি নি। আমাদের মদনকুমার তার চেয়ে তিন কাঠি উপরে উঠে গেলেন দেখছি—আংটি বদল, মালা বদল (আর চাদর বদল যখন হয়েছে, তখন আদর বদল না হয়েছে তাই বা কে বলবে?) কিন্তু সব বদলকে হার মানিয়েছে পালঙ্ক বদল। এখন অঙ্ক বদল কলঙ্ক-বদল কত কি বদল দেখবে দাদা! চলো, এখানকার ডেরা যত শিগগির পার ওঠাও। দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে কোনো লাভ হবে না। কাল রাত্রে এখানে এসেই আমার গা কেমন ছমছম করছিল—এ পরির আখড়া না হয়ে যায় না—নইলে বন এমন সাজানো-গোছানো হয়, দেখেছ? বন ত নয় যেন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ! ওঠাও ডেরা—তারপর বাপ-মার নয়নমণি বাপ-মার কোলে ফেলে দাও! গিয়ে পাত্রী খোঁজ, চোখে যৌবনের রং লেগেছে—এখন যে কোনো বধূর মালাকে মধুমালা মনে হবে, চলো।

রুদ্রকুমার : প্রহরী! (প্রণত প্রহরীর প্রবেশ) সৈন্যগণকে আদেশ দাও আমরা এখনই কাঞ্চননগর যাত্রা করব। (প্রহরীর প্রস্থান)

অয়স্কান্ত : হায় হায়, শিকার করতে এসে বিড়ম্বনার আর অন্ত রইল না। রাজকুমারের হাতের শিকার হতে পশুপক্ষী ত অস্বীকার করলই—তারও বাড়া রাজকুমার নিজেই শিকার হয়ে বসলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

[কাঞ্চননগরের রাজপ্রাসাদ। ধূলিধূসরিত মলিনকান্তি উন্মাদ মদনকুমার বসিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া আছেন। আর রাজমহিষী পাটেশ্বরী তাহার গায়ে মাথায় নিবিড় স্নেহ হাত বুলাইতেছেন। পার্শ্বে পরিচারিকাবৃন্দ দাঁড়াইয়া—দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী।]

পাটেশ্বরী : বাবা। লক্ষ্মী সোনা মানিক আমার! পালঙ্কে উঠে বসো—রাতদিন ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে তো মধুমালাকে পাওয়া যাবে না।

মদনকুমার : হ্যাঁ! মধুমালা! মধুমালা! তুমি তাকে দেখেছ? কিন্তু তুমি কে? তোমাকে দেখে আমার এত কান্না পাচ্ছে কেন? তোমাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি—কোথায় কোন বনে!

পাটেশ্বরী : (কাঁদিয়া ফেলিলেন) হায় আমার পোড়া কপাল! তোর মুখে একথা শোনার আগে কেন আমার মরণ হলো না? কে সে রাক্ষুসী মধুমালা—যে আমার ছেলেকে এমন গিলে খেয়েছে—যার মায়ার তুই তোর মা-কে চিনতে পারছিস নে। উঃ! ভগবান!

মদনকুমার : কে! মা? তুমি আমার মা? (ক্ষণিক একদৃষ্টে তাকাইয়া সরোদনে মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল) মা! মা! একি হলো আমার? কেন এমন হলো? সত্যি সত্যি মা, সে মায়াবিনী, নইলে বারো বৎসর ধরে পাষাণপুরীর কারাগারে যে মা আমার বক্ষে ধরে আমায় লালন-পালন করেছেন—এই পাঁচ বৎসর বাইরের আলোকে এসে তাকে আর চিনতে পারিনে! সে সত্যই মায়াবিনী—তার চোখে মায়া—তার রূপে মায়া, তার হাসিতে মধু, তার কান্নায় মধু, তার কেশে বেশে কথায় গানে মধু—তার মালায় মধু—সে মধুমালা! মধুমালা! আমার মধুমালা!

পাটেশ্বরী : (পরিচারিকাদের প্রতি) ছেলে আমার দিশাহারা! তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি হাঁ করে? আমার ছেলে বুঝি সং, না? দে, গোলাপ জলের ছিটে দে, মহারাজকে খবর দে। এখনও রাজবৈদ্য এলেন না কেন?

মদনকুমার : (পরিচারিকাদের প্রতি) তোরা কে? মধুমালার সখি? মধুমালার দেশের গান জানিস?

জনৈক পরিচারিকা : মা! কাল যুবরাজ সারারাত্রি সারাদিন 'মধুমালার দেশ' বলে যে গানটি গেয়েছিলেন আমরা তা শিখে নিয়েছি—আমরা গাইব সে গান?

পাটেশ্বরী : আহা! গা না বাছা! তোদের গান শুনে যদি বাছার আমার একটু জ্ঞান ফিরে আসে।

পরিচারিকাদের গান

কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ?

[রাজকুমার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

মদনকুমার : গাও গাও আবার গাও কোথায় মধুমালার দেশ—

গান

কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ?
যার সাগর মাঝে স্বপনপরী মেঘ-বরণ বেশ
মধুমালার দেশ॥
কোন্ মধু বাসরে এসে
(তাঁরে) দেখেছিলাম রাতের শেষে
(আমি) স্বপ্নে আজও দেখি তারি চন্দন-রং বেশ।
মধুমালার দেশ॥
প্রথম শিকারে গিয়ে বিঁধল বিষের তীর—
সেই কন্যার কাজল মাখা ডাগর আঁখির।
তার নবলক্ষের মালা দোলে
দোল রে মোর প্রাণের তলে
আমি জেগে দেখি স্বপ্নে-দেখা সেই চোখের আবেশ
মধুমালার দেশ॥

রাজা দণ্ডধর : (ব্যাকুল হয়ে অভিভূতের মতো) রানি! পাটেশ্বরী! আমি আমার উপাস্য দেবতা মহাকালের প্রত্যাদেশ পেয়েছি। কাল থেকে সারাদিন সারারাত্রি তাঁর মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম—আমার একমাত্র বংশ-প্রদীপের কেন এ অবস্থা হলো জানবার জন্য। আজ সকালে স্বপ্ন দেখলাম যেন মহাকাল বলছেন, "ওকে আজই সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে সাগর জলে ভাসিয়ে দে। মধুমালাকে নিয়ে সে আবার ফিরে আসবে।" রানি! আজই—আজই ওকে পাঠিয়ে দেবো সাগরপারের দেশে—সাথে যাবে আমার সমস্ত নৌ-সেনা-পদ্মার বুকের সমস্ত তরণী সকল মাঝিমাল্লা। ও যে আমার দেবতার দেওয়া নির্মাল্য—তাঁরই নাম নিয়ে ওকে স্রোতের পথে ভাসিয়ে দাও—দেবতার নির্মাল্য আবার দেবতার শ্রীচরণে এসে ঠেকবে।

[বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠস্বর ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল। রাজা পালঙ্কের উপাধানে মুখ লুকাইলেন]

মদনকুমার : (রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া—বুকের কাছে মুখ রাখিয়া)

বাবা ! বাবামণি ! দেবে ? দেবে আমায় যেতে আমার মধুমালার কাছে—বাবা কি রকম লক্ষ্মীছেলে—দেখেছ মামণি ? তুমি কিন্তু ভারি দুষ্টু—কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাও না। (মায়ের আঁচল লইয়া চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে) মা ! মা ! চেয়ে দেখো, তোমার আঁচল দিয়ে আমার মাথা মুখ মুছছি—এতেই আমার সব আলাই-বালাই দূর হয়ে গেল—এই আঁচলের প্রসাদে আমার বাধা বিঘ্ন উড়ে গেল। ও কি মা ! লক্ষ্মীমেয়ে, কেঁদো না--আমি আবার ফিরে আসব তোমার শ্রীচরণ সেবার দাসী নিয়ে। (বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাবা ! আমি রাজসভায় যাব তোমার সাথে। মা-মণি তুমিও চলো না—আমি তোমার কোলের কাছটিতে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো—রাজ্যসুদ্ধ লোক দেখুক যে, আমি ভালো হয়ে গেছি।

পাটেশ্বরী : ওরে, ওরে মায়াবী ! বলিস নে, বলিস নে, কী করে এই সোনার চাঁদকে আমি সাগর জলে ভাসিয়ে দেবো ? ভাসিয়ে দিয়ে কী করে একলা ঘরে থাকব ? (রাজাকে) ওগো ! তুমি যাও না সৈন্য নিয়ে সেই সাগর-পুরী থেকে জয় করে আনো সেই কন্যাকে—আমি দেখি সেই রাক্ষসের মেয়েকে—তার কত রূপ, কত গুণ, যে আমার কুমারকে এমন পাগল করে !

মদনকুমার : মা ! তুমি বড্ডো হিংসুটে ! একলা বাপের একলা মেয়ে কি না ! চল না মা রাজসভায়, আমার আর ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না !

রাজা : (চোখ টিপিয়া) তাই চল না রানি। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আর দেখ বাবা মদন-মণি ! সেই যে সেকেন্দর শা ফকির, যার জারি গান শুনতে তুমি এত ভালবাসতে, সে তার দলবল নিয়ে এসেছে তুমি অসুস্থ শুনে। আজ রাজসভাতেই তার গান হবে—কেমন শুনবে ত ?

মদনকুমার : সেই সেকেন্দর শা, যার দাড়ি নিয়ে আমি বেণী বাঁধতাম ! নিশ্চয়ই যাব বাবা তার গান শুনতে। বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু, বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু (বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল)

[রাজসভা—সমস্ত সভাসদ বসিয়া আছেন—সেকেন্দর শা তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল]

সেকেন্দর শা : আমাগো রাজকুমার কই—রাজকুমার ? বুড়া অইয়্যা গেছি, চক্ষে আর দেগবার পাই না—

[মদনকুমার ছুটিয়া আসিয়া সেকেন্দর শা'র গলা জড়াইয়া ধরিল]

মদনকুমার : দাদু ! দাদু ! এই যে আমি—

সেকেন্দর শা : (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) দাদুমণি ! দাদুমণি আমার ! কোন্ হালায় কইছেরে আমার সোনার দাদু পাগল হইয়া গেছে? হেই কথা শুইন্যা এই তিনডা দিন কাইন্দা কাইন্দা পথ চলছি না ত দৌড় পাইরা আসিতেছি—এহন আমার সোনার চাঁদ দাদুরে দেখলাম, দেইখ্যা পরানডা জুরাইলাম।

মনদকুমার : (লুকাইয়া চোখ মুছিয়া) কিন্তু দাদু ! এবার তোমার দাড়ি এত ছোট হয়ে গেল কেন? (মাপিয়া) হাঁ চারডা আঙুল ছোট হইয়া গেছে গ্যা ! হ ! হ ! পাতলা ই হইয়া গেছে। এ্যা হে হে হে ! দাদুর আমার দাড়িতে পাক ধরেছে—না না টাক পড়েছে।

সেকেন্দর শা : আর দাদু ! তোমার লাহান যত হালায় টাইন্যা টাইন্যা আমার দাড়ির দফা সাইর‍্যা দিছে। হালায় ছাগলের পালে যেন শাকের ক্ষেত দেখছে !

মদনকুমার : দাদু আমি এখন মার কাছে বসি গিয়ে। তুমি এখন গান শোনাও, কতদিন তোমার গান শুনি নি !

সেকেন্দর শা : হ ! হ ! গাইমুই ত, তোমারে গান হুনাইমু না ত আর কোন্ হালারে হুনামু? হালার যত ছাগলের পাল কয় কিনা দাদু আমার পাগল হয়েছে ! হ ! কই রে ইস্তাজ ! মোস্তাজ বিছুত্যা সব আস্‌ছস্ ত?

দলের সকলে : হয় হয়—হক্কলে ! আইছি আইগ্‌গ্যা !

সেকেন্দর শা : এইবার মহারাজের আইগ্যা লইয়া গান ধরি। সভার সক্কলে মন দিয়া শোনেন। আমি যে গান গাইমু তা আমাদের এই রাজপুত্রের গান। কত দুখ্য দিয়ে আল্লায় এই রাজপুত্তুর দিয়াছেন তারই কাহিনী কইমু—আপনারা দয়া কইরা একটু চুপ কইর‍্যা শুনবেন—গোল করবেন না। আপনারা গোল করলে আমার গানে গোলমাল হইয়া যাইব গিয়া। আপনারা রঙ্গমঞ্চে দরবারে আসরে ভাল ভাল গান শোনেন। আমি মুখ্‌খু সখ্‌খু সেবক, আমার গান আপনাদের ভাল লাগব না, তবু দয়া কইর‍্যা শোনেন যদি তাহলে গরীব দুইটা পয়সা পায়। যদি কেউ দয়া কইর‍্যা কিছু দ্যান, এইখানে ছুইর‍্যা দিবেন। দোহাই, এই বুইর‍্যারে হাতে মারুন সইব, কিন্তু ভাতে মাইরবেন না।

জারির সং ও গান

এই কাঞ্চননগরের বাদশা নাম দণ্ডধর,
একচ্ছত্র রাজপাট যাঁর লাখ লাখ নফর।
রাজার বাড়িতে হলুদ বাঁটে হীরার শিল নোড়াতে—
সোনারূপায় ধরছে ছাতা শুকায় লইয়া ছাতে।
এত থেকেও সুখ নাইরে রাজার একি হৈল।
সাত–সলিতা ঘিয়ের বাতি নাই যেন রে তৈল।
রাজ্যসুদ্ধা কাঁদে যত ছাইল্যা মাইয়া বুড়া।
রাজার এ ধন কে খাইব, রাজা যে আঁটকুড়া।
ভোরে উইঠ্যা দেখে যদি কেউ আঁটকুড়ার মুখ—
সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক।
তাই না শুইনা রাজা দিলেন মন্দিরেতে খিল,
আঁটকুড়া মুখ দেখাইবেন না আর তেনায় এক তিল।
পানের বাটায় পান রইল আপন ঠাঁয় পইর‍্যা,
সোনার গাড়ুর তীর্থের জল কাঁদে ঝইর‍্যা ঝইর‍্যা
তাই না দেইখ্যা দেবতার মনে হইল কিঞ্চিত দয়া
বলেন রাজা ওঠো ওঠো—পুত্র হইব পয়া।
বলেন কি বলেন
তপ্ত সোনার কুমার তোমার ভরবে রাজপুরী
কিন্তু রাজা তাকে পরি করবে বুঝি চুরি।
আঁধার ঘরে রেখো তারে বারোটি বৎসর
পাতালপুরীর মধ্যে রাজা বানাইয়া এক ঘর।
চাঁদ সুরুজ দেখে না যেন তোমার চাঁদের মুখ
বারো বৎসর থাকলে সেথায় কাটবে সকল দুখ।
বারো বৎসর আগে রাজা না খুলিও দ্বার
খুলিলে উদাসী হয়ে ঘুরিবে সংসার।
মদনকুমার নাম রাখিও এই না কবচ লও
(এই) কবচ রানীর গলায় বাইন্দ্যা পুত্রের আশায় রও।
কইব কি সে দুঃখের কথা, সোনার ছাওয়াল লইয়া
পাতালপুরীর মাঝে রাখল পাগল হইয়া।
বারো বছর পূর্ণ হইবার তিনদিন যবে বাকি—
রাজপুত্র ত কাইন্দা কাইন্দা ফুলাইল তার আঁখি।
বলে, মাগো চন্দ্র সূর্য জন্মে দেখলাম নাকো
একটিবার মা দেখবার দাও গো মোর মিনতি রাখো।
কাইন্দা কাইন্দা রাজপুত্রের যায় বুঝি দম ছাইড়্যা।
মনের দুয়ার খুইল্যা দিল হায়রে মায়ার হাইর‍্যা।
সেই নারে রাজপুত্র একদিন শিকারেতে যায়
সৈন্য লস্কর লইয়া রে ভাই কাঁদাইয়া বাপ মায়।
লোকের মুখে শুনলাম হইল শিকারে এক জ্বালা
স্বপ্নেতে রাজকুমার দেখল কন্যা মধুমালা।

মদনকুমার : মধুমালা ! মধুমালা ! আমার মধুমালা (বলিতে বলিতে উন্মাদের মত উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাজকুমার সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন)

রাজা : ওরে ধর্ ধর্—ওকে ধর্—মন্ত্রী ! সেনাপতি। ওকে ধরে রাখ—যেতে দিও না। তুমি কেন মধুমালার কথা বললে শা সাহেব ?

সেকেন্দর শা : তুমি ভয় করো না রাজা। ওর উপরে আল্লার রহম হইছে, ও জীবনের বড়পাতায় প্রেমকে পাইছে—মজনুর মত লায়লিকে পাইছে—ফরহাদের মত শিরিকে পাইছে—এই লায়লিকে যে পায় লা এলাকে পাইতে তার দেরি হয় না।

[পদ্মা নদীর তীর—সপ্তডিঙা মধুকর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—জাহাজভর্তি নৌ-সেনা ও মাঝি-মাল্লা—কূলে পুরনারীরা বরণের ডালা হাতে লইয়া চক্ষু মুছিতেছে।]

মদনকুমার : (পিতামাতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া)
বাবা ! মা ! তাহলে আমি আসি। তোমরা কিচ্ছু ভেবো না—আমি দেবতার কৃপায় আবার ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি অমন করে কেঁদো না—তোমার চোখের জল দেখে গেলে আমার নদী—পথের জল দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

রাজা : জানি পুত্র, স্বয়ং মহাকাল যখন বলেছেন তুমি ফিরে আসবেই—তবু—তবু—(আর বলিতে পারিলেন না—কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।)

রানি : বাবা রুদ্রকুমার ! অয়স্কান্ত ! তোমরা তবে চোখে চোখে রেখো—ছায়ার মত ওর সাথে সাথে থেকো—আমার ঘরের বাতি—অঞ্চলের নিধি তোমাদের হাতে সঁপে দিলুম—শোন নাবিকগণ, মাঝি-মাল্লা সকলে শোন—তোমরা সকলে আমার পুত্র। আমার মনদকুমার রাজপুত্র নয়—যুবরাজ নয়—ওকে মনে করবে তোমাদেরই আর-এক ছোট ভাই।

সকলে : মাগো ! তোমার পায়ের ধুলো দাও আমাদের মাথায়। ঐ চরণধূলির প্রসাদে ওকে আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে এনে দেবো। (তরী চলিয়া যাইতে লাগিল)

রাজা : রানি ! রানি ! তুমি একি করলে ? ও যে দেবতার নির্মাল্য—দেবতার পায়ে সঁপে না দিয়ে ওকে দুর্বল মানুষের হাতে সঁপে দিলে ! মহাকাল আমার উপাস্য দেবতা ! রক্ষা করো, রক্ষা করো ওকে। আমাদের অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা করো !

রানী : আমার মদন-মণি ! আমার কুমার ! আমার খোকা ! ফিরে আয়, ফিরে আয় ! (মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন)

[দূর হইতে সপ্তডিঙার মাঝিদের গান শোনা গেল]
কেউ কইতে পারে, কোথায় আমার মধুমালার দেশ?

[নীল আকাশে সাদা মেঘের মাঝে ফুলপরি শুক্লা একাদশী তিথি চাঁদের গায়ে হেলান দিয়ে গাহিতেছিল]

গান

ঘুমপরি : আমাদের ভাসালে অসীম আকাশে
তোমারে ভাসানু জলে,
স্বপনপরি : মাটির মানুষ বোঝে না বেদনা
বুঝিত দেবতা হলে॥
ঘুমপরি : ওগো সুন্দর তুমি ত জানো না
ভালবাসার কি নিবিড় বেদনা।
স্বপনপরি : জান না ত আমি কাঁদি কত
তোমারে কাঁদাই বলে॥

ঘুমপরি : চল্ দিদি, রাজপুত্রের অবস্থা ত দেখলি—একবার রাজকন্যার অবস্থাটা দেখে আসি—সেই যে বেচারিকে ফেলে এসেছি, একবার ভুলেও দেখতে গেলুম না।

স্বপনপরি : তা সত্যি, সতীনের বুক-চাপড়ানি দেখতে পেলে আমাদের বুকের ব্যথা অনেকটা কমবে—চল্।

(মধুমালার সোনার পুরী)

মধুমালা : (পাগলিনির বেশে) কুমার! কুমার! এই যে সে আমার কাছে ছিল! আমার স্বামী আমার প্রিয়, কোথায়—কোথায় গেল সে?

চন্দনা : স্থির হও। তোমার কুমার? স্বপ্ন কখনও সত্য হয়? কাঞ্চননগর বলে কোনো কালে কোনো দেশের নাম শুনিনি। তার আবার রাজপুত্র—নাম কিনা মদনকুমার!

মধুমালা : এ স্বপ্ন নয় চন্দনা, সাক্ষী আছে ভোরের শুকতারা, পিঞ্জরের শুকসারি আর এই—এই ধানী রঙের উত্তরীয়। তার এই অঙ্গুরি, এই পদ্মমণির মালা এবং সবাই জানে সে এসেছিল—পূর্ণিমার চাঁদ সাগর সিনানে এসেছিল—তারপর চলে গেল ঐ দূর আকাশে।

চন্দনা : সই, এ সব সত্যি, তাই এ নিয়ে রাজ্যময় হুলস্থুল পড়ে গেছে। কিন্তু এই সাগর-ঘেরা দ্বীপে এত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে বিদ্যাধর ছাড়া মানুষ কখনও আসতে পারে না। সই, এখন একটু ঘুমোও, আর কত রাতের পর রাত এমনি জেগে থাকবে?

মধুমালা : সে তো মানুষ নয় চন্দনা, সে যে আকাশের চাঁদ, আমার অন্তর দেবতা। আমি দিবানিশি যে সুন্দরের ধ্যান করেছি এই সাগর-ঘেরা দ্বীপের সোনার পুরীতে সেদিন রাতে সেই সুন্দর এসেছিল রূপ নিয়ে। রাতের তারার মতো সে দিনের আলো সইতে পারে না। (বাতি কমিয়া আসিতে লাগিল) একি আমার চোখে চারিদিক এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? কে-কে আমার বাতি নেভালে? কে-কে তুমি, আমার নিশীথিনীকে এমন অন্ধকারে ঢেকে দিলে? ও! কুমার! তোমার রূপের আলোতে ঘর আলো হবে বলে বুঝি সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছ? লজ্জা? কাকে লজ্জা? ও আমার সই—চন্দনা ওকে আবার লজ্জা কিসের? ওগো শুনছ? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার নাম ধরে ডাক না? কই, কোথায় গেলে? ওগো শুনছ? (বলিতে বলিতে আবেগে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।)

চন্দনা : সই—সই মধুমালা—হায় হায়, কোন দিকে যাই আমি? ওদিকে মহারাজ মহারানি উপোস দিয়ে কাঁদছেন, এদিকে সই মূর্ছিতা! সই—ও সই—(উঠিয়া গিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে জলের পাত্র হস্তে ফিরিয়া আসিল। মধুমালার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়া) কথা বলো—কথা বলো সই! স্বপ্নে যাকে দেখেছ সে বিদ্যাধর ছাড়া কেউ নয়। কুমার কি করে আসবেন এই সাগর-ঘেরা সোনার পুরীতে?

মধুমালা : (চক্ষু উন্মিলিত করিয়া) কি বললে সই, কুমার এসেছে? কোথায় তিনি—কোথায় আমার জনম জনমের স্বামী? কোথায়—

চন্দনা : একটু শান্ত হও সই—মহারাজ মহারানির দিকে ফিরে তাকাও। তোমার এ হাল দেখে তাঁরা উপোস করে পাশের ঘরে কাঁদছেন। তাঁরা এসে তোমাকে কত বোঝালেন। তুমি একটিবার তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলে না—তাঁদের চিনতে পারলে না। একি তাঁদের কম দুঃখ।

মধুমালা : বাবা? মা? কোথায়-কোথায় তাঁরা? বাবা! বাবা!

রাজা : মা মধুমালা! এই যে—এই যে আমি। চন্দনা, রানিকে খবর দে, মধুমালার জ্ঞান ফিরেছে। মা মধুমালা! আমি মদনকুমারের খোঁজে দেশে দেশে লোক পাঠিয়েছি। যে তার খোঁজ এনে দিতে পারবে তাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দেবো। তোমার সোনার পুরীর সকল দুয়ার খুলে দিয়েছি। কোথাও আর কোন প্রহরী নেই। সে যদি আসে কেউ তাকে বারণ করবে না। একটু চুপ করে ঘুমোও মা লক্ষ্মী আমার।

মধুমালা : বুঝলে বাবা সে ভারী দুষ্টু—ভারী চঞ্চল, এবার সে এলে আবার সোনার পুরীর সকল দুয়ার বন্ধ করে দিও। যাওয়ার জায়গায় সাত হাজার প্রহরী বসিও। লোকের পাহারা নয় বাবা, চোখের পাহারা।

রাজা : মা। দিনের মাঝে একবার করে এমনি দুটো কথা বললে যে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তোর মুখের হাসি না দেখলে যে এই সন্দ্বীপের একটি ফুলও ফোটে না মালা।

মধুমালা : ফুল আর ফুটবে কি করে বাবা! ফুলের দেবতা যে এসে চলে গেছেন, সেই অভিমানে ওরা ফুটছে না। আমার মতই সবাই চোখ বুঁজে আছে। সে এলে দেখবে সন্দ্বীপ হয়ে উঠেছে ফুলের রাজ্য।

চন্দনা : (রাজাকে) রানি মা পূজায় বসেছেন—পূজা সেরে এখনি আসছেন। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) তোর লজ্জা করে না বাবার কাছে বরের কথা বলতে?

মধুমালা : (বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) বা রে। বাবার কথা বলতে মা তো লজ্জা করে না। আচ্ছা বাবা, তুমিই বলো তো, বরের কথা যদি বাবা মাকেই না বলব তবে কি অন্য গাঁয়ের লোক ডেকে বলব? আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি বাবা, সে এলে আমি এতটুকু লজ্জা করব না। তোমার সামনেই কথা বলব—রাগ করব, ঝগড়া করব—আচ্ছা বাবা, বর জিনিসটে কি খুব লজ্জার?

রাজা : হ্যাঁ মা, বর যদি বর্বর হয় তবে তার চেয়ে নারীর লজ্জার আর কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে লজ্জা করতে হবে না মা সে এলে আর যে যায় যাবে—আমি পালিয়ে যাব না।

মধুমালা : (সলজ্জভাবে) বাবা! এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কোন্ দেশ বলতে পার?

রাজা : (হাসিয়া) কাঞ্চননগর, না? কিন্তু আমি বলব মা, যে দেশে আমার মা মধুমালা থাকে, তার চেয়ে সুন্দর দেশ ত্রিভুবনে নেই।

মধুমালা : বাবা! কতদূর—কোথায় সেই কাঞ্চননগর? তার পথের ধূলিতে বুঝি সোনার রেণু ছড়ানো? তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ বুঝি লজ্জা পায় তার কুমারের রূপে? কোথায় আমার সেই কাঞ্চননগর? কোথায় সেই কাঞ্চননগরের কুমার?

রাজা : বহু সন্ধান করে সে দেশের খোঁজ পেয়েছি মা। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গারো পর্বতের কাছে সে দেশ। মহারাজাধিরাজ দণ্ডধর সে দেশের অধিপতি। আমি তাঁর কাছে

দূত পাঠিয়েছি মা মদনকুমার নামে যদি তাঁর কোনো পুত্র থাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে এখানে আসবেন। তিনি বাঙালি— আমিও বাঙালি, আমার মধুমালাকে নিশ্চয়ই বধূত্বে বরণ করবেন।

['বাবা' বলিয়া মধুমালা অশ্রুপূর্ণসতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া সানন্দে বাবাকে জড়াইয়া ধরিল। পিতা সস্নেহে সাশ্রুবয়বে কন্যার পৃষ্ঠে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

মধুমালা : (সহসা চমকিয়া উঠিয়া) বাবা! বাবা! সে আসছে—আমার বুকের মাঝে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি-তার আগমনীর বাঁশি বেজে উঠছে আমার প্রাণে।

রাজা : লক্ষ্মী মা আমার, অত উতলা হয়ো না।

মধুমালা : চাঁদ ওঠে সে কোন্ দূর আকাশে, তবু পৃথিবীর সাগরের বুকে জাগে আনন্দ-জোয়ার, সে আর তখন কূলের বন্ধন মানে না। তরঙ্গের পাখা মেলে সে উড়ে যেতে চায় আকাশে। চাঁদ ওঠার খবর সাগর কি করে পায়? কোন আঁধার বনে ফোটে ফুল— ভ্রমর কেমন করে জানেত পারে? আমার চাঁদ উঠেছে দূর-দিগন্তে, তাই ঝিলের জলের কুমদিনীর মতো আমার সারা সঙ্গে জেগেছে না-জানা আনন্দের আবেশ। গোপিনীরা কি করে শুনতে পেত কানুর বাঁশির? আমি শুনেছি—শুনেছি আমার সুন্দরের বাঁশি। নদী যেমন শুনতে পায় সাগরের ডাক, তেমনি তার প্রতি পদক্ষেপে দুলে উঠছে আমার অন্তর। দেবতা জেগেছেন, তাই আমার অন্তর-দেউলের দুয়ার গেছে খুলে, বেদি উঠেছে দুলে। অরুণোদয় হয়েছ—তাই আমার ঘুমন্ত-ভাষা-প্রভাতের পাখির মত মেতে উঠেছে কল-কণ্ঠে। ওগো আমার অনাগত শুভদিনের তরুণ-অরুণ, তোমায় নমস্কার—নমস্কার। (বলিতে বলিতে মূর্ছা)

রাজা : চন্দনা, শিগগির রানীকে খবর দে, মা বুঝি আবার জ্ঞান হারাল। (ব্যস্তসমস্ত হয়ে মধুমালাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

[মেঘনার ও পদ্মার মুখে মদন-কুমারের সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে চলেছে—মাঝিদের গান]

(ওরে ও) পদ্মা নদী বলত পারিস কোথায় মধুমালা?
সাগর ঘেরা সোনার পুরী কাঁদে রাজ-বালা
কোথায় মধুমালা?
(তার) গলায় দোলে রাজপুত্রের গলার পদ্মমণি,
চাঁদের মুখে একটুখানি তাহার লাবনি
পাথার-জলে পা ডুবিয়ে কাঁদে সে নিরালা
কোথায় মধুমালা॥

অয়স্কান্ত : একে মনসা তাতে আবার তোরা ধুনোর গন্ধ দিসনে বাবা। তার চেয়ে গা না—

গান

বোন রে বোন এ কোন্ রূপ দেখালি,
যেন হাঁড়ি মাথায় বেরাণী হোগলা বনের শেয়ালী॥
তাম্বুরা প্রায় পেট রে তাহার জাম্বুরা প্রায় গাল
(তার) চিকন গায়ের ছাল যেন খাজা কাঁঠাল॥
গাঁদালপাতার মালা গলায় দাঁড়িয়েছিল শ্যাওড়াতলায়
অঙ্গ দেখি ঘেঁটু ফুল ভরালি॥

একজন মাঝি : কর্তা! আপনার কথা শুইন্যা শুইন্যা প্যাটের বাঁধন ছিঁইর‍্যা গেল গিয়া, আপনি এ্যাহন ক্ষেমা দেন, এত হাসলে দাঁড় টানার জোর পাইমু না।

মদনকুমার : ঐ—ঐ—কালো মেঘের এলো কেশ দুলিয়ে সে আসছে। ঐ—ঐ—তার ধুলায় ধূসর চন্দন-রঙ উত্তরীয়। আকাশে ঝড় উঠিয়ে সে আসে। আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

মাঝি : হয় হয় হাচাই ত। ওরে ঈশান কোণে মেঘ উঠছে রে, নৌকা তীরে লও—তীরে লও। আর যদি তীরে যাওনের আগে তুফান আইস্যা পড়ে—তাইলে সাবধান। হাল খুব শক্ত কইর‍্যা ধইর‍্যা বইস্যা রইবি—খবরদার হুঁশিয়ার।

অয়স্কান্ত : (ছুটোছুটি করিতেছে) আর খবরদার। ততক্ষণে ঝড় যে এসে পড়ল।

রুদ্রকুমার : সেনা-সামন্ত মাঝি-মাল্লা সব হুঁশিয়ার। প্রাণপণে হাল ধরে থাকবে। নৌকা তীরে নেবার চেষ্টা করো না। তুফান এসে পড়েছে। (ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি তুফান সাইক্লোন—মাঝি-মাল্লার সেনা-সামন্তের কলরোল। সাইক্লোনের বেগে বিপুল আর্ত কোলাহলের মধ্যে সপ্তডিঙা ডুবিয়া যাইতে লাগিল)

মদনকুমার : (উদভ্রান্তের মত) আসে আসে আমার সুন্দর রুদ্রের রূপে আসে। ঐ বিজলি শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক। ধূলি-গৈরিক গগন কোণে দোলে তার চন্দন-রং উত্তরীয়। পুঞ্জিত কালো মেঘে তার কেশভার। ঝঞ্ঝার রাতে অসীম বিরহের আর্ত রোদন-ধ্বনি আমি শুনছি। মরণের মাঝে তোমার আহ্বান আমি শুনেছি মধুমালা—মধুমালা। (জলে ঝম্প প্রদান)।

[পার্বত্য চট্টগ্রাম বা মগ রাজ্যের প্রমোদভবন। সপরিষদ মগরাজ সুরা পানে রত]

মগরাজ : (সুরাপান করিতে করিতে) আমার এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালি মগের মুল্লুক নাম দিয়েছে না, মন্ত্রী? তার চরম প্রতিশোধ আমি কি করে নেব জান?

মন্ত্রী : বাঙলার জলে-স্থলে আমরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছি তারও অধিক শাস্তি আমি ত কল্পনা করতে পারি না মহারাজ।

মগরাজ : পারবে কেমন করে? তা হলে তুমিই রাজা হতে, আমি হতাম তোমার আদেশ পালনের মন্ত্রী।

মন্ত্রী : মহারাজ, আমার কর্তব্য মন্ত্রণা দেওয়া, আদেশ পালনের কর্তব্য সেনাপতির।

মগরাজ : ঐ—যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। যাক, কী শাস্তির কথা বলছিলাম জান? আমার ঐ কুৎসিত কুব্জপৃষ্ঠ অকাট মূর্খ পুত্রের সঙ্গে বাঙলার শ্রেষ্ঠ রাজকন্যার বিবাহ দেবো।

মন্ত্রী : ঐ ছেলেকে দেখে স্বেচ্ছায় কোনো রাজা কেন, প্রজাও কন্যা দান করবে না। তবে যদি জোর করে কেড়ে আনেন সে কথা স্বতন্ত্র।

মগরাজ : জোর করে নয় মন্ত্রী। বলে নয়, ছলে আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবো। আমি ক্ষত্রিয়—কাজেই বাঙালি ক্ষত্রিয় কোনো রাজার আমার পুত্রকে কন্যা দিতে বাধবে না।

মন্ত্রী : তা জানি মহারাজ। বাধবে শুধু আপনার পুত্রের কুঁজে।

মগরাজ : আমি খুঁজে খুঁজে সে কুঁজের ওষুধ বার করেছি সেনাপতি।

সেনাপতি : মহারাজের আদেশ!

মগরাজ : কাল যাকে নদী তীরের বালুচরে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে তাকে এখানে আন।

[বন্দী অবস্থায় মদনকুমারের প্রবেশ]

মন্ত্রী : এ কি! এ সোনার চাঁদকে কোন্ আকাশে জাল পেতে ধরলেন মহারাজ?

মগরাজ : বুদ্ধির জাল পাত্‌তে জানলে চন্দ্র কেন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলকেই ধরা যায় মন্ত্রী—এ ত দুধের ছেলে। সেনাপতি! ওর বন্ধন মুক্ত করে দাও। যুবক! তুমি ঐ আসন গ্রহণ কর। তুমি পথ-শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, খনিক নৃত্য-গীতের বাতাস লাগিয়ে চিত্তকে সুস্থ কর। সেনাপতি! ডাকো মণিপুরী নর্তকীদের। তোমার পান-টান চলে ত হে ছোকরা? দেখে ত রাজার পুত্র—অন্তত সওদাগরের পুত্র বলেই মনে হয়।

মদনকুমার : মহারাজ! আমায় মার্জনা করুন। আমি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান, এসব কখনও খাইনি।

মগরাজ : বল কি হে? যেদিন তোমায় সমুদ্র থেকে তুলেছিল সৈনিকবৃন্দ, সেদিন নাকি তোমার পেট থেকে আধ-সমুদ্দর জল বের করেছিল। আচ্ছা বাবা, সত্যি বলত, অগস্ত্য মুনি কি তোমার মামা-টামা কেউ হতেন?

[নর্তকীদল লইয়া সেনাপতির প্রবেশ]

আচ্ছা, তোমার টিকুজি কুষ্ঠি পরে দেখব, এখন গান শোন। কিন্তু সাদা চোখে কি গান নাচ ভাল লাগে বাবা? অঃ! ভুলে গেছি—তোমার মুখে যে এখনও মাতৃস্তনের গন্ধ লেগে রয়েছে—তুমি এ রসের স্বাদ গ্রহণ করবে কি করে? নাচো বাছা—তোমরা নাচো।

মণিপুরী নৃত্য ও গান

আমরা বনের পাখি বনের দেশে থাকি।
ফিরি পাহাড়ী ফুলের রাঙা পরাগ মাখি॥
মোরা ঝর্না-ধারে ঐ নীল পাহাড়ে—
দেবদারুর শাখার বাঁধি লতান রাখি॥
শুনি বন উদাসী মিঠে পাহাড়ী বাঁশি
মোরা শিস দিয়ে রাখাল ছেলেরে ডাকি॥

মগরাজ : চমৎকার! সুন্দর! সেনাপতি! তোমার আর মন্ত্রীর সাথে আমার কিছু গুপ্ত মন্ত্রণা আছে—আমি চাই এখানে আমরা তিনজন আর ঐ যুবক ছাড়া আর কেউ না থাকে।

[সেনাপতির ইঙ্গিত মন্ত্রী ছাড়া আর সকলে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া গেল]

মগরাজ : শোন মন্ত্রী। আমি গৌড়েশ্বরের লোককে এই ছেলেটিকে দেখিয়ে আমার ছেলে বলে পরিচয় দেবো। ওরা আমার আমন্ত্রণে পাত্র দেখতে এসেছে। (মদনকুমার চমকিয়া উঠিল) কি হে যুবক! তুমি অমন করে চমকে উঠলে যে! তোমায় মারবও না ধরবও না। দিব্যি বঙ্গেশ্বরের জামাই বাবাজী হবে ঘণ্টা কয়েকের জন্য। তারপর ব্যস ছুটি। ওরা তোমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবে—আমার পিতা রাজাধিরাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধীশ্বর শ্রীল শ্রীচক্র সেন, বুঝলে?

মদনকুমার : যদি না বলি!

মগরাজ : 'না' বললে কারাগারে পাঠিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। কিন্তু কেন 'না' বলবে হে নির্বোধ যুবক? তোমার মত পথের ভিখারির এক মুহূর্তের জন্যও রাজপুত্র হওয়া কি কম কথা? ব্যস, এক

পক্ষের মধ্যে বিবাহের দিন স্থির হয়ে যাবে। তুমি বর সেজে বাসর ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে পড়বে। তারপর যা করার আমি করব।

মন্ত্রী : মহারাজ। কিন্তু বাসরঘরে আপনার কুৎসিত কুব্জ পুত্রকে দেখে যখন রাজকন্যা চিৎকার করে উঠবে, তখন?

মগরাজ : তারও উপায় ঠিক করে রেখেছি—কি বল সেনাপতি?

মদনকুমার : কিন্তু মহারাজ আমার মধুমালা—মধুমালার কি হবে?

মগরাজ : আরে মধুমালা নয়, মধুমালা নয়, কন্যার নাম কাঞ্চনমালা।

[চিত্রসেন রাজার পুত্র বিচিত্রকুমারের প্রবেশ। কুব্জ পৃষ্ঠ, নাক মোটা—তোতলা—হাবা—অতি কুৎসিত।]

বিচিত্রকুমার : বাবা! আমার নাকি ইয়ে ইয়ে বিয়ে! আমি বৌ বৌ বৌ দেখব, বৌ-এর কোলে মেনি বেরালটির মত চুপটি করে শুয়ে থাকব। এ সু সু সু সুন্দরি কে?
(মদনকুমারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল)

মগরাজ : বেরো—বেরো আমার সামনে থেকে বলছি—ব্যাটা হাবার ডিম, অকালকুষ্মাণ্ড, কুমড়ো পটল! আরাকান কুলের কলঙ্ক—ব্যাটার চেহারায় আমার রাজ্য উজ্জ্বল হয়ে গেল! খবরদার! এ দুদিনের মধ্যে যদি বাড়ির বের হয়েছিস ত মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

বিচিত্রকুমার : (ক্রন্দনের সুরে) ওমা—মাগো—আমায় মেরে ফেল্‌লে গো—তোমার বি-বি- বিচিত্র কুমড়োকে বাবা কেটে ফেললে গো! মা বললে তোর বিয়ে—টুক-টুক-টুকটুকে-বৌ-বৌ-বৌ আসবে! বাঙ-বাঙ-বাঙলার রাজার লোক এসেছে—আমি তাদের বলে এলুম—আমি তোমাদের কনের বর। তারা শুয়ে বোঁচকা প্যাঁটরা বেঁধে রওয়ানা দিচ্ছে তাই বলতে এলুম—আর আমায় কি না ধকম দেওয়া! (কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

মগরাজ : এই হয়েছে! সেনাপতি! তুমি এখনই যাও—তাদের ফেরাও। বল গিয়ে ও রাজবাড়ির চাকরের ছেলে—হাবা নির্বোধ। ও নিজেকে রাজার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। আর মন্ত্রী—মন্ত্রী তুমি তাড়াতাড়ি এই ছেলেটিকে রাজবেশ পরিয়ে শিখিয়ে—পড়িয়ে নাও! যাও—যাও দেরি করো না, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

রানী বৃশ্চিকা : বলি, কে চাকরের ছেলে? (রানীর পশ্চাতে বিচিত্রকুমার কাঁদিতে ছিল আঁখি ধরিয়া) লজ্জা করে না নিজের ছেলেকে চাকরের ছেলে বলে পরিচয় দিতে? অঃ! পেটপুরে গেলা হয়েছে বুঝি?

তা নইলে এমন জ্ঞানের কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! (ততক্ষণে মগরাজের নেশা প্রায় ছুটিয়া গিয়াছে)

বিচিত্রকুমার : ওগো মা গো! আমি—আমি চাকরের ছেলে হব না গো—আমি আমার বাবার ছেলে মা গো!

রানি বৃশ্চিক : হ্যাঁ, তুই যদি চাকরেরই ছেলে হস, তাহলে তোর মা'র ঐ পা টেপা চাকরের ছেলে। (রাজাকে দেখাইল) বলি, নিজের চেহারাখানা একবার আয়না দিয়ে দেখেছ? আয়না ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করবে যে! ঐ চেহারায় শুয়োর না হয়ে এই ছেলে যে হয়েছে, এই আমার বাবার ভাগ্যি!

মগরাজ : আঃ! রানী কর কি? কর কি? ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে—দেখলে কি বলবে বলত? আমি ত তোমার ছেলের ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছি—দেখত ঐ কোণের ছেলেটিকে—ওটিকে তোমার ছেলে বলে কোলে নিতে ইচ্ছা করে না? এখন ওকেই দেখাব। তারপর বিয়ে চুকে গেলে ও চলে যাবে।

রানি বৃশ্চিকা : আহা! আহা! এ কার ঘরের মানিক গো? কার ঘর আঁধার করে ওকে চুরি করে এনেছ?

মগরাজ : চুরি করে আনি নি—এও সাগরের জলে ভেসে এসেছে। সমুদ্রের বালুচরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমার সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

রানী বৃশ্চিকা : (কাছে গিয়া) তোমার দেশ কোথায় বাবা? তোমার নাম কি? তোমার মা নিশ্চয়ই রাজরানী—নইলে এমন ছেলে পেটে ধরে?

মদনকুমার : (প্রণাম করিয়া) কে তুমি মা এমন করে ডাকলে? তোমার কণ্ঠস্বরে আমার মা-র কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। কতদিন হল তাঁকে হারিয়েছি। আমার মা রাজরানী নয় মা, পথের কাঙালিনী। দারিদ্র্যের তাড়নায় এক বণিকের দাস হয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছিলাম। পথে তুফানে আমাদের জাহাজডুবি হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমি এই রাজপুরীতে বন্দী। কিন্তু মা—আমার মধুমালার পথ যে হারিয়ে গেল।

মগরাজ : ঐ-ঐ দেখ আবার পাগলামি আরম্ভ হল। বেশ থাকে, হঠাৎ মাঝে মাঝে মধুমালা করে কেঁদে ওঠে। মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে।

রানী বৃশ্চিকা : তুমি থাম! জাহাজডুবির সময় তক্তায়-টক্তায় বাছার মাথায় হয়ত লেগেছে। বাবা! চল, তুমি আমার ঘরে শোবে চল! খেয়ে খানিক ঘুমুলে সব ভুলে যাবে দেখে নিও।

বিচিত্রকুমার : ওগো মা গো ! ঐ সুমুন্দীকে নিয়ে এই চাঁদপানা ছেলেকে ফেলে শুয়ো না গো। মাগো ! আমি তোমার কাছে ঘুমুব গো। আমার-আমার বৌকে কি তাহলে ঐ সুমুন্দী বিয়ে করবে নাকি? মা গো—আমার মা-মা-মা-মালঞ্চমালা গো !

রানী বৃশ্চিকা : আঃ ! কাঁদিস নে খোকা ! এ তোর ছোট ভাই, ভাইকে কি ওসব গালমন্দ দিতে আছে? এক মায়ের কি দুই ছেলে থাকে না? (মদনকুমারের মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া চুমু খাইলেন)

বিচিত্রকুমার : ভাই না ছাই—ঐ সুমুন্দীকে ভাই বলতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি যে এতদিন একলা মায়ের একলা পুত ছিলাম। এ শালা ডোক্‌না কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল রে—ওরে আমার মালঞ্চমালা-মা-মা-মালারে—(প্রস্থান)

[বঙ্গেশ্বরের রাজভবনে বাসরঘরে মদনকুমার ও কাঞ্চনমালা পাশাপাশি বসিয়া। পুরনারীদল ঘিরিয়া বসিয়াছে। বাহিরে রোশনচৌকি ও সানাই ইত্যাদির মধুর বাদ্য শোনা যাইতেছে]

একজন পুরমহিলা : আহা ! কি রূপ, এক চাঁদ যেন দু'খণ্ড হয়ে নেমে এসেছে।

অন্য একজন মহিলা : কিন্তু যাই বল দিদি, বরের পাশে কনে যে চাঁদের পাশে তারার মত মিটমিট করছে। সত্যি কথা বলব তার আবার ভয় কি? (কাঞ্চনমালা হাসিয়া বরের আঙুল মটকাইয়া দিল)

মদনকুমার : (বিরস বদনে বসিয়াছিল—তাহার মন চোখ যেন কোন দূরে চলিয়া গিয়াছে। আঙুল মটকাইতে কনের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল উঃ ! (আঙুলে হাত বুলাইতে লাগিল)

জনৈক সখি : কি লো, এখন থেকেই শাসন করছিস? একটু দেখি না ভাই, তার পর ত থাকবিই দু'জনে সারা রাত—এত উতলা হস নে—তোর বরকে কেউ কেড়ে নেবে না।

অন্য একজন : (মুখ ফিরিইয়া) ঐ যে বলে, যে ধনী ধন পায়, দিনে দেখে তারা,—

আর একজন পুরমহিলা : ওলো, মহারাজকে বলে যে এই নাচুনীদের আনলি,—তা দু-একটা গান শুনবি, নাচ দেখবি না বরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ওকে গিলে খাবি? মা গো মা, দেখছে না ত যেন চোখ দিয়ে গিলছে ! গাও গো বাছারা—বরকনেকে ঘিরে দুটো গান গাও, শুনে চলে যাই। আমাদের উনি আবার হা পিত্যেশ করে পথ চেয়ে বসে আছেন।

নর্তকীদের গান ও নাচ

মধুর মধুর! আজি সকলি মধুর!
মধুর মালা গলে মধুর বঁধুর।

মদনকুমার : ও নাম তোমরা কার কাছে শুনলে? মধুমালা—মধুমালা ও নাম তোমাদের কে শেখাল?

জনৈক মহিলা : ওমা জামাই-এর মাথায় ছিট আছে নাকি লা?

জনৈক কিশোরী : মাসি পালাও পালাও—কামড়ে দেবে।

জনৈক মহিলা : আমরা তোদের চক্ষুশূল হয়েছি, না লা? বলি তোতে আমাতে বয়সের তফাত কত যে, ওকথা বলছিস?

অন্য একজন পুরস্ত্রী : আঃ! তোমরা গান শুনতে দেবে—না এমনি কচ্‌কচি করবে?

নর্তকীদের গান

মধুর চাঁদের পাশে মধুর রোহিণী হাসে
মধুর ফুলের মুখে মধু ভরপুর॥
মধুর মিলন রাতি মধুর জাগায় সাথী
মধুরতর হল মধুরতর ওলো
কাছে এসে বিধুর সুদূর।

জনৈক মহিলা : ওলো, বরের চোখমুখ যেন ক্রমেই কেমন হয়ে উঠছে। তোমরা কিছু মনে করো না বাছারা, ওদের একটু একলা থাকতে দাও। (উলু দিতে দিতে সকলের প্রস্থান। দু-একটি ফাজিল মেয়ে উলুধ্বনির সাথে চিৎকার করিয়া উঠিল 'ভল্লু ভল্লু ভল্লু।")

একটি মেয়ে : (কান ধরিয়া) ওর নাম মধুমালা নয় কাঞ্চনমালা—মনে রেখো,—বুঝলে? এই কান ধরে ভাল করে কানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলুম! (সকলের হাস্য)

মদনকুমার : কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ওটি বোধ হয় তোমার কোনো সম্পর্কের বোন—ওর হাতের চেটো ত নয় কেটো। রাজবাড়ির মেয়ের হাত এমন হাতার মত হয়—এ আমার জানা ছিল না।

কাঞ্চনমালা : দাঁড়াও আমি আগে প্রণাম সেরে নিই। (মদনকুমারকে হাত ধরিয়া উঠাইল। বাহির হইতে একজন মেয়ে বলিয়া উঠিল—"ওলো দোরে ভাল করে খিল দে, পালঙ্কের নিচে কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখে নিস। জানালাগুলি বন্ধ করে দে—সব দেখতে পাচ্ছি যে!")

কাঞ্চনমালা : একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

মদনকুমার : বল।

মদনকুমার : তোমায় সব বলছি শোনা। আমি আরাকানের রাজকুমার নই—আমার নামও বিচিত্রকুমার নয়।

কাঞ্চনমালা : (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তাহলে তুমি কে?

মদনকুমার : বস স্থির হয়ে শোন—আমার বেশি সময় নেই—আমাকে এখনি চলে যেতে হবে—হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে সেই মধুমালার সন্ধানে। হয়ত আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। আমি—আমি তোমার স্বামী নই—তোমার স্বামী যে সে এখনি আসবে—অতি কুৎসিত তার চেহারা—তবু সেই তোমার স্বামী।

কাঞ্চনমালা : ওগো! তুমি অমন কথা বলো না। আমার বুক কাঁপছে। আমাকে ধর—আমার মাথা কেমন করছে (মদনকুমার তাড়াতাড়ি বুকে ধরিলেন) আঃ। স্বামী। আমি যে নারায়ণ শিলা স্পর্শ করে তোমাকেই স্বামী বলে বরণ করেছি—শুভদৃষ্টির ক্ষণে তোমারই ঐ সুন্দর মুখ দেখেছি। কুৎসিত হোক সুন্দর হোক—এই ত্রিভুবনে আমার স্বামী আর কেউ নেই, হবে না, হতে পারে না।

মদনকুমার : শোনো তবে আমার সত্য পরিচয়। আমার নাম মদনকুমার। আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ।

কাঞ্চনমালা : তুমি! তুমি সেই সুন্দর—তোমার রূপের খ্যাতি যে আজ বাঙলার ঘরে ঘরে—মুখে মুখে! তোমার বাবা যে আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। আমি যাই, বাবা মাকে বলে আসি।

মনদকুমার : (হাত ধরিয়া) না, তা হতে পারে না। শোন, তুমি হয়ত আমার সব কথাই শুনেছ। আমি মধুমালার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে। পথে জাহাজ ডুবি হয়ে আমার সেনা-সামন্ত সকলে মারা যায়। আমার যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম আমি মগরাজের রাজপুরীতে বন্দী। মগ-রাজপুত্র অতি কুৎসিত বলে রাজা আমাকে দেখিয়ে তোমার সাথে তাঁর পুত্রের সম্বন্ধ ঠিক করেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই শর্ত যে বাসরঘরে ঢুকেই আমি বেরিয়ে পড়ব—তিনি তাঁর সেনা দিয়ে আমাকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এখন তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক করে নিও। ভগবান তোমাকে কুৎসিতের হাত থেকে রক্ষা করুন।

[সহসা দ্বার খুলিয়া প্রস্থান। কাঞ্চনমালা অতি করুণ স্বরে আর্তনাদ করিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। অমনি সেই মুক্ত দ্বার দিয়া বিচিত্রকুমার প্রবেশ করিল]

বিচিত্রকুমার : (উল্লাসে বুক চাপড়াইয়া—চুল ছিঁড়িয়া) ওরে বাপরে, আমি কোথায় বাপরে। রূপ দেখে যে মাথা ঘুরে যায় রে বাবা। কা-কা-কা—কাঞ্চনমালা—মা—মা—লা। আমি এসেছি—আমি তোমার বরটি—তোমার সোয়ামী—তোমার কোলের মেনি বেরালটি।

কাঞ্চনমালা : (জাগিয়া উঠিয়া) কে? কে তুমি কুৎসিত! যাও, দূর হও এখনি আমার সামনে থেকে—নইলে (তরবারি লইয়া) তোমায়—তোমায় আমি হত্যা—হত্যা করব—যাও পালাও—পালাও।

[বাহিরে বহু স্ত্রীকণ্ঠের শব্দ, ওগো, রানী মাগো শীগগির ছুটে এস—কাঞ্চনমালা তার বরকে কেটে ফেললে গো]

(দোর খুলিয়া রানীর প্রবেশ)

রানি : কাঞ্চন! কাঞ্চন! (তরবারি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন)

[বিচিত্রকুমার তত্ক্ষণে পালঙ্কের নিচে লুকাইয়া পড়িয়া পালাইবার দাঁও খুঁজিতেছে]

রানি : ছিঃ ছিঃ। তুই আমাদের কুলে কলঙ্ক দিলি। কলঙ্কিনী! কি করে তুই বাসরঘরে বিয়ের রাতে অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কাটতে গেলি! পোড়ার-মুখি, অমন কার্তিকের মত ছেলেকে দেখেও তোর মন উঠল না? আমি কি করে এ পোড়ার মুখ লোককে দেখাব? কই, আমার সোনার চাঁদ কোথায় গেল?

কাঞ্চনমালা : (কাঁদিয়া ফেলিয়া) মা! সে চলে গেল—চলে গেল! আমি যাকে কাটতে গিয়েছিলাম সে তোমার জামাই নয়।

রানী : কে-কে তবে এল এ ঘরে?

কাঞ্চনমালা : (পালঙ্কের নিচে বিচিত্রকুমারকে দেখাইয়া) ঐ দেখ, নির্বোধ কুৎসিতকে কাটতে গিয়েছিলাম। মগরাজের প্রতারণার কথা তোমাকে সব বলছি—কিন্তু তার আগে ওকে বের করে দাও এখান থেকে।

রানি : উঃ! মাগো! এ হনুমান কোত্থেকে এখানে এল? পাঁড়ে! চৌবে! দৌবারিক!

(সকলে আসিয়া হাজির হইল)

রানি : এই হনুমানের কান ধরে মারতে মারতে রাজার কাছে নিয়ে যাও—তাঁকে বলো, দিদিমণির ঘরে এই চোর চুরি করতে ঢুকেছিল।

[পাঁড়জি চৌবেজি ইত্যাদির বিচিত্রকুমারকে প্রহার ও গালি বর্ষণ—চলরে শালা চোট্টা, চল্ চল্]

বিচিত্রকুমার : আমি চোর না, চোর—তোমাদের রাজকন্যার মনোচোর—তোমাদের রাজার জামাই—জা-জা-মাই! ওগো মাগো, মেরে ফেললে গো!

[গৌড়েশ্বরের রাজপুরী—রাজা সেনাপতি মন্ত্রী ইত্যাদি]

রাজা : শঠ! প্রতারক! মগের মুল্লুকের রাজা কি না পাজির পাঝাড়া। বলে যুদ্ধ করব—ঐ হনুমানের হাতে আমার মেয়েকে দিতে হবে?

সেনাপতি : মহারাজ! ওরা রাজপুরীর তোরণ দ্বার আক্রমণ করেছে। আদেশ দিন, ওদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আসছি—সাগরপারের হনুমানকে সাগরপারে রেখে আসি।

মন্ত্রী : কিন্তু এত বিপুল সৈন্য এল কোত্থেকে? গঙ্গার বক্ষ তার সহস্র রণ-তরী ছেয়ে ফেলেছে।

রাজা : দুর্দণ্ড কি এর জন্য প্রস্তুত না হয়ে এসেছে মনে কর মন্ত্রী? এতদিন বাংলার ভাণ্ডার লুটে যে পাপ সঞ্চয় করেছে আজ তার শাস্তি দেবো—সমুচিত শাস্তি দেবো। যাও সেনাপতি, যুদ্ধ করো—আমিও আসছি। মন্ত্রী, তুমি কুললললনাদের রক্ষা করো—যদি মগ জয়ী হয়—ওদের গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিও। আমি চললাম।

[বাহিরে ভীষণ যুদ্ধের শব্দ]

[রক্তাক্ত কলেবরে রাজার প্রবেশ]

পালিয়েছে। ভিরু পালিয়েছে গঙ্গার পথে। সাগরপারের হনুমান সাগরপারে পালিয়েছে। (বসিয়া পড়িয়া) মা-মা কাঞ্চনমালা, কই, আমার কাঞ্চনমালা কই—আমার সোনার চাঁদ মদনকুমার কই? (মূর্চ্ছা)

[পার্বত্য অরণ্য পথ—বীর বেশধারী রাজার পুত্র মদনকুমার পথ চলিয়াছে]

গান

ও বন-পথ

ওরে নদী কোথায় রে তোর শেষ?
সেই শেষে কি আছে আমার মধুমালার দেশ রে,
মধুমালার দেশ॥
পাহাড় রে তোর কালো কোলে
সাগর ঢেউ-এর মালা দোলে
সেই সাগরের তীরে বসে শুকায় কি তার কেশ
সে শুকায় কি তার কেশ॥

ওরে আকাশ তুই কি নুয়ে
মধুমালায় আসছিস ছুঁয়ে
(দেখি) রঙিন সাঁঝে তোরই মাঝে (তার) পার আলতার রেশ রে
মধুমালার দেশ॥

[গাহিতে গাহিতে মদনকুমার দূরে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ময়ূর-বিমানে চড়িয়া ঘুমপরী ও স্বপনপরী নামিয়া আসিল।]

ঘুমপরি : স্বপ্নদি। আর ওর এ আর্তি দেখতে পারিনে—ওর কান্না শুনে পাষাণ গলে আকাশ টলে সাগর দুলে ওঠে। ফুল ঝরে যায়, বনের পাখি গান ভুলে যায়। চল, ওকে মধুমালার দেশে রেখে আসি।

স্বপনপরি : কি লো, বুক যে টনটন করে উঠল। কিন্তু তুই ত হেরে আছিস। ও এখন আমার।

ঘুমপরি : কখ্‌খনো না, মধুমালার চেয়ে ও অনেক সুন্দর।

স্বপনপরি : তা ত এখন বলবিই। আচ্ছা, ঝগড়া করবার সময় পরে পাব—ঐ দেখ, বেচারা পাহাড়ি-পথ থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। যা, ছুটে গিয়ে বুকে ধর—

[ঘুমপরী ছুটিয়া গিয়া রাজপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে অচেতন রাজকুমারকে ময়ূর-বিমানে লইয়া আসিল। দুই পরী আকাশে গান গাহিতে গাহিতে উধাও হইয়া গেল]

ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান

ফুলের হাওয়া যারে ছুটে মধুমালার দেশ।
যোগিনীরে পরতে বলিস নব বধূর বেশ॥
সোনার ঘটে রাখতে বলিস আকুল চোখের জল
সেই জলেরে ধোওয়াবে সে বঁধুর পদতল
বলিস তারে পা মুছিয়ে বাঁধে যেন কেশ
যেন বাঁধে আকুল-কেশ॥

[গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ—সন্ধ্যা। কাঞ্চনমালা তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিল। তারপর দূরে সন্ধ্যাতারার দিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিল]

গান

তুমি হেসে গেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে
কাঁদতে আমায় দেখে গেলে একলা ফুলের রথে॥
ও পথের বন্ধু! তোমার পথে যদি নিয়ে যেতে
পথের কাঁটা ঢেকে দিতাম আমার এ বুক পেতে
আজ সুখের রথে কাঁদি বন্ধু দুখের সাথী হতে
তোমার দুখের সাথী হতে॥

কাঞ্চনমালার মাতা : তুলসিতলায় ভর—সন্ধ্যায় কে কাঁদে রে?

কাঞ্চনমালা : কাঁদছি কোথায় মা! আমি ত গুনগুন করে গান করছি।

[বলিতে বলিতে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া তুলসিতলায় লুটাইয়া পড়িল]

কাঞ্চনমালার মাতা : (কাঞ্চনের মাথা কোলে লইয়া তাহার এলো চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া ধরা গলায় বলিলেন) তোর চোখ দিয়ে যে দিন রাত গঙ্গা-যমুনার ধারা বয়ে যাচ্ছে মা। দিন রাত কেঁদে কেঁদে কি চেহারা হয়েছে একবার আরশির কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিস? লক্ষ্মী মা আমার, ওঠ, ভর সন্ধ্যায় কাঁদলে বাছার অমঙ্গল হবে। দেশে দেশে লোক ছুটেছে তাকে খুঁজতে। তোর বাবার লোক তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজছে। বন-জঙ্গল পাহাড় জলপথ স্থলপথ চারিদিকে সজাগ পাহারা। সে পালাবে কোথায়—এই সন্ধ্যাবেলায় তুলসিতলায় বসে বলছি—তাকে তুই আবার পাবি।

কাঞ্চনমালা : আচ্ছা মা, বিয়ের রাতে বরকে হারিয়েছে—এমন আর-একটি অভাগিনী তুমি এই বাংলাদেশে দেখেছ? আমি যদি তার মধুমালার মত সুন্দর হতাম সে কখখনো এমন করে ফেলে যেতে পারত না। মাগো, এবার যদি মরি, আশীর্বাদ করো আর জন্মে যেন তার মনের মত হই।

কাঞ্চনমালার মাতা : তুইও ক্ষেপলি নাকি কাঞ্চন? কোথায় মধুমালা? ও নামের কোনো মেয়ে কোথাও আছে নাকি? স্বপ্নের কথা কখনও সত্যি হয়? যেমন পাগল জামাই তেমনি পাগল মেয়ে।

কাঞ্চনমালা : পাগল জামাই, পাগল মেয়ে। কিন্তু পাগল শিব ত কোনদিন গৌরীকে তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেন নি। শিব ভিক্ষা মেগেছেন পার্বতী তার ভিক্ষের ঝুলি বয়ে নিয়ে গেছেন। আমায় কেন উনি তেমনি করে সাথে ডেকে নিলেন না? আমি চাইনে—চাইনে এ রাজভোগ। কে চায় এ রাজপ্রাসাদে থাকতে! সীতার মত কেন তাঁর সাথে যেতে পারলাম না।

[মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগল]

গৌড়েশ্বর : (কান্না ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) রানী! কোথায় তুমি। আমার মা কাঞ্চন কোথায়? শিগগির ছুটে এস, আমার বেয়াই বেয়ান এসেছে—আমার বেয়াই বেয়ান কাঞ্চননগরের রাজা-রানী—কাঞ্চনের শ্বশুর-শাশুড়ি।

[মাতা ও কন্যা তীর বেগে উঠিয়া পড়িলেন। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল]

গৌড়েশ্বর : এই যে বেয়াই! বেয়ান ঠাকরুণ! এদিকে—এদিকে—ঐ তুলসিতলায় মা আমার দাঁড়িয়ে। ঐ—ঐ আমার মা, কাঞ্চনমালা।

দণ্ডধর ও পাটেশ্বরী : কই, কই আমাদের বৌমা কই, বৌমা—বৌমা!

[কাঞ্চন শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করিল]

পাটেশ্বরী : মা গো, পা ছুঁসনে! তুই যে আমার মদনমণির গলার—দেবতার নির্মাল্য। আয় আয় বুকে আয়। বুক আমার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে মা! (বক্ষে ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া) মা-মা-! আঃ!

[কাঞ্চন পাটেশ্বরীর গলা জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা দণ্ডধর দুই হাতে পাগলের মত কাঞ্চনমালার চুলে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে ইঙ্গিত কি যেন বলিল]

দণ্ডধর : বুঝেছি মা লক্ষ্মী, আসনের দরকার হবে না। দেব দেউলের এই অঙ্গনের চেয়ে কোন্ পবিত্র আসন তোর বাবা দেবে রে বেটি? (কাঞ্চন তাহার প্রায় অচৈতন্য শাশুড়ির কোলের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পাটেশ্বরী বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল। মুখে কোন কথা নাই) আহা! মা যেন আমার, মূর্তিমতী সন্ধ্যা ; সন্ধ্যার মতই করুণ স্নিগ্ধ, আনন্দমাখা। ও বেয়ান ঠাকরুণ, ওখানে গরুচোরের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমি যে দেখতেই পাই নি। নমস্কার! নমস্কার! বেয়াই এখানে এসে বস না হে! কাঁদবার অনেক সময় আছে। হ্যাঁ, বুঝলেন বেয়ান ঠাকরুণ! আপনাদের একটু চমকে দেবার জন্যই না বলে কয়ে এসেছি এই সাধারণ নাগরিকের বেশে। আর এখন কি রাজসমারোহ দেখাবার সময়? সোনার চাঁদ কুমার আমার কোথায় পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরছে আর আমরা তার বাপ-মা আসব চতুর্দোলায় চড়ে? কি বল বেয়াই?

গৌড়েশ্বর : আহা! মাকে আমার আজ কী সুন্দরই দেখাচ্ছে! সেই যে বিয়ের দিনে মা ঘোমটা দিয়েছিল তারপর মাথায় আর ঘোমটা ওঠে নি—দেখেছ বেয়াই?

পাটেশ্বরী : পদসেবা করছে? আমার সোনার চাঁদ কুমারের বৌ আমার পদসেবা করছে? সে কি? ওরে-ওরে, তুই যে আমার বুকের মানিক, গলার হার। আয় আয় আমার বুকে আয়। তুই যে আমার গোপালের গলার মালা। হ্যাঁ, আমার গোপালই ত, পুত্র হয়ে, মদনকুমার হয়ে আমার পেটে এসেছিল। তুই যে সেই

গোপালের—আমার সেই নবীন গোরার নিবেদিতা মালা। কি বলছিলাম মা। গোপাল আমার এসেছিল। আমার ঘর ভরেছিল,—বুক ভরেছিল, তার পর সব শূন্য করে চলে গেল।

গৌড়ের রানি : বেয়ান। চলুন, আমার শোবার ঘরে শোবেন। কাঞ্চন! দেখছিস নে তোর শাশুড়ি কেমন করছেন। নিয়ে চল মা ওঁকে উপরে।

কাঞ্চনমালা : (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) মা! (কিন্তু ইহার বেশি সে বলিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

পাটেশ্বরী : ওরে ডাক—ডাক, আবার ডাক! সেই দস্যু কি তোর গলায় তার মা-ডাকখানি রেখে গেছে; ডাক, আবার মা বলে ডাক—আমার মন জুড়াক! ঠিক ঠিক এমনি করে সে আমায় ডাকত—ঠিক তোর মতটি করে আমার গলা জড়িয়ে। বেয়ান—দিদি। বৌমার চাঁদ মুখখানি যে ভাল করে দেখতে পারছি নে। দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপ উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে দাও। আমি দেখি কেমন করে সেই নিষ্ঠুর এমন সোনার কমলকে চোখের জলে ভাসিয়ে গেল। (দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপের শান্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে দেবদেউলের অঙ্গন ভরিয়া গেল। সেই আলোকে দেখা গেল শ্রী শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ যেন রানী পাটেশ্বরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতেছে।) মন্দিরে ও কে! ও কে কাঁদে আমার পানে চেয়ে চেয়ে। ঐ-ঐ আমার গোপাল—আমার মদনকুমার—আমার দস্যু—চোর ধর-ধর ওকে—ও আবার পালিয়ে যাবে—আবার পালিয়ে যাবে। (পাটেশ্বরী শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বক্ষে জড়াইয়া দেব-দেউলের অঙ্গনে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন) ধরেছি। ধরেছি। তোরা সবাই ধর, ও পালিয়ে যেতে চায়—আবার পালিয়ে যেতে চায় দস্যু। চোর। গোপাল। আমার গোপাল।

[কাঞ্চনমালার শয়নকক্ষ। নিশুতি রাত্রি]

[গান করিতে করিতে কিন্তু সে গান নয়। ক্রন্দনও বুঝি অত করুণ হয় না। কাঞ্চনমালা তাহার রাজবেশ আভরণ খুলিতে লাগিল। স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সে যখন গৈরিক বসন পরিল তখন সহসা রাজভবনের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিল। তাহার সখি অতসী দ্বারে অহার এই বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কাঞ্চন অভিভূতের মত গাহিতে লাগিল]

গান

তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে
(ওগো বন্ধু পরান বন্ধু)

তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম
ত্রিভুবনে যত কিছু আমার প্রিয় আছে।
(ওগো বন্ধু পরান বন্ধু)॥
আমার বসন আমার ভূষণ আমার কুল মান
আমার প্রেমের অহঙ্কার গো আমার অভিমান
তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম বন্ধু
(আজ) সকল দিয়ে বিনিময়ে তোমায় শুধু যাচে
দাসী তোমার তোমায় শুধু যাচে
ওগো বন্ধু পরম বন্ধু॥

অতসী : (হাত ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে) এই অন্ধকার নিশীথে এই যোগিনীর বেশ পরে কোথায় যাবি?

কাঞ্চনমালা : এ ত যোগিনীর বেশ নয় অতসী, এ বিয়োগিনীর সাজ। তার সাথে যোগ আমার কখন হল যে যোগিনীর সাজ পরব?

অতসী : যোগ বিয়োগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চনমালা : (চমকিয়া উঠিয়া) ঠিক এমনি করুণ কণ্ঠে সে বিয়ের রাতে আমায় ডেকেছিল। নিজের চিরদিনের শোনা নামও যে নিজের কানে এমন মিষ্টি শোনায় সেইদিন প্রথম বুঝলুম।

অতসী : তুই তারই অভিসারে চলেছিস নাকি?

কাঞ্চনমালা : একে অভিসারই বা বলি কি করে সই? শ্রীরাধাকে তাঁর সুন্দর দেবতা অভিসারের ইঙ্গিত করেছিলেন...আমি ত আমার দেবতার কোন ইঙ্গিত পাই নি।

অতসী : তাহলে তুই কোন্ আশায় কোথায় যাবি?

কাঞ্চনমালা : আশা নেই বলেই ত যাচ্ছি। আশা থাকলে বসে থাকতুম পথের দিকে চেয়ে। আশা থাকলে পথই তাঁকে বয়ে এনে দিত আমার বুকে। যে ফুলের আশা আছে সে দেবতার পুজোয় লাগবে, সেই ফুলই বনের ডালায় ফুটে থাকে—কিন্তু স্রোতের ফুলের আশা কোথায়? স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া তার ত আর কোনো গতি নেই সই!

অতসী : এ সব হেঁয়ালি রাখ দেখি। তুই তাঁকে পথে পথে খুঁজে বেড়াবি এই ত?

কাঞ্চনমালা : আর আমি তাঁকে খুঁজব না। আগে খুঁজব তাঁর পথ। পথ যদি পাই—পথের শেষে তাঁকেও পাব। শোন অতসী, ঐ দেখ আমার ফুল-সাজ সব খুলে রেখেছি। আমার শাশুড়ি জোর করে কাল এসব পরিয়েছিলেন। বিয়ের রাতে এমন ফুলেরি সাজে সেজেছিলুম। কালও পরেছিলুম, ঐ আমার শেষ পরা। পরতে

কি ইচ্ছে করছিল। মন্দিরে বিগ্রহ নেই অথচ নিবেদনের থালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যেমন অকারণ তেমনি করুণ।

অতসী : আমি কিন্তু এখনই কেঁদে চেঁচিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেবো।

কাঞ্চনমালা : (হাসিয়া) কাউকে জাগাতে পারবি নে। সীতা যেদিন বনে গেছিলেন তাঁকে কি তাঁর বাপ-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি ফেরাতে পেরেছিলেন?

অতসী : কিন্তু সে দিন ত শ্রীরামচন্দ্র সীতার সাথে ছিলেন। তোর সাথি কে?

কাঞ্চনমালা : (হাতের নোয়া দেখাইয়া) আমার শ্রীরামচন্দ্রও আমার সাথে আছেন। (কপালে নোয়া ঠেকাইয়া) এই এয়োতির নোয়া যদি আমার হাতে থাকে অতসী—আমার কোনো পথকে—কোনো বনকে কোনো বারণকে ভয় নেই!

[বলিয়া অন্ধকারে পথের মাঝে হারাইয়া গেল]

অতসী : কাঞ্চন! কাঞ্চনমালা! এই অন্ধকারে কে তোকে পথ দেখাবে? (দূর হতে প্রবল কণ্ঠের আওয়াজ আসিল) "আমার প্রেম!"

[সন্দ্বীপ—নিশুতি রাত্রি। আকাশের চাঁদ সাগরের জলে খেলা করিতেছে। মধুমালা-নিদ্রা-নিমগ্না]

দূরাগত ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান

সাগরজলে খেলতে এল তোর আকাশের চাঁদ।
এবার যেন পালিয়ে না যায় বাঁধলো ওরে বাঁধ॥
ঘুমাস্ নে লো ঘুমাস্‌নে আর
চোর এল ঐ ভাঙলো দুয়ার
(এখন) চোরকে বেঁধে বাহুর ডোরে পরান ভরে কাঁদ॥

মধুমালা : (জাগিয়া উঠিয়া) কে? তোমরা কে?

ঘুমপরি : তোমার সতীন।

স্বপনপরি : একজন নয় এক জোড়া।

মধুমালা : এ তোমরা কি বলছ্? তোমরা কে, তোমাদের ত এখানে কখনও দেখি নি। (চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া হাসিয়া) ও। আমি স্বপ্ন দেখছি, না আমি কি বোকা! (চোখ মেলিয়া) তা, তোমাদের সতীন করতে রাজি আছি—যদি আমার পতিকে ফিরে পাই। (চোখ বুজিয়া) যাক, মিথ্যে হোক, তবুও স্বপ্নে তাকে একবার দেখতে পাব।

ঘুমপরি : কি ভাবছ চোখ বুঁজে? চোখ মেলে দেখ তোমার পাশে কে! (চমকিয়া উঠিয়া) এ্যাঁ, তুমি? কুমার? তুমি? চিৎকার করে বাবাকে মাকে ডাকব নাকি? না না, চেঁচালেই ঘুম ভেঙে যাবে, স্বপ্ন যাবে টুটে, আর তুমি যাবে চলে। ওগো, তুমি জাগো, আমি কাউকে ডাকবো না। (ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে) আমি কাঁদব না—জেগে একটিবার একটি শুধু কথা বলে ঘুমোও—আমি আর কিছু বলব না। কিচ্ছু চাইব না। শুধু চেয়ে দেখব! (ঘুমপরী ও স্বপনপরীর দিকে চাহিয়া) তোমরা কে জানি না। তোমরা যেই হও একটু বস না আমার বিছানায়। না না, তোমরা যে সতীন, আমার বিছানায় বসবে কেন? না হয় ওর বিছানাতেই বস। তোমরাই ওঁকে ঘিরে বস। আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

স্বপনপরি : তোমার স্বামী যদি সত্যই জাগেন, তাহলে কি আমাদের এখানে থাকতে দেবে? সত্যি করে বল।

মধুমালা : সত্যি করে বলছি—এই তোমাদের গা ছুঁয়ে বলছি—একি! তোমাদের গায়ে হাত দিতে মনে হল যেন তোমরা ছায়া—তোমাদের দেহ নেই—শুধু রূপ—তোমরা যেন চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া।

স্বপনপরি : এইবার রাজপুত্র জাগবে আমরা যাই। এই শিকারীকে আর ছেড়ো না কিন্তু। এতদিন আমরা আগলে রেখেছিলুম। এবার তোমার গলার হার তোমাকে দিলুম। আমার নাম স্বপনপরী—ওর নাম ঘুমপরী। (বলিতে বলিতে যেন হাওয়ায় তাহারা মিলিয়া গেল। তাহাদের অশরীরী গান মধুমালার স্বর্ণপুরীকে কাঁপাইয়া তুলিল)

গান

বন্ধু বিদায়— !
যাই চলে যাই—তোমার গলার মালা পরায়ে তোমায়॥
ফুল ঝরে পথে হারায়—
অশ্রু ঝরে যে পথে লুকায়
যাই যাই—
যে আঁধার পথে আশার বাতি নিভে যায়।
বন্ধু বিদায়॥

[সহসা বাহিরে প্রহরীদের কোলাহল শোনা গেল। পিঞ্জরের শুকসারি—বনের পাখি ডাকিয়া উঠিল সচকিত স্বরে। "কে গো" "কে গো" বলিয়া ভাব-শিখি ডাকিয়া উঠিল।]

মদনকুমার : আবার আবার, শুনি সেই সাগরের ক্রন্দন। (চক্ষু মুছিয়া) কে? মধুমালা! মধুমালা!

[মধুমালা 'কুমার' 'কুমার' বলিয়া রাজপুত্রের বুকে লুটাইয়া পড়িল]

মধুমালার গান

আমার পায়ের বেড়ি
এই সোনার পুরী ভেঙে
যাওগো নিয়ে তোমার দেশে
পাব সেথায় জেগে
তোমায় পাব সেথায় জেগে॥
এই যে সাগর এই যে কুমার
এই যে তোমার আমি,
এই যে তুমি স্বপ্নে-পাওয়া মধুমালার স্বামী,
(এবার) তোমার হাসির রঙে আঁধার পুরী উঠুক রেঙে।

রানি তিলোত্তমা : কি মা মধুমালা? আজ সকালে এত আনন্দের গান কেন? (মদনকুমারকে দেখিয়া) কে, কে ঐ সুন্দর চাঁদ? ওরে পূর্ণিমার চাঁদ কি আজ সাগর-জলে নেয়ে মালার ঘরে এসে উঠল? দাস-দাসী, প্রহরী কে কোথায় আছিস ছুটে যা—মহারাজকে খবর দে! সারা রাজ্যে খবর দে। মধুমালার বর আন। (দাসদাসী সব উলুধ্বনি দিতে দিতে—শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিল।)

সকলের গান

নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘর
ধরতে গিয়ে দেখি ওলো চোর নয় সে বর!
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥
এ পালিয়েছিল চুরি করে মোদের সখির নিদ্,
(এই) হৃদয়-বনের শিকারীকে নয়ন দিয়ে বিঁধ!
এ যে, ফুলের মালায় বন্দী করে পরাল টোপর॥
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥

(মদনকুমার ও মধুমালাকে ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্যগীতের উৎসব চলিয়াছে। সোনার সিংহাসনে বসিয়া বরবধূর বেশে মধুমালা ও মদনকুমার)

নর্তকীদের গান

অনেক জ্বালা দিয়েছ তার শাস্তি পাবে কালা।
বেঁধেছি তাই গলায় তোমার জড়িয়ে মধুমালা॥

আজ গায়ে পড়ে সাধতে হবে
পায়ে ধরে কাঁদতে হবে
শাপ্‌লা মধু পানের আগে
দেখব বঁধু কেমন লাগে বাবলা জ্বালা॥

রানি তিলোত্তমা : ওরে! তোরা আর ওদের বেশি রাত জাগাসনে। এবার ওদের শুতে দে। দেখছিস্‌ না আমার সোনার চাঁদের মুখখানি যেন রোদের তাতে থল কমলের মত রাঙিয়ে গেছে। লক্ষ্মী মেয়েরা আমার, এবার ওদের শুতে দে।

মেয়েরা : বেশ রানীমা, আমরা যাচ্ছি কিন্তু রাত্রে সুদে আসলে সব আদায় করব বলে দিচ্ছি। (যাইতে যাইতে) চোরের শাস্তি কিন্তু হল না মধুমালা। ভাল করে আগলাস আবার যেন না পালায়) পায়ে টেকো বেঁধে দিস—চোর গরুকে বিশ্বাস নেই।

[সাগরতীরে কাঞ্চনমালার করুণ সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে ছিল। মধুমালা ও মদনকুমার উৎকর্ণ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল)

কাঞ্চনমালার গান

ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ!
এই কি তোমার স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশ!

মধুমালা : ওগো! কে এমন কেঁদে কেঁদে আমার নাম ধরে গান করছে? ওকি, তুমি অমন উতলা হচ্ছ কেন? চল, চল আমার সাথে। ঐ খিড়কির দুয়ার দিয়ে সাগরতীরে গিয়ে দেখি ওকে। তোমার পায়ে, পড়ি, চল না। ওর গান শুনে আমার বুকে এমন কান্নার জোয়ার এল কেন? চল চল।

(মদনকুমার ও মধুমালা নীরবে দাসদাসী প্রভৃতির চোখ এড়াইয়া খিড়কি-দ্বার দিয়া সাগরতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একবুক সাগর-জলে দাঁড়াইয়া গৈরিক বেশধারিণী এক সন্ন্যাসিনী। তাহার রূপের জ্যোতিতে আর গৈরিক বসনের, আভায় চারপাশের সাগর জল গেরুয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে ইহাদের পানে চাহিয়াও দেখিল না। নয়ন মুদিয়া সে যেন মহাসাগরের গান শুনিতেছে। মদনকুমার ও মধুমালা ছায়ামূর্তির মত দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল।)

গান

ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ?
এই কি তোমার স্বপ্নে-দেখা মধুমালার দেশ?
মহাসাগর! সাক্ষী থেকো! আমার কথা বলো
তার বিবাহের লগ্নে আমার যাবার সময় হল।

সে তার পথ পেল যখন পথ হরালাম আমি তখন
যে আমায় আনল পথে সে আজ নিরুদ্দেশ॥
তোমার শীতল জলে
তোমার অতল তলে
জুড়াও ওগো জুড়াও আমার সকল ক্লেশ॥

মধুমালা : কে? কে তুমি যোগিনী? মহাসাগরের বুকে এমন রোদনের জোয়ার আনলে? (সন্ন্যাসিনী যেন ধ্যান-রতা)

মদনকুমার : ডেকো না মধুমালা, ওকে ডেকো না। মহাসগর যাকে ডাক দিয়েছে, তীরের ক্ষুদ্র মানুষ তাকে ডেকে সাড়া পাব না মধুমালা।

মধুমালা : তুমি অমন উতলা হয়ে উঠছ কেন? তেমার চোখে জল কেন। তুমি কি তাহলে ওঁকে চেন। তবে কি—তবে কি ইনিই সেই দেবী যাঁর আসার কথা ঘুমপরী বলেছেন। যাঁর সাথে তোমার অপরূপ বিবাহের কথা বলেছিলে। উনিই—ঐ দেবীই কি তাহলে আমার দিদি। (চিৎকার করিয়া জলে নামিতে নামিতে) দিদি দিদি। আমি-আমি মধুমালা, তোমার ছোট বোন—তোমাকে নিতে এসেছি। তোমার সাগর জলের চাঁদ ঐ-ঐ কূলে দাঁড়িয়ে তোমার স্তব শুনছেন। যেয়ো না—যেয়ো না—যেয়ো না—আমায় প্রণাম করার অবকাশ দাও। (কাঞ্চনমালা উঠিয়া আসিয়া মধুমালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন)।

কাঞ্চনমালা : চল্ তীরে উঠি। যে তীর্থ দেবতার দর্শনের আশায় এই পথের শেষে পৌঁছলুম, তাঁকে প্রণাম না করে গেলে যে আমার জলে স্নান করার আনন্দ হবে না। সত্যি, কি সুন্দর মধুমালা। আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে—ও ত পুরুষ মানুষ। তোকে দেখে আমার আজ কোনো দুঃখ রইল না মধু (কাঞ্চনমালা মধুমালার মুখচুম্বন করিলেন)।

মধুমালা : (হেসে) আমি সন্তুষ্ট হলাম, তুমি আমার মুখে চুম্বন করলে। আর কি ভাবনার আছে। আাজ থেকে তোমায় দিদি বলে ডাকব।

কাঞ্চনমালা : ও কথা তুই কেন মনে করলি মধুমালা। অর্জুনের মত স্বামী পেয়েছিলেন বলেই দ্রৌপদী সুভদ্রাকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মত পতি পেয়েছিলেন বলেই রুক্মিনী তাঁর পতিকে পরিপূর্ণ চিত্তে সত্যভামার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মধুমালা : তাহলে তেমনি করে—তেমনি করে তুমি আমায় বরণ করে তুলে তোমার পায়ের দাসী করে রাখ না দিদি।

কাঞ্চনমালা : যদি ঘর আমাকে আশ্রয় দিত তাহলে তাই করতাম মধুমালা। আর ভাল হয়ত তোর স্বামীর চেয়েও বাসতাম।

মধুমালা : এখনও তোমার ওঁর উপরে অভিমান যায় নি দিদি। নইলে "আমার স্বামী" না বলে "তোর স্বামী" বললে কেন।

কাঞ্চনমালা : কার উপরে অভিমান করব মালা। আমি কি ওকে একটু কালের দেখা ছাড়া কখনও দেখেছি যে অভিমান করব। উনি কি আমায় কোনোদিন সে অধিকার দিয়েছেন। তবু সে কি আকর্ষণ, মধু, তা তুই হয়ত বুঝবি নে। সাগর কত জোরে টানলে সে নদী পাহাড় জঙ্গল ভেঙে তার বুকে ছুটে আসে তা নদী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

মধুমালা : দিদি একটু কূলে ওঠো না, আমি যে তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারছি নে।

কাঞ্চনমালা : কূলেই ত বসেছিলুম বহুদিন বহুবর্ষ। সেখানে যখন তাকে দেখলাম না তখনই ত অকূলের পথে পাড়ি দিলুম বোন। বাঙালির মেয়ে যত সাধু উদ্দেশ্যেই বুকে করে একবার কূলের বাইরে পা বাড়াক না আর কি সে কূলে ফিরে যেতে পারে?

মধুমালা : কিন্তু কূলে ত তোমায় উঠতেই হবে—তাঁকে প্রণাম করতে, তখন যদি আমি ছেড়ে না দিই?

কাঞ্চনমালা : যে নদী সকল পথের বাধা-ডিঙিয়ে সাগরে মিলতে এল তাকে মিলন-মোহনার মুখে আটকাবি মনে করিস? তুই বড্ডো ছেলেমানুষ। আহা। মুখখানা কি কাঁচা।

মধুমালা : আর তোমার মুখ বুঝি কাঁচা নয়? তোমার কথাগুলোই যা পাকা আর সব কাঁচা! দিদি! তোমাকে এই অবস্থায় চাঁদের আলোতে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র মন্থনের শেষে লক্ষ্মীদেবী সাগর সিনান করে উঠেছেন।

কাঞ্চনমালা : কিন্তু তিনি উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে। আর আমি উঠেছি বেদনার সিন্ধু মন্থনের শেষে অশ্রু লক্ষ্মীরূপে। তাই ত তোদের অমৃতের সংসারকে লবণাক্ত করতে চাইনে! দেরি হয়ে গেল মালা। ওঁকে একবার জলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে বলবি।

মদনকুমার : কাঞ্চন! কাঞ্চনমালা! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর আমি আর সইতে পারছি নে। আমি সে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি তুমি এই সুদূর পথ এমন করে একা অতিক্রম করতে পারবে।

কাঞ্চনমালা : তুমি মধুমালাকে স্বপ্নে দেখে যদি এই দূর পথ অতিক্রম করতে পার আর আমি আমার স্বামীকে বরণ-ডালার পঞ্চপ্রদীপের আলোকশিখায় দেখে সেই পথ পার হতে পারব না?

মদনকুমার : কিন্তু আমি—আমি তোমার কে কাঞ্চন? আমি—আমি ত স্বামীত্বের অভিনয় করেছিলুম—বরবেশে এসেছিলুম।

কাঞ্চনমালা : স্ত্রীর স্বামী বর সেজেই আসেন। তুমি আমার কে তাই জিজ্ঞাসা করছিলে না? শোন, এই মহাসাগরে শুয়ে থাকেন যে পাষাণের নারায়ণ—সেই নারায়ণ শিলাকে সাক্ষী করে বিবাহের দিন যা বলেছিলাম আজও আবার তাই বলছি। তুমিই আমার স্বামী, আমার ইহলোক পরলোক জনম জনমের গতি—পরম পতি—আমার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা, তোমাকেই ধ্রুবতারা করে এই মহাসাগরের মিলনমোহনায় বিনা বাধায় এসে পৌঁছেছি। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) লক্ষ্মী-নারায়ণকে একসঙ্গে দেখলাম। সত্যি মালা, তোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাগর মন্থনের শেষের লক্ষ্মীশ্রী।

মধুমালা : (তাহার চোখে মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাইতেছিল) লক্ষ্মী উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে বেদনায় সিন্ধু-মন্থনের শেষে আমি উঠেছি অশ্রুলক্ষ্মীরূপে। দিদি, তোমাদের অমৃতে সংসারকে আমি লবণাক্ত করতে চাইনে। (সাগরজলে ঝম্প প্রদান)।

কাঞ্চনমালা : মালা! এ কি করলি তুই?

মধুমালা : (আর্তকণ্ঠে) হে আমার চির জনমের স্বামী—প্রণাম! প্রণাম॥

কাঞ্চনমালা : মালা-মালা-মধুমালা—

বনের বেদে

প্রথম খণ্ড

গান

ছন্ন-ছাড়া বেদের দল আয়রে আয়।
কাল-বোশেখীর ঝড়-তুফান
আনরে তোর দৃপ্ত পায়॥
বর্শা কই তীর ধনুক
কাঁপিয়ে তোল মাটির বুক
হুমড়ি খেয়ে নীল-আকাশ
দেখরে মোদের সঙ্গ চায়॥

সর্দার—ঝুমরো !

ঝুমরো—সর্দার !

সর্দার—এই পাহাড়-তলীর বন। এইখানে আমাদের কিছু দিন থাকতে হবে। উঁচু-মাথা আমার হেঁট করেছে—সে শয়তানকে এই দুনিয়া থেকে সরাতেই হবে। এই বনে সে ডেরা গেড়েছে, আমি খবর পেয়েছি—তাকে খুঁজে বের করতেই হবে—এই বন আমি পাঁতি পাঁতি করে খুঁজবো—কোথায় সে লুকিয়ে থাকবে ? তোরা এইখানেই তাঁবু ফেল—আমি আসছি।

ঝুমরো—আচ্ছা সর্দার। কী সুন্দর এই বন ! যেন আমার কত কালের চেনা। কী মিষ্টি বাতাস এ বনের—কী মিষ্টি এখানকার পাখির গান। আহা কারা গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে—

'আয়লো বনের বেদিনী আয় আয় আয়।
সিন্ধুতে তটিনীতে জাগায়ে তরঙ্গ
কাঁপাইয়া মেদিনী॥'

দ্বিতীয় খণ্ড

'আকাশের ঘোমটা ধরে টান
তার কোলের খোকা চাঁদকে ধরে আন
মেঘের ঝাঁপি খুলে নাচাবি বিজলি-সাপিনী॥

নিশি-রাতের আঁচল থেকে কুসুম কেড়ে নে
তৃষ্ণা মিটা লো নিংড়ে পাহাড় ঝর্ণা এনে
গলার মালা আন সাগর ছেঁচে
আয় বনের ঘাগরী পরে ঘূর্ণি নেচে
আঁখির চাওয়ায় লুটাবে পাখি
বিষ হারাবে কাল-নাগিনী ॥'

মৌরী—মিতিন! দেখেছিস একটা লোক লুকিয়ে আমাদের দেখচে—চল আমরা চলে যাই—

ঝুমরো— হাসে নাচে গায়, ঝাঁক বেঁধে যায় জংলা পাখি।
বিঁধবো কারে তীর দিয়ে গো, কারে পিঁজরায় রাখি ॥

নিঠুর আমার খেলা
দিনের বেলা আঘাত হেনে
কাঁদি রাতের বেলা
যেন সুন্দর-বনের বাঘ চমকে ওঠে
দেখে বন-হরিণীর ডাগর আঁখি ॥

তৃতীয় খণ্ড

মৌরী—বেদের দুলাল! তুই পাখি শিকার করিস কেন?
ঝুমরো—বেদের মেয়ে! তুই সাপ নাচাস কেন?
মৌরী—সাপ নাচাই? সাপের মত চোখ যার—তাকে বশ করতে—শুনবি—
'বাঁকা-ছুরির মত বেঁকে উঠলো যে তার আঁখি?
বেদের দুলাল আমার সাথে সাপ খেলাবি নাকি?
তোর জোড়া-ভুরুর ধনু আমি চিনি
পাখি আমি নই বেদিয়া আমি যে সাপিনী
ভয় করি না হাসিকে
ডর লাগে তোর বাঁশিকে
তোর মনের ঝাঁপি খোলা পেলে সেথায় গিয়ে থাকি ॥

মৌরী—শুনলি তো? আচ্ছা বেদের-দুলাল তুই ফুল পাড়তে পারিস—ওই গাছের আগায় কত ফুল দেখেছিস—আমায় পেড়ে দিবি?
ঝুমরো—ফুলের দাম দিবি তো?

মৌরী—দাম? যা!

ঝুমরো—আচ্ছা দাম নাই দিলি—আমি যে ফুল পেড়ে দেব—তাই দিয়ে বিনি সূতোর মালা গেঁথে আমায় দিবি তো?

মৌরী—বারে! তা হলে তো দাম দেওয়া হয়েই গেল। দাম পেলে চলে যাবি—আর দাম না পেলে পাওয়ার আশায় আবার ফিরে আসবি।

ঝুমরো—ফিরে এলে যদি দেখা পাই—তাহলে দাম চাইনে—তাহলে কাল আবার ফিরে আসবো?

মৌরী—জানি না!

ঝুমরো—(তীর ছোঁড়া ও ফুল পাড়ার শব্দ) এই নে একডাল ফুল তীর দিয়ে পেড়ে দিলাম—তোর আঁচলের ডালি কই?

চতুর্থ খণ্ড

মৌরী—চুপ, ঝোঁপের আড়ালে মিতিন আড়ি পেতে রয়েছে—

ঝুমরো—তুই চুপ করে আমার পানে চেয়ে থাক—

'নিম-ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা
মিঠে হাসির নূপুর বাজাও গো ঝুমুর নাচো তোমরা
কভু কেয়া কাঁটায় কভু বাবলা আঠায়
বারে বারে প্রজাপতির পাখা জড়ায়
দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে ফুলের দেশের বৌ-রা।

মৌরী—যাঃ! মিতিন সব দেখে ফেলেছে—কী লজ্জা—আমি পালাই—

ঝুমরো—তা হলে আমিও যাই—হ্যাঁ ভাল কথা—বেদের মেয়ে তোর নাম?

মৌরী—আমার নাম মৌরী—বেদের ছেলে তোর নাম?

ঝুমরো—আমার নাম ঝুমরো—

মৌরী—আবার আসিস

পঞ্চম খণ্ড

মৌরী—মিতিন! ওই সে পাহাড়-চূড়োয় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে—তুই যা ওকে ডেকে আন—আজ দু বেলা ওকে দেখিনি। আমি বসে গাই, সে শুনতে পাবে আমার মাথার দিব্বি দিয়ে তাকে একবার আসতে বল—

'নিশি ভোরের বেলা কাহার পাহাড়ী-বাঁশি বাজে।
তার বাঁশরির সুর-বেদের নিঠুর তীরের মত আসি বাজে॥
আমি তো নহি বনের পাখি
গাঁয়ের কন্যা ভিন গাঁয়ে থাকি
কেন নূপুর বাজায়ে কুসুম ঝরায়ে ঘুম ভাঙায়ে চলে যায়
সে উদাসী বন-মাঝে॥

আসি রোজ সকালে আমার চাঁপার ডালে
কী যেন বেড়ায় খুঁজি
চাঁপার কলি দেখে অমনি দাঁড়ায় বেঁকে
সোনার নূপুর ভাবে বুঝি !
দূরে ত্রিকূট পাহাড়-চূড়াতে
ভোরের চাঁদ কাঁদে আমার সাথে
নিশীথে নিদ্রাহীন—আনমনা সারাদিন
মন লাগে না গৃহকাজে॥

ষষ্ঠ খণ্ড

ঝুমরো—একি মৌরী তুই কাঁদছিস? কী হয়েছে তোর?

মৌরী—কী হয়েছে তোর? কেন এসেছিলি তুই আমার সামনে—কেন হেসেছিলি—কেন তুই...

ঝুমরো—ও! তাই বল—আসতে দেরি হয়েছে বলে—শোন আমাদের সর্দারকে লুকিয়ে আসতে হয় কি না তাই—আচ্ছা আমি আজই সর্দারকে বলে তার দল ছেড়ে দিয়ে তোকে নিয়ে ঘর বাঁধবো—তুই আর কাঁদিসনি—আমি তোকে ছেড়ে যাবো না—যাবো না...

সর্দার—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ তোকে ছেড়ে যাবো না—তোকে নিয়ে ঘর বাঁধবো—ঝুমরো—তুই জানিস বেদেরা ঘর বাঁধে না—ঘর তাদের বাঁধতে মানা—সারা দুনিয়াটাই তাদের ঘর..আর কার সাথে তোর মিতালী—আমার দুশমন সেই রঘু-সর্দারের মেয়ের সাথে—ঠিক করেছিস—যে আগুন সে আমার বুকে জ্বেলেছে—সেই আগুন রেখে গেলাম তার মেয়ের বুকে জ্বেলে—চল এখুনি আমরা এ বন ছেড়ে চলে যাব।

মৌরী—ওগো কার পাপে কার সাজা—ওকে নিয়ে যেও না—ওকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না...

সর্দার—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ প্রতিশোধ—বেদের প্রতিশোধ—উঠাও ডেরা—

মৌরী—উঃ... মাঃ—

'উঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে।
নিবিড় হলে মনের বাঁধন
গভীর ব্যথা পেতে হবে॥
কোথায় শূন্য মরুভূমি
ডাকো মোদের ডাকো তুমি
চিড়িয়াখানায় সিংহ গেলে
নিঠুর চাবুক খেতে হবে

'বেদের মেয়ের চোখের জল বনের ঝরা ফুল
বেদের মেয়ে কাঁদে ভাসে নদীর দুকূল।

বিয়ে-বাড়ি

বিয়ে-বাড়ি

('প্রীতি-উপহার' সেট রেকর্ডের কথা ও গাথা)

[১]

ভোর থেকেই শানাই-এর করুণ অথচ মধুর তান উৎসবের সূচনা জানিয়ে দিচ্ছে।

বাঙালি ঘরের বিয়ে-বাড়ি।

শুরু হয়েছে লোকজনের আনাগোনা, হাঁক-ডাক, ব্যস্ততা। ছাদে টাঙানো হলো শামিয়ানার মণ্ডপ, দুয়ারে সাজানো হলো নব-পল্লব। দলে দলে আসছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত—চলেছে অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন। চাকর-বাকরদের বিশ্রাম নেই, ঘন ঘন আসছে ডিবে-ভরা পান আর কল্‌কে-ভরা সুগন্ধি তামাক। বাড়িতে এসেছে নববধূ, তাই বধূ বরণের জন্য এত আয়োজন, এত সমারোহ।

গৃহস্বামী অর্থাৎ বরের বাপকে আপনারা অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারেন। মোটাসোটা নধর দেহ, পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর প্রশস্ত টাক। তাঁর ভুঁড়ির পরিধি দেখেই মনে হয়, তাকিয়া ঠেস দেওয়া অভ্যাস, আর টাক দেখে আপনারা নিশ্চয়ই চিনেছেন, ইনি টাকাওয়ালা লোক।

বাড়ির কর্তা তিনি, সুতরাং কাজ আর কথার ভিড়ে তাঁর আর অবকাশ নেই। গায়ের গেঞ্জি তাঁর ঘামে ভিজে গেছে, কাঁধে একখানা তোয়ালে, কোঁচাটি গুটানো।

এই দেখা গেল, চোখে চশমা এঁটে পেন্সিল হাতে তিনি বাজারের ফর্দ দেখছেন, পরক্ষণেই দেখতে পাবেন, অমায়িক হেসে বিনয়-নম্র কণ্ঠে নবাগত কোনো অভ্যাগতকে বলছেন—'আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার ...' সে কথা অসমাপ্ত রেখেই আবার হয়তো তিনি চিৎকার করতে করতে অন্দরের দিকে ছুটলেন—'ওরে রাম্মা, তামাক দিয়ে গেলি না এখনো ...'

অন্দরে তখন নতুন বৌকে ঘিরে মেয়ে মজলিস বসেছে এবং সেই মজলিস সরগরম করে তুলেছেন বরের মা।

বনিয়াদী পরিবারের গিন্নি, গৌরাঙ্গী, চেহারায় স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতায় লাবণ্য।

বয়স একটু হয়েছে বৈ কি—চল্লিশের কাছাকাছি, তবু অস্তমিত যৌবনের শেষ আভাটুকু এখনো উজ্জ্বল করে রেখেছে তাঁর দেহ। গরদের শাড়ির চওড়া লাল-পাড়ের নীচে আয়ত দুটি চোখের তারায় আর পানে-রাঙা ঠোঁটের কিনারে প্রফুল্লতা টলটল করছে।

পাড়ার মেয়েদের তিনি হেসে বৌ দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু অদূরে যে তাঁর নতুন বেয়াই এসে দাঁড়িয়েছেন, সেদিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি।

নতুন বেয়াই মৃদু হেসে সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে ডাকলেন—

'বেয়ান! বলি ও বেয়ান!

আলাপের যে ফুরসৎই নেই, এসো, এসো, এসো বেয়ান।

(আহা) বেয়ান যেন জিয়ান রসের কড়া-পাকের ভিয়ান!'

কিন্তু কথায় হটবার পাত্রী বেয়ান নন। ঘোমটাখানি কপালের নিচে আর একটু নামিয়ে দিয়ে বেয়ান জনান্তিকে বললেন—

'রসের কথা কে বলে ও? ময়রা মিনসে বুঝি?'

তারপর যেন নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়েছে, এই ভাব দেখিয়ে বললেন—

'কে ও? বেয়াই? মাফ করো ভাই,

গরু-খোঁজা করে আমি তোমায় ফিরছি খুঁজি!'

এই সময়ে বাইরে থেকে ব্যস্ত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—

'ওগো গিন্নি, আরে, গিন্নি কোথায় গো?'

বরের বাপ অন্দর-মহলে ঢুকেই থমকে দাড়িয়ে গিন্নিকে বললেন—

'ও, বেয়াই-এর সঙ্গে ভিড়ে গেছ বুঝি?'

কিন্তু রসিকতায় তিনিও কম যান না। উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে বলে উঠলেন—

'আহা, এরা যেন রাধাকেষ্ট, আমি মাঝে আয়ান।'

মেয়ের বাপ উকিল, কথার ব্যবসা করেন। কিন্তু তবু আজ নতুন-পাওয়া সুরসিকা বেয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে, কড়া হাকিমের সুমুখে কাঁচা-উকিলের মতোই তাঁর কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি নতুন বেয়াইকে বললেন—

'বেয়াই, হাবাগোবা, গোবেচারি দেখতে মোদের এ বেয়ান,

কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার ঘোড়েল শেয়ান।'

বেয়ানও এর পাল্টা দিলেন—

'বেয়াই, তুমি জানো-য়ার লোক, অর্থাৎ জানো অনেক কিছু,

ল্যাজের মতন উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু!

আমরা মুখ্খু-সুখ্খু পাড়াগেঁয়ে, নেই তো তেমন বুদ্ধিগেয়ান।'

বরের বাপ দেখলেন রসালাপ জমে উঠেছে মন্দ নয়। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন—

'দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জমে না ভালো।'

মেয়ের বাপ এবার একটু লজ্জিত হয়ে চাপা গলায় বললেন—

'আমার গিন্নি? আরে রাম! কদা, কুচ্ছিৎ, কালো।'

কথাটা কিন্তু নতুন বেয়ানেরও কানে গিয়েছিল। খোসামোদপ্রিয়তার দিক থেকে মেয়েদের সঙ্গে অপিসের বড়বাবুদের তুলনা করা যেতে পারে। এক বেয়ানের নিন্দা করা

মানেই আর এক বেয়ানের স্তুতিবাদ। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে এইখানেই। নতুন বেয়ান মনে মনে খুশি হয়ে বেয়াইকে বললেন—

'খাসা তোমার মুখ মিষ্টি,
কথা ত নয়, সুধাবৃষ্টি।'

বরের বাপ দরাজ হাসির শব্দে অন্দর-মহল মুখরিত করে বলে উঠলেন—

'কারণ, তুমি বর্তমানে বেই-মশায়ের খেয়াল॥'

[২]

নিশীথ-রাত্রি !

ফুল-শয্যার কাজ চুকে গেছে, থেমেছে কোলাহল, শঙ্খ আর উলুধ্বনি। উৎসবের বাতি এসেছে স্তিমিত হয়ে। সারা বাড়িটার চোখে এখন শ্রান্তির তন্দ্রা। নিরালা ঘরে ফুল-শয্যায় বর আর বধূ বসে।

বাসর-রাতে প্রথম পরিচয়ের অবসর ছিল না। শ্যালিকা আর সখিদের হাসি, গান, কৌতুক-আলাপনের মাঝে তাদের দু'জনের ভিরু কথা গিয়েছিল হারিয়ে।

কিন্তু আজ এসেছে চুপি-চুপি কথা কইবার লগ্ন, পরস্পরকে পেয়েছেও একান্ত নিকটে। জীবনের এই মিলন-মদির সৌরভ-সুন্দর রাত্রিটি কি এমনি নীরবেই কেটে যাবে? তাই দু'জনের চোখে নেই আজ ঘুম!

ফিকে-নীল বাতির আলোয় নব-বধূর লাজ-রক্তিম চন্দন-পরা মুখের পানে তাকিয়ে বর ভাবছিলো, মালা-বদলের রাত্রি আজ, কিন্তু কোন ফুলের মালা এই রূপের প্রতিমার কণ্ঠে মানাবে? বধূকেই সে শুধালে—

'কোন্ ফুলেরি মালা দিই তোমার গলে লো প্রিয়া?'

বনে বনে ফুলের ছোঁয়ায় বুলবুল পাখি যেমন গান গেয়ে ওঠে, তেমনি আমারও মনের—

'বুলবুল গাহিয়া ওঠে তব ফুলের পরশ নিয়া।'

বধূ ধীরে ধীরে জবাব দিলে—

'হাতে দিও হেনার গুছি, কেশে শিরীষ ফুল,
কর্ণে দিও টগর-কুঁড়ি অপরাজিতার দুল।
কুন্দ-কলির মালা দিও, না-ই পেলে বকুল,

কিন্তু কি হবে শুধু ফুল নিয়ে? রাতের ফুল যে ভোরের আগেই ঝরে যায়, তাই বধূর কণ্ঠে মৃদু-মিনতি বেজে উঠল—

'ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল।'

বর তখন বাহু-বেষ্টনে বধূকে কাছে টেনে নিয়ে বললে,—ফুলের মালা তো দিলাম। কিন্তু—

'কোন ভূষণে রাণী ও রূপের করি আরতি?
হয় সোনার বরণ মলিন, হেরি তোমার রূপের জ্যোতি!'

আবেশ-মধুর-কণ্ঠে বধূ চুপি-চুপি বললে—
'চাইনে আমি স্বর্ণ-ভূষণ—
তোমার বাহুর-বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার,
হাতে দিও মিলন-রাখী, খুলবে না যা আর।'

এমন নিরালা রাত যে কানে-কানে কথা কইবার জন্যেই এসেছে। না-ই বা দিলে কানে হীরার দুল,—
'কানে দিও কানে-কানে কথার দুটি দুল,
নিত্য নূতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার।'

বধূর আনত মুখখানি তুলে ধরে বর বললে, 'হৃদয় তো' তোমাকে দিয়েছি, সাজিয়েছি প্রেমের কামনার নব-ভূষণ দিয়ে। কিন্তু কানে-কানে কথা কইবার সময় কি বলে তোমায় ডাকবো বলো তো? কোন নামে বোঝাব তুমি আমার কে? কপালে চন্দন, সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় রাঙা চেলীর ঘোমটা—তোমার এই চির-নূতন রূপ দেখে কি তোমার পুরানো নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে? বলো—
'কোন নামেতে ডাকি, সাধ না মেটে কোনো নামে,
তব নাম-গানে সব কবি হার মানে ধরাধামে।'

বধূ বললে—
'সুখের দিনে সখী বলো, সেই তো মধুর নাম
দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।'

'আমি তো শুধু বাসর-সঙ্গিনী হয়ে আসিনি, জীবনের আনন্দ-বেদনায় তোমার পাশে চিরকাল আছি। সুখের উৎসবে তোমার সখী হবো, তোমার হাসি দেখে আমার মুখে হাসি ফুটবে, আর দুঃখে বন্ধু হয়ে দেবো সান্ত্বনা, তোমার চোখের জলে আমারও চোখের জল মিশবে। আর এমন নিরালা রাত্রে যখন বাইরে জাগবে শুধু চাঁদ, আর ঘরে তুমি আমি, সেই—
'নিরালাতে রাণী বলো শ্রাবণ-অভিরাম।'

তারপর?—

ভীরু-কপোতীর মতো লজ্জানত মুখখানি স্বামীর বুকে লুকিয়ে বধূ চুপি চুপি বললে—
'বুকে চেপে প্রিয়া বলো, সেই তো আমার নাম।'

[৩]

মিলন-রাত্রি মানুষের স্বপ্নের মতো ক্ষণস্থায়ী,—গ্রীষ্মকালের দিনে যেন আধ-গেলাস জল! পান করতে না করতেই ফুরিয়ে যায়, থাকে শুধু পিপাসা!

ফুল-শয্যার রাত্রিও ভোর হলো।

চুপি চুপি দরজা খুলে, বাসি-ফুলের বিছানা থেকে নতুন বৌ উঠে বাইরে এসেছে। জাগর-ক্লান্ত চোখে এখনো অলস-আবেশ, ঠোঁটে এখনো রাঙা মদিরতা,—কিন্তু সারা দেহে লজ্জা, মুখে অবগুণ্ঠন।

'পিছন থেকে কে বলে উঠলো,

'চাও চাও চাও নববধূ অবগুণ্ঠন খোলো,

আনত নয়ন তোলো।'

কে এলো? কে এলো দক্ষিণের হাওয়ার মতো চঞ্চল উচ্ছ্বাসে, খরস্রোতা নদীর মতো কল্লোল তুলে?

পেছনের মানুষটি এবার বধূর সামনে এসে বললে,—

'সই, আমি যে ননদী! খরতর নদী, লজ্জা কি?'

ননদ এসেছে ভাব করতে,—নতুন বৌ-য়েরই সমবয়সী।

বৌ তবু ঘোমটা খোলে না, লজ্জায় মুখ নামিয়ে বসে বসে শুধু আঙুলে জড়ায় আঁচল।

ননদী কিন্তু সত্যিই 'খরতর নদী'। এতো সহজে সে বৌকে রেহাই দেবে কেন? কাল রাতে বন্ধ-ঘরের দরজার বাইরে তাদেরই দু'জনের সঙ্গে আর একটি কৌতূহলী প্রাণী যে জেগেছিল, শুনেছিল কানে-কানে কথা, দেখেছিল প্রাণে-প্রাণে আলাপ, বৌ তো আর তা জানে না।

চোখের কোণে কৌতুকের বিদ্যুৎ আর ঠোঁটের কিনারে দুষ্টু হাসির তীক্ষ্ণ তীর ঝিকমিকিয়ে ননদ বললে—

'লজ্জায় ফুল-শয্যায় কাল ছিল না তো নত ঐ আঁখি!

সবই বলে দেবো' যদি বৌ কথা না বলো'

এই শাসনবাণী শুনে বেচারী নতুন বৌয়ের নতমুখ আরো নত হয়ে পড়ল। গত রাতের গোপনতা ননদের কাছে তা হলে ধরা পড়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ! কিন্তু ননদীর মনের সঙ্গী-হারা পাখি তখন মিনতি-ভরা সুরে গাইছে,—'বৌ কথা কও'! বধূর চিবুক ধরে মুখখানি তুলে সে বললে—

'বউ কথা কও ডাকে পাখি

তবুও নীরব রবে নাকি?'

হঠাৎ ননদের চোখে পড়ে গেল, বধূর গালে কার অনুরাগ এখনো রাঙা হয়ে আছে। কৌতূহল—ভরে সে বলে উঠলো,

'দেখি, দেখি গালে লালী ও কিসের?'

তারপর মুখ টিপে হেসে বললে—

'ও! লজ্জায় বুঝি লাল হলো?'

ননদীর পরিহাস-বাণে জর্জরিতা হয়ে নিরূপায় বৌ তখন উঠে ত্রস্ত পদে পাশের ঘরে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে, নূপুর উঠলো রুণঝুনিয়ে। কিন্তু ননদ তবু পিছু ছাড়ে না। পলাতকা বধূর আঁচল ধরে বললে—

'ও কি, অধীর-চরণে যেয়ো না যেয়ো না
আনঘরে লুকাইতে দেখে যদি কেউ ?
সখি, পাশের ও-ঘরে মানুষ যে রহে
তারও অন্তরে বহে বিরহের ঢেউ !'

সুতরাং, পালানো আর হলো না। পাশের ঘরে রয়েছে বর। এই দিনের বেলায় গত রাত্রির মিলন-স্মৃতি তারো বুকে তো বিরহের ঢেউ তুলেছে। যার জন্যে এত লজ্জা, বৌ কি লজ্জার মাথা খেয়ে তারই ঘরে গিয়ে লুকাতে পারে ?

লজ্জা বাঙালির ঘরের বৌদের অলঙ্কার।

কিন্তু ননদ যেন বনের চপল কুরঙ্গী, বৌ তো সে নিজেও, তবু এতোখানি লজ্জার ধার সে ধারে না।

এত সাধাসাধির পরেও বৌ যখন না খুললে ঘোমটা, বা না কইলে কথা, তখন সে বললে—

'লজ্জাই যদি তব ভূষণ
সজ্জায় তবে কি প্রয়োজন ?'

তারপর জোর করে বধূর ঘোমটা খুলে দিয়ে, বন্ধুর মতো সামনে এগিয়ে এসে স্নিগ্ধ হেসে বললে,

'ওরে ও সুখে সুখী হব, দুখে দুখী
বোসো মুখোমুখি, লাজ ভোলো।'

[৪]

চারু-দর্শনা এই দুরন্ত মেয়েটির দৌরাত্ম্যে লজ্জা করবার আর উপায় কই ? বধূ তখন আনত-মুখ তুলে বললে—

'হার মানি ননদিনী—
মুখর-মুখের বাণী শুনি তোর
লজ্জাও লাজ সখি ভোলে,
পুলকে প্রাণ-মন দোলে।'

হার মেনে বৌ ননদের সঙ্গে করলে সন্ধি। দুই সখিতে হলো ভাব, শুরু হলো আলাপ।

ননদ শুধালে, 'এতো লজ্জা কেন ভাই তোমার ?'

কেন লজ্জা, বৌ কি নিজেই তা জানে ?

শুভ-দৃষ্টির সময় সেই যে চোখের পলকে চোখে-চোখে চাওয়া, তারপর থেকেই তার আঁখিপাতা ক্ষণে ক্ষণে অকারণে নুয়ে আসে,—কতো কথা বলতে মন হয়ে ওঠে ব্যাকুল, মুখে তবু ফোটে না কথা! সে বুঝতে পারে না, কে তাকে এতো লজ্জা দেয়—প্রথম পুরুষ, না প্রথম প্রেম?'

ননদের কানে-কানে বৌ চুপি চুপি জবাব দিলে—

'পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এতো মধু, এতো লাজ নয়নে!
বাহিরে নীরব কথার কুহু
অন্তরে মুহু মুহু বোলে।'

অথচ, এতদিন তো সে এমন লাজুক ছিল না। তার কুমারী-মন আকাশের পাখির মতো গান গেয়ে উড়ে বেড়াত, লাজের মানা মানত না। বৌ বলতে লাগল—

'তোরই মতো ছিনু সই বনের কুরঙ্গী,
মানি নাই কোনো দিন লাজের ভ্রূভঙ্গী।'

কিন্তু এখন আমি যে বৌ।

তবু, মুখরা-বেহায়া ননদীর শাসনে বারে বারে বধূর লজ্জা টুটে যায়!

এবার বধূর পরিহাসের পালা।

ননদের গলা জড়িয়ে মৃদু হেসে সে বললে, 'কথায় তোর সাথে পারবার জো নেই ভাই ঠাকুর-ঝি! কিন্তু কথায় তোর এত ধার কেন বল তো?

'মধুয়া-মুখরা ওলো মিষ্টি-মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর-জামাই চোর?'

ননদী তখন কপট রোষে বধূর গালে ঠোনা মারলে।

কিন্তু নব-পরিচিতা এই মুখরা কৌতুকময়ী মেয়েটিকে বৌ ভালোবেসে ফেলেছে, সমস্ত অপরিচয়ের বেড়া ভেঙ্গে সখি হয়ে যে কাছে এলো, তার কাছে লজ্জা কিসের?

হেসে গুণ্ঠনহীনা বধূ বললে—

'তব অভিনব বাণী হিলোলে
গুণ্ঠন আপনি খোলে।'

[৫]

ঘুমন্ত বাড়ি জাগল, আবার শুরু হলো দিনের কলরব।

সারা বাড়ি আনন্দে মেতে উঠল। দুটি মানুষের মিলনকে কেন্দ্র করে যে রঙিন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আরো অনেকেরই মনে লেগেছে রোম্যান্সের রঙ। শুধু শিক্ষিত এবং অভিজাত নয়, যারা অশিক্ষিত গরীব, তাদেরও মন বিয়ে-বাড়ির এই আনন্দ-হিল্লোলে অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বরের বাড়ির চাকর গোবিন্দের আজ এক মিনিটিও ফুরসৎ নেই ; ভোর থেকেই হাজার কাজে সে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিন হলে এত ফরমাস তামিল করতে গোবিন্দ নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি জানাত, কিন্তু আজ তার যেন ক্লান্তি নেই। আজ তার উৎসাহের উৎস গেছে খুলে, কাজ করতে করতে তার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে !

গোবিন্দের এই সানন্দ উৎসাহের মূলে, অবশ্য মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, একটি গূঢ় কারণ আছে। পাশ দিয়ে কেউ এসেন্স মেখে চলে গেলে, সেই সুগন্ধের ক্ষীণ আভাসে যেমন কিছুক্ষণের জন্যে লোকের নেশা ধরে, তেমনি দুটি মানুষের মদির-মিলন স্মরণ করে গোবিন্দেরও মনে লেগেছে নেশা।

এতো কাজের ভিড়েও সে মনে মনে এরই মধ্যে তার দোসর খুঁজে নিয়েছে। তাকে হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু গোবিন্দের দৃষ্টি তার প্রতি অনুক্ষণ সজাগ।

সে বিন্দে, কনে-বাড়ির ঝি, নতুন বৌ-এর সঙ্গে এসেছে। আঁট-সাঁট গড়ন, পরণে খড়কে-ডুরে শাড়ি, মাথায় চূড়ো-খোপা, কপালে উল্কি এবং মুখে পান দোক্তা আর ধারালো হাসি।

অতি সাধারণ এই মেয়েটার কাছে নিজেকে খেলো করতে অন্য সময়ে অশিক্ষিত গোবিন্দের আত্মাভিমানে হয়তো ঘা লাগতো কিন্তু আজকের দিনে এহেন বিন্দে, গোবিন্দর চোখে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে, তাই দুটো কথা কইবার অছিলায় সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে বিন্দের আশে-পাশে।

অনেক বেলায় বিয়ে-বাড়ির হাঙ্গামা যখন একটু থামলো, নিরিবিলি অবসর পেয়ে গোবিন্দ এসেছে সদর ছেড়ে খিড়কির রোয়াকে—বিন্দের সঙ্গে ফের আলাপ করতে।

কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুখের ঘাম চট করে একবার মুছে নিয়ে গোবিন্দ ডাকলে, 'শুনতিছ ! ও বিন্দে ! ও কনে বাড়ির ঝি ! এ্যাঃ, কথাটা মোটেই কানে যাচ্ছে না ! বলি একবার ফিরে চাইয়েই দ্যাখো !

ও বিন্দে ! ঘাড় ফিরোয়ে চাও তোমার ঐ চোখ মেলে।
সত্যি বলতিছি, তুমি সগ্যে যাবা আমার মতন লোক পেলে ?

কিন্তু বিন্দের আজ গুমোর বেড়েছে, অত সহজে সে আলাপ কর্তে চায় না। মুখ-ঝামটা দিয়ে সে বলে উঠলো—

'তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পর্কে বেহাই
তাই পেলি আজ রেহাই।
নইলে পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসি-আকার ছাই॥'

গোবিন্দ বেচারি একটু থতমত খেয়ে এক গাল হেসে বললে—

'কেডা কলো বিন্দে যোগ্যে সম্পক্ক নাই ?
আমি তোমার ননদের যে একমাত্র ভাই।'
তাকি ভুলে গেলে ?

নাঃ, লোকটা নেহাৎই নাছোড়বান্দা ! চোটে উঠে বিন্দে বললে—

'মর মিনসে, সয় না সবুর হাড় জ্বালাতে ফের এলে।'

কিন্তু মায়াও হচ্ছিল বিন্দের। মুখের দুটো মিষ্টি-কথার প্রত্যাশায় যে এমন করে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আজ সে নাই বা ফিরিয়ে দিল? আর, বিয়ে-বাড়ির এই হাসি-খুশির রঙ কি বিন্দের যৌবনকেও একটু রঙিন করে তোলেনি? গোবিন্দের কাঙাল-চোখ আর ঘর্মাক্ত মুখের পানে তাকিয়ে সে গলাটা কোমল করে বললে—

'ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে বিরহেরি বোঝা ঠেলে
একটু দাওয়ায় বোসো'—

গোবিন্দ খুশি হয়ে বলে উঠলো—

'বাতাস করবা নাকি?'

বিন্দে এবার হেসে ফেলে বললে—

'আঃ চুপ, চুপ করে ঐ দাওয়ায় বোসো
হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে, ঐ দাওয়া বোসো
প্রেম-পাগলের দাওয়াই যে ঐ—'

এদিক-ওদিক চেয়ে বিন্দে গোবিন্দের হাত ধরে তাকে রোয়াকে বসিয়ে দিল। গোবিন্দের খুশির আর সীমা নেই। আকর্ণ দন্ত-বিকাশ করে সে বলে উঠলো—

'আজ হ্যাকোচ-প্যাঁকোচ করতিছে প্রাণ পুলকের-ই
ঠেলায়।'

বিন্দে ভাবলে আনন্দ তো শুধু সেই দুটি মানুষেরই, যারা পরস্পরকে ভালোবেসে কাছে পেয়েছে আর নিরিবিলি ঘরে ফুল-ছড়ানো বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সারারাত মনের কথা কয়েছে। বাঁকা চোখে চেয়ে, ঠোঁটে হাসির ইশারা ফুটিয়ে সে বললে—

'আর, এক-যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায়।'

কিন্তু ঝি-চাকর হলেও তাদের মন বলে কি কিছু নেই? চারিদিকের এই আনন্দ-সমারোহের মাঝে তাদেরও যৌবন-ও কি গান গেয়ে উঠতে চায় না? বিন্দে ডুরে-শাড়ি আঁচল দুলিয়ে, চূড়ো-খোঁপা হেলিয়ে বলে উঠলো—

'মোরা গিলবো অঢেল আনন্দ আজ একটু ছাড়া পেলে'

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি একটা উপমা দিলে—

'যেমন দুর্ভিক্ষেরই দেশের মানুষ গো-গেরাসে গেলে॥'

[৬]

আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, আর দীঘিতে ফুটেছে কুমুদী।

ঘরে বর আর বধূ। দুটি জীবন-স্রোত এসে মিলেছে প্রেমের তীর্থে। একটি প্রাণের সাথে মিলেছে আর একটি প্রাণের ছন্দ! জন্ম নিল তাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কবিতা!

জীবনের এই পরিপূর্ণতার লগ্নে বর আর বধূ একত্রে কণ্ঠ মিলিয়ে বললে—

'মোরা ছিলাম একা, আজ মিলিনু দুজন।
পাপিয়ার পিয়া-বোল কপোত কূজন॥'

এ মিলন যেন পাপিয়ার 'পিয়া' ডাক, আর কপোত-কপোতীর কূজনের মতোই মধুর, সম্পূর্ণ! দুজনের এই মিলন এ যেন পরস্পরের কাছে পরস্পরের আবির্ভাব! বর যেন এতদিন ছিল উষর প্রান্তরের মতো নিঃসঙ্গ, সেখানে সহসা এলো শ্যামলতার বন্যা, ফুটলো ফুল! বর তাই বললে—

'তুমি সবুজের স্রোত এলে উষর দেশে।'

আর স্বামী নারীর জীবনে পরম আশির্বাদ! বধূর লাজ-মৃদু কণ্ঠে সেই পরম সার্থকতার ভাষাই ফুটলো—

'তুমি বিধাতার-বর এলে বরের বেশে।'

বধূর সীমন্তিনী কঙ্কণ-পরা কল্যাণী-মূর্তির পানে চেয়ে বর বললে—'তুমি তো' শুধু 'বউ' নও—

'তুমি গৃহে কল্যাণ'

বধু তেমনি নম্র-কণ্ঠে বললে,—'তুমিও তো শুধু আমার প্রতিদিনের জীবনের, সংসারের স্বামী নও। তোমার প্রেমের পূজায় আমি যে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তুমি যে আমার দেহ-মনের স্বামী!

'তুমি প্রভু মম ধ্যান।'

বাইরে চাঁদ আর কুমুদী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। জীবনের সঙ্গে জীবনের, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলনে আকাশ-ধরণী তাদের চোখে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে!

ঘরের ভিতর দুটি তরুণ-কণ্ঠে সেই কথাই বেজে উঠলো—

'সুন্দরতর হলো সুন্দর ত্রিভুবন।'

* * *

এইবার আশির্বাদের পালা। পুরনারীদের কলগুঞ্জন শোনা গেল। গুরুজনেরা এসেছেন এই মিলনকে আশির্বাদ করতে। প্রথমে এলেন ঠানদি। পাকা আমের মতো টসটসে চেহারা, মাথার পাকা চুলে অন্তরের শুভ্র প্রসন্নতা প্রকাশ পেয়েছে, মুখে বার্ধক্যের রেখা।

ঠানদির বয়সের হিসেব নেই, কিন্তু মন আজো আছে সেই বাইশ বছরের কোঠায়। মিষ্টি হেসে ঠানদি নবদম্পতির সামনে এসে বললেন—

'ভাই নাত-জামাই!
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—
তুমি বৌর-জীর্থে নেড়া হও।
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও।

বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।
ফোঁসফোঁসাবে বাইরে শুধু
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
বৌ-এর ঘরে নোড়া হও।
দিনের বেলা ফরফরাবে
রাত্তির বেলা খোঁড়া হও।
সূয্যি-চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরকালটা ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ন্যাড়া হও॥

কার আজ্ঞে? না কামরূপ কামাখ্যা-দেবীর আজ্ঞে॥

ঠানদির পরে এলেন মা ধান-দুর্বা নিয়ে। বাঙালি-ঘরের নারীর যা চিরন্তন কামনা, যা চিরকালের আদর্শ, তারই কথা তিনি তাঁর ঘরের লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। অন্তরের মধুর মমতা তাঁর কণ্ঠ হতে ঝরে পড়তে লাগল—

'তুমি হও মা চির-আয়ুষ্মতী
সাবিত্রী সমান সতী।
অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে
চিরকাল এই ঘরে রও,
শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী
স্বামীর সুয়োরাণী হও।
তোমায় পেয়ে বিধির বরে
যেন এ ঘর ধনে-জনে ভরে।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
রাখবে দেহ গঙ্গাজলে।
সিঁথেয় সিঁদুর মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান॥

এরপর আশীর্বাদ করতে এলেন দিদি। তাঁর নতুন বোনটির চিবুক ধরে তিনি স্নেহ-স্নিগ্ধ সুরে বললেন—

'তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো,
এই আলোতে মোদের ঘরের
কেটে যাবে আঁধার কালো
রাঙা হাতে শাদা শাঁখা

অন্নপূর্ণার আশীষ মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও-হাতে
অম্লান থাক সিঁদুর সাথে
এই চাই ভাই, ঘরে পরে
পড়বে সবার সুনজরে।
আলতা সিঁদুর নোয়া পরে
থাক তিন কুল আলো করে।
জানবে না ক দুঃখ শোক
অন্তে পাবে স্বর্গ-লোক॥'

তারপর বাজল মঙ্গল-শঙ্খ, পুরনারীরা দিল উলুধ্বনি, আর আকাশের দিব্যলোক বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ হয়ে মাটির বুকে নেমে এলো।

'বিয়ে-বাড়ি' শীর্ষক এই গ্রামোফোন রেকর্ড-নাটকের ('হিজ মাস্টার্স ভয়েস, কোম্পানীর রেকর্ড নম্বর N7326 to N7328 দ্রষ্টব্য) গানগুলোর অধিকাংশই নজরুলের 'সন্ধ্যামালতী' শীর্ষক গীতিগ্রন্থে সংকলিত।

সাপুড়ে

কাহিনী

সভ্যজগতের সুসমৃদ্ধ জনপদ হইতে বহুদূরে, কখনও ঘননীল শৈলমালার সানুদেশে, ভীষণ নির্জন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে, কখনও বা তরঙ্গ–ফেনিল বঙ্কিম গিরিনদীর তীরে, দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, যাযাবর সাপুড়ের দল তাহাদের ক্ষণস্থায়ী নীড় রচনা করে।

এমনই এক ভবঘুরে সাপুড়েদলের ওস্তাদ সে। নাম তাহার জহর। দলের সে বিধাতা, একচ্ছত্র অধিপতি। দলের প্রত্যেকটি লোক তাহাকে ভয় করে যমের মতো, ভক্তি করে দেবতার মতো। শুধু দলের একটিমাত্র লোক, তাহার এই অপ্রতিহত প্রভুত্ব–গৌরবে ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, মনে–মনে দারুণ অবজ্ঞা করে জহরকে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাহার হয় না। এই লোকটির নাম বিশুন, তাহারও দুই একজন অনুচর আছে।

মনে–মনে সে মৃত্যু কামনা করে জহরের, কখনও–বা কেমন করিয়া জহরকে চূর্ণ করিয়া একদিন সে সর্দার হইয়া উঠিবে, সেই কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

সেদিন নাগ–পঞ্চমী।

জহর পাহাড়তলীতে গিয়াছিল বিষধর সর্পের সন্ধানে। তাহার তুবড়ি বাঁশিতে, সে বাজাইতেছিল একটানা মোহনিয়া সুর—বাঁশীর রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, গমকে গমকে, তীব্র মধুর উন্মাদনা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই সুরে আকৃষ্ট হইয়া বনের ভিতর হইতে, একটি বিষধর কালীয় নাগ ফণা দুলাইতে দুলাইতে বাহির হইয়া আসিল। দারুণ উত্তেজনায়, জহরের চোখের তারা দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ হাতের বাঁশিটা সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সেই কালীয় নাগের উদ্ধত ফণার সমুখে তাহার অকম্পিত করতল পাতিয়া ধরিল। মুহূর্তে একটি তীব্র দংশন ! দেখিতে দেখিতে জহরের সর্বশরীর সেই সাপের বিষে একেবারে নীল হইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক সভয়ে, স্তম্ভিতবিস্ময়ে জহরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জহর কিন্তু নিষ্কম্প, নির্বিকার—উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে নাই। ধীরগম্ভীরকণ্ঠে, সে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং ধীরে–ধীরে শীঘ্রই বিজয়ী বীরের মতো সগৌরবে বিষমুক্ত হইয়া উঠিল। বিমুগ্ধ, বিস্মিত জনতা, সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া, বিশুন ধীরে ধীরে নীরবে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঠিক এমনই করিয়া আজ পর্যন্ত, জহর নিরানব্বই বার নিজের দেহে সর্পদংশন করাইয়া, অবলীলাক্রমে বিষমুক্ত হইয়াছে। এইবার শততম এবং শেষতম সর্পদংশন। এই সর্বশেষ সর্পের বিষ, মন্ত্রবলে আপন দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই, জহর কঠোর ব্রত উদযাপিত হইবে ; সে সর্পমন্ত্রে সিদ্ধকাম হইবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়াই জহরের জীবনের পরমতম লক্ষ্য, একমাত্র মহাব্রত।

এই সাধনার জন্য সে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছে। আজীবন চিরকুমার থাকিয়া, নিষ্কামভাবে সংযতচিত্তে ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে।

জহরের অগণিত গুণমুগ্ধ শিষ্য, যখন উদগ্রীব হইয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় সহসা সেদিন রাত্রে, তাহার জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হইল। পরিণামে এই ব্যাপারটি যে তাহার সাধনার ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া যাইবে, তাহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল?

ভবঘুরের মতো জহর তখন নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারীজাতির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশ জহরের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, নারীজাতি সাধনার পথে সাংঘাতিক বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ক্রমে নারীজাতির সম্বন্ধে অন্তরে সে বিজাতীয় বিতৃষ্ণা পোষণ করিতে শুরু করিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন সে দেখিল, ক্ষীণস্রোতা একটি নদীর জলে কলার ভেলার উপরে, পরমাসুন্দরী এক বালিকার মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। সর্পদংশনে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের নাকি দাহ করিতে নাই। স্রোতের জলে মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়াই নাকি বহুকালের প্রচলিত প্রথা। জহর কি আর করে, সাপুড়ে জাতির স্বধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া, সে নদীর জল হইতে মৃতা বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া, মন্ত্রবলে তাহাকে পুনর্জীবিতা করিল।

জীবন দান করিল বটে কিন্তু, এই বালিকাটিকে লইয়া সে কি করিবে? কে যে তাহার আত্মীয়, কে তাহার স্বজন—কিছুই সে বলিতে পারে না। বিষের প্রকোপে তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জহর বড় বিপদে পড়িল। বেচারী নিরীহ, নিরাশ্রয়া মেয়েটি, নিরুপায়ের মতো করুণ কাতর দৃষ্টি মেলিয়া জহরের দিকে তাকাইয়া থাকে। জহর তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, কেমন যেন দয়া হয় মেয়েটির উপর। দারুণ ঘৃণা ধীরে ধীরে মধুর মমতায় রূপান্তরিত হইয়া আসে। সে-ই শেষে আশ্রয় দিয়া ফেলিল এই মেয়েটিকে—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে! জহর তাহার সংস্কারবশে, বালিকার নারীবেশ একেবারেই সহ্য করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, ইহাকে সে পুরুষের বেশে সাজাইয়া পুরুষের মতো মানুষ করিবে। সে তাহাকে একরকম উগ্র ঔষধ পান করাইল, যাহাতে এই ঔষধের গুণে, তাহার মধ্যে নারী-সুলভ কোনো চেতনা জাগ্রত না হয়।

জহর তাহার নাম রাখিল চন্দন—পুরুষের নাম। কিশোরবেশী চন্দনকে সঙ্গে লইয়া জহর এইবার অন্য এক সাপুড়ের দলে যোগদান করিল। সেই দলের বৃদ্ধ সর্দার, জহরের আশ্চর্য চরিত্রবল দেখিয়া এত বেশি মুগ্ধ হইল যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে জহরকে সে সেই দলের সর্দার করিয়া দিয়া গেল। ক্রমে জহর এই অর্ধসভ্য ভবঘুরে সাপুড়ের দলের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া উঠিল।

চন্দন যে বালক নয়, দলের কেহই সে কথা জানে না। জহরের এক প্রিয়তম শিষ্য ঝুমরো, তাহার একমাত্র প্রিয় সহচর। চন্দনকে ঝুমরো বড় ভালবাসে।

এই ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী জহর, নিরানব্বইটি বিষধর সর্পদংশনের কঠোর পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া যখন তাহার সাধনার প্রান্তসীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তখন সহসা এক সচকিত মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিয়া সে অনুভব করিল যে, তাহার সংযম-সাধনার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে বোধকরি তাহার পদস্খলন হইতে বসিয়াছে।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে অকস্মাৎ এক তীব্র মধুর বেদনার মতো চন্দনের রমণীয় সুকুমার রূপ-মাধুরী, তাহার বুকের মধ্যে আসিয়া বিঁধিল এবং ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উন্মাদ অস্থির করিয়া তুলিল। প্রাণপণ চিত্তসংযমের দ্বারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাহার এই সাময়িক মোহকে অতিক্রম করিল। উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া সে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মনসার পদপ্রান্তে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিনিদ্র চক্ষে এই অপরিসীম আত্মগ্লানির জন্য অনুতাপে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। দেবী প্রতিমার কাছে ক্ষতবিক্ষত অন্তরের সকরুণ প্রার্থনা জানাইয়া, সে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

কিন্তু যে সুপ্ত কামনার আগুন একবার জ্বলিয়াছে, এত সহজে কিছুতেই সে যেন নির্বাপিত হইতে চাহিল না। ঠিক সেইদিনই খবর পাওয়া গেল, রাজার সিপাহীরা সাপুড়েদের উপর বিষম অত্যাচার শুরু করিয়াছে, কারণ দেশে নাকি ভয়ানক ছেলেচুরি হইতেছে। সকলের ধারণা সাপুড়েরাই এই কার্য করিতেছে।

এই খবর পাইবামাত্র, জহর সদলবলে তাহাদের ডেরা তুলিয়া, বহু পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিজন, ভীষণ, শ্বাপদসঙ্কুল এক অরণ্যের মাঝখানে তাহাদের তাঁবু ফেলিল। বন্য, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁবুর চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া অনেকেই তখন প্রচুর ফূর্তি করিতেছে। এই বিরাট আমোদের মজলিস জমাইয়া তুলিয়াছে, দিল খোলার দল। তাহাদের নৃত্যগীতোৎসব তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। জহর, ঝুমরো, চন্দন, বিশুন, বিশুনের পুত্র তেঁতুলে, নীল-চশমাধারী দলের যাদুকর গণকঠাকুর ঘণ্টাবুড়ো, সকলেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে, মুগ্ধ আনন্দে এই অপূর্ব উৎসব উপভোগ করিতেছে।

এমন সময় কি যেন একটা তুচ্ছ কারণে, বিশুনের পুত্র তেঁতুলের সঙ্গে ঝুমরোর ভীষণ কলহ বাঁধিয়া গেল। কলহ প্রথমে মুখে-মুখেই চলিতেছিল, তাহারপর হইল হাতাহাতি, তাহারপর ক্রমে মারামারি। চন্দন ছিল দূরে দাঁড়াইয়া। তেঁতুলে অকথ্য অপমান করিবে ঝুমরোকে—এ তাহার অসহ্য। সেও ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, ইহাদের মাঝখানে। কিন্তু টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হঠাৎ যেই মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল, দলের সকলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দেখিল—চন্দন পুরুষ নয়—পুরুষের ছদ্মবেশে পরমাসুন্দরী এক তরুণী।

এই সময় কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আর একটি সুন্দরী তরুণী ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম মৌটুশী। সে নিজের উত্তরীয়টি তাড়াতাড়ি খুলিয়া চন্দনের গায়ে জড়াইয়া দিল। কিশোর চন্দনকে, সে কুমারী-হৃদয়ের নীরব প্রেমের পূজাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিল—আজ যখন দেখিল, চন্দন তাহারই মত এক তরুণী, তখন তাহার লজ্জারুণ প্রণয় স্বপ্নের প্রাসাদ একেবারে ভাঙিয়া গেল। যে গভীর উদার প্রেম তাহার

হৃদয়ে এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মধুর সখিত্বে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। জহর আসিয়া, লজ্জাবনতমুখী চন্দনকে টানিয়া, একেবারে অন্দর তাঁবুর ভিতরে লইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক একেবারে অবাক। কেহ স্বপ্নেও কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই—জহরের মত একজন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মন্ত্র-সাধক, এমন করিয়া এই সুন্দরী যুবতীটিকে যুবক সাজাইয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়াছে।

শুধু বিস্মিত হইল না একজন—সে ঘণ্টাবুড়ো। এই বেদিয়ার দলে সে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির রহস্যময় মায়াবীর রূপে বাস করে। অনবরত মদ্যপান করে, আর খড়ি পাতিয়া সকলের ভবিষ্যৎ গণনা করে, কিন্তু সব কথা কখনো পরিষ্কার করিয়া বলে না।

এই ব্যাপারে ঘণ্টাবুড়ো, পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া, সহসা এক অদ্ভুত ক্রূর অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

এদিকে নিভৃতে, তাঁবুর এককোণে, থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জহর ভীতা হরিণীর মতো চন্দনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে, 'চন্দন, চন্দন, তুই আমার—একমাত্র আমার !'

তাহার এতদিনকার রুদ্ধ আত্মসংযমের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—দুকূলপ্লাবী বন্যার মতো সেই উন্মত্ত আবেগ, সেই দুর্দমনীয় দুর্বার বাসনা তাহাকে যেন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দন বৃথাই নিজেকে প্রাণপণে তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর চন্দন কিছুতেই যখন জহরকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন সে তাহার সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করিবার জন্য মিনতি কাতরকণ্ঠে জহরকে স্মরণ করাইয়া দিল—তাহার মহাব্রতের কথা, তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, নাগ-মন্ত্র-সাধনার সিদ্ধিলাভের কথা।

কথাগুলি জহরের বুকে গিয়া নির্মম মহাসত্যের মতো ধক করিয়া বাজিল। সত্যই ত ! এ কি করিতেছে সে ! জহর যেন অকস্মাৎ তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মনসা-দেবীর প্রতিমার পানে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পর কিসের যেন একটা অব্যক্ত মর্মযন্ত্রণায় কাতর হইয়া, তাঁবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আজই—এই রাত্রেই সে তাহার শততম সর্পদংশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জীবনের মহাব্রত উদযাপন করিবে। আর বিলম্ব নয়।

বিষধর একটি সর্পের সন্ধান করিয়া, জহর যেমনই তাহার কর্ম সিদ্ধ করিতে যাইবে, অমনিই বিশুন কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল—চন্দনকে লইয়া ঝুমরো পলায়ন করিয়াছে। মৌটুশীর আগ্রহ এবং সাহায্যেই নাকি তাহারা এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।

জহরের ব্রত আর সাঙ্গ করা হইল না। যে কঠোর সংযমের বন্ধনে নিজেকে সে পুনর্বার পাথরের মতো স্তব্ধ নির্বিকার করিয়া তুলিয়াছিল, বিশুনের এই মর্মান্তিক সংবাদে প্রখর স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো সে সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল।

ক্রোধে, উন্মাদের মতো অধীর হইয়া, জহর ছুটিয়া চলিল চন্দন-ঝুমরোর সন্ধানে। কিন্তু দলের কেহই তাহাকে তাহাদের সন্ধান দিতে পারিল না, তীব্র উত্তেজনায় সর্বশরীরে তখন তাহার যেন আগুন ধরিয়া গেছে।

উন্মত্তের মতো তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া, সে ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল,—বিষধর কালীয়নাগ ! সেই ভীষণ কালীয়নাগকে লইয়া, সে ছুটিয়া আসিল মহাকাল-মন্দিরে—তাহার পর সেই কালীয়নাগকে মন্ত্রপূত করিয়া ঝুমরোর উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিল।

ঝুমরো ও চন্দন তখন গভীর আনন্দে প্রেমাপ্লুত হইয়া, গান গাহিতে গাহিতে নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছে। দূরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়া, তাহারা দুজনে একটি মধুর সুখের নীড় রচনা করিয়া; পরমানন্দে প্রেম-মধুযামিনী যাপন করিবে অনন্তকাল ধরিয়া—মুদিত বিহ্বল চক্ষুর সম্মুখে তখন তাহাদের এই সুখ-স্বপ্নের মোহন মেদুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অপূর্ব আনন্দে বিভোর হইয়া, যখন তাহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেছে, তখন সহসা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সেই মন্ত্রপূত কালীয়নাগ আসিয়া ঝুমরোকে দংশন করিয়া দিয়া, অদৃশ্য হইয়া গেল। বিষের বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ঝুমরো সেখানে বসিয়া পড়িল।

চন্দন একেবারে স্তম্ভিত নির্বাক ! নিঃসহায়, নিরুপায়ের মতো সে দাঁড়াইয়া রহিল। ঝুমরোকে বাঁচাইতে হইলে, এখন তাহার আবার সেই জহরের কাছে গিয়া দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নাই।

অবিরল অশ্রুধারে, চন্দন চোখে দেখিতে পাইতেছে না—সে চলিয়াছে সেই পরিত্যক্ত তাঁবুর দিকে। কিন্তু কেমন করিয়া; কোন মুখে, সে আবার জহরের কাছে গিয়া দাঁড়াইবে ?

জহর তখন নিশ্চল প্রস্তরের মতো বসিয়া আছে। অশ্রুমুখী চন্দন আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কাছে। ম্লানমুখে, মৃদুকম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, ঝুমরো তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে যদি সে বাঁচাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে জহরের কাছে আত্মবিক্রয় করিতেও প্রস্তুত। জহর একটি কথাও বলিল না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে চলিল চন্দনের পিছু পিছু। নীরবে সে গিয়া দাঁড়াইল ঝুমরোর বিষাক্ত নীলবর্ণ মৃতদেহের পাশে।

ঝুমরো বাঁচিয়া উঠিল।

চন্দনের আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু চন্দনের সময় নাই, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে, সে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, জহরের কাছে। এখন সে জহরের। ঝুমরোকে সে উত্তেজিত করুণ, ভগ্নকণ্ঠে বলে, 'তুই দূরে চলে যা ঝুমরো, আমার চোখের সুমুখে থাকিস নে—আমি তোর নই'।

যে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, একান্ত আপন, জীবন-সর্বস্ব, তাহাকে সে চায় না। চন্দনের উদগত অশ্রু আর বাধা মানে না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া যায়, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে।

অদূরে দাঁড়াইয়া, জহর এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছিল। যে কালীয়নাগ মন্ত্রবলে ফিরিয়া আসিয়া ঝুমরোকে বিষমুক্ত করিয়াছে, সে তখনও তাহার হাতে।

জহর একবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাইল, একবার তাকাইল ঝুমরোর দিকে—একবার মনে-মনে কি যেন ভাবিল।

অকস্মাৎ সে নির্বিকার ভাবে সেই কালীয়নাগের দংশন নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিল।

ঝুমরো চীৎকার করিয়া কহিল, 'ওস্তাদ কি করলি !'

চন্দন ও ঝুমরো দুজনেই ছুটিয়া জহরের কাছে গেল। জহর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠল, 'ঝুমরো শিগগির একে নিয়ে চলে যা আমার সুমুখ থেকে—আমি বিষ হজম করবো; এই আমার শেষ সাপ-তারপর আমি মন্ত্র পড়বো। মেয়েমানুষের সামনে মন্তর নষ্ট হয়। ওকে এখান থেকে নিয়ে যা—এ জঙ্গল থেকে, এ দেশ থেকে নিয়ে যা।'

চন্দন আর ঝুমরো অগত্যা চলিয়া গেল। ওস্তাদ দেখিল তাহারা দূরে চলিয়া গেছে, কিন্তু নাগমন্ত্র আর সে উচ্চারণ করিল না। স্মিতহাস্যে আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, 'মন্তর, ও সাপের মন্তর আর নয়—এইবার আমার মন্তর—'শিব শম্ভু—শিব শম্ভু' !

কালীয়নাগের বিষে তাহার সর্বশরীর ক্রমশ নীল হইয়া আসিতে লাগিল, চোখ দুইটি স্তিমিত নিস্তেজ হইয়া গেল ; কিন্তু তাহার সমস্ত মুখের উপরে মনে হইল, কিসের যেন এক অপার্থিব আনন্দের ভাস্কর দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার বিক্ষুব্ধ আত্মার সমস্ত বিক্ষোভ যেন শান্ত হইয়া গিয়াছে, জীবনব্যাপী মর্মযন্ত্রণার যেন অবসান হইয়াছে।

সর্বশেষ সর্পের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-সাধনায় পরিণামে সে সিদ্ধকাম হইল কি ?

সংগীতাংশ

এক

হলুদ–গাঁদার ফুল,   রাঙা পলাশ ফুল,
এনে দে, এনে দে, নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল,
কুসমী রঙ শাড়ি   চুড়ি বেলোয়াড়ি
কিনে দে হাট থেকে,
এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল।
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল॥
তূরকুট পাহাড়ে, শাল–বনের ধারে
বসবে মেলা আজি বিকেল বেলায়।
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে
বেদে–বেদেনী নূপুর বেঁধে পায়।
যেতে দে ঐ পথে বাঁশি শুনে শুনে পরাণ বাউল॥
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল॥

—কোরাস

দুই

আকাশে হেলান দিয়ে   পাহাড় ঘুমায় ওই,
ওই পাহাড়ের ঝর্ণা আমি, ঘরে নাহি রই গো,
উধাও হয়ে বই॥

চিতা বাঘ মিতা আমার,
গোখরো খেলার সাথী,
সাপের ঝাঁপি বুকে ধরে
সুখে কাটাই রাতি।
ঘূর্ণি হাওয়ার উড়নি ধরে গো আমি নাচি তাথৈ থৈ॥
নাচি তাথৈ থৈ॥

—চন্দন

তিন

কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো,
শ্বশুর সওদাগর,
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা লখিন্দর॥

ওলো কুল-বালা নে এই পলার মালা,
বর তোর ভেড়া হয়ে রইবে মালার ভয়ে
ও বৌ, পাবি নে জীবনে সতীন জ্বালা॥

আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী।
গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ,
বের করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ ;
ঔষধ জানিলো, হোঁৎকা স্বামীর,
কোঁৎকা খায় যে কামিনী॥

পেত্নী পাওয়া মিনসে গো
ভূতে-ধরা বৌ গো।

কালিয়া পেরেত মামদো ভূত
শাক-চুন্নি হামদো পুত
পালিয়ে যাবে, বেদের কবচ লও গো॥

বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও গো বৌ, হবে খোকা-খুকি॥
নাচ, নাচ, নাচ-বেদের নাচ? সাপের নাচ?
সোলেমানি পাথর নেবে? রঙিন কাঁচ?

—কোরাস

চার

দেখি লো তোর হাত দেখি।
হাতে হলুদ-গন্ধ, এলি রাঁধতে রাঁধতে কি?
মনের মতন বর পেলে, নয় কন্যা ছয় ছেলে।

চিকন আঙ্গুল দীঘল হাত, দালান-বাড়ি ঘরে ভাত,
হাতে কাঁকন পায়ে বেঁকি।

ও বাবা! এ কোন ছুঁড়ি? সাত ননদ তিন শ্বাশুড়ি।
ডুবে ডুবে খাচ্ছ জল, কার সাথে তোর পিরীত বল।

চোখের জলে পারবি তারে বাঁধতে কি?
দেখি লো তোর হাত দেখি।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে

পাঁচ

(কথা) কইবে না কথা কইবে না বৌ,
তোর সাথে তার আড়ি-আড়ি-আড়ি।
(বৌ) মান করেছে, যাবে চলে আজই বাপের বাড়ি॥

বৌ কসনে কথা কসনে,
এত অল্পে অধীর হসনে,
ও নতুন ফুলের খবর পেলে
পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে,
ওর মন্দ স্বভাব ভারি॥

—কানন

ছয়

মৌটুশী— পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
হিজল-ফুলের মালা।
কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকণ-কালা॥
চন্দন— নই আমি সে বনের কিশোর,
(তোর) ফুলের শপথ, নই ফুল-চোর,
বন জানে আর মন জানে লো, আমার বুকের জ্বালা॥

ঝুমরো—

ঘি-মউ-মউ আম-কাঁঠালের পিঁড়িখানি আন্,
বনের মেয়ে বন-দেবতায় করবে মালা দান।
লতা-পাতার বাসর-ঘরে
রাখ ওরে ভাই বন্ধ করে,
ভুলিসনে ওর চাতুরীতে, ওলো বনবালা।।

—মেনকা, কানন, পাহাড়ী।

সাত

ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসে রে
ফুল-ফুটানো হাসি।
হিয়ার কাছে পিয়ার ধরে
বলতে পারি আজ যেন রে
তোমার নিয়া পিয়া আমি
হইব উদাসী।।

—পাহাড়ী ও কানন

গ্রন্থ-পরিচয়

['নজরুল-রচনাবলী'-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৭) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

প্রবন্ধ

১৩২৫ বৈশাখের ভারতবর্ষে 'সঞ্চয়' বিভাগে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় তুর্ক মহিলা সম্পর্কে কিছু বিরূপ আলোচনা সংকলন করেন। তাহারই প্রতিবাদে নজরুল ইসলাম ১৩২৬ কার্তিকের 'সওগাতে' লেখেন 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা'। ইহাই নজরুলের প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধ।

১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় 'জননীদের প্রতি', 'পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব' ও 'জীবন-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার 'ম্যাগাজিন সেকশন' হইতে ভাবানুবাদ।

'আমার ধর্ম' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ, 'মুশকিল' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১২ই পৌষ, 'নিশান-বরদার' (পতাকা-বাহী) ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্তিক, 'তোমার পণ কি' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে কার্তিক এবং 'কামাল' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন তারিখে 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩২৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখের 'ধূমকেতু', ১৩২৯ মাঘের 'প্রবর্তক', ১৩২৯ ফাল্গুনের 'উপাসনা' এবং ১৩২৯ ফাল্গুনের 'সহচর' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র মামলায় এই 'জবানবন্দী' আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল। পুস্তিকাকারে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; কবির নূতনতম প্রতিকৃতি-সংবলিত দ্বিতীয় সংস্করণের দাম ছিল দুই আনা।

'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' ১৩৩৯ সালে বার্ষিক 'প্রাতিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'প্রাতিকা' হইতে উহা ১৩৪০ পৌষ-চৈত্রের বুলবুলে উদ্ধৃত হয়।

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' ১৪ই পৌষ ১৩৩৪ (৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৭) তারিখের ২য় বর্ষ ৩৭শ সংখ্যক সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলিকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদের অভ্যর্থনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা ৪ঠা পৌষ ১৩৩৪ তারিখের সাপ্তাহিক 'বাঙ্গলার কথা'-য় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তির উল্লেখ করিয়া নজরুল ইসলাম 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখেন। নজরুল ইসলামের কথার জবাবে বীরবল (শ্রীপ্রমথ চৌধুরী) ২০শে মাঘ ১৩৩৪ (৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) তারিখের ২য় বর্ষ ৪২শ সংখ্যক 'আত্মশক্তি'তে লেখেন 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা'। বীরবলের বিতর্কমূলক লেখাটি নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :

বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা
বীরবল

গত 'শনিবারের চিঠি' খুলে দেখি যে, আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা আছে। শ্রীযুক্ত বলাহক নন্দী লিখেছেন :

'আমাদের লিখিত ভাষায় যে একটা বিপ্লব চলিতেছে তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষায়ও যে এর চেয়ে অনেক বড় একটা বিপ্লব হইয়া গিয়াছে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। বীরবল যখন এই পরিবর্তনের খবর রাখেন না (তিনি কি রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কলের মতো ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন?) তখন আর কাহার কাছে দাঁড়াই?'

এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর—বাংলার গল্প-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপ নেই, সুতরাং তাদের কথিত ভাষাও যে কতদূর বীরবলী হয়ে পড়েছে তা আমাদের অবিদিত। দ্বিতীয় উত্তর—আমি বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে সত্যসত্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কারণ সে মন্দিরে ইতিমধ্যে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সপ্তরথী মিলে যে বঙ্গ-সাহিত্যের অভিমন্যুকে বধ করেছেন, ভীষ্ম যে এখন শরশয্যায় শয়ান, এসব কথা জেগে থাকলে আমি নিশ্চয় জানতে পেতুম। এসব ঘটনা যে ঘটেছে তার সন্ধান পেলুম 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত কাজী নজরুল-ইসলামের 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' নামক ট্র্যাজেডিতে। অবশ্য বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিমন্যু যে কে এবং সপ্তরথীরা যে কারা, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অভিমন্যু যিনিই হোন, তিনি যে মরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ এই অপমৃত্যুর জন্য 'উত্তরা' শুনেছি তারস্বরে রোদন করছেন। কিন্তু তার জন্য ভীষ্মের উপর চারিধার থেকে যে কেন শরবর্ষণ হচ্ছে তার হদিস পাচ্ছিনে। অভিমন্যুবধের পূর্বেই তো ভীষ্ম-বধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রে যিনি শিশুবধ করেছিলেন, তার নাম অশ্বত্থামা। সে মতিচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ যে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তা তো জানিনে—আর যদি না হয়েই থাকেন তো তার অঙ্গে শর-নিক্ষেপ করা বৃথা, কেননা পাপ অমর।

সে যাই হোক, আমি জেগে থাকলেও এ খুনাখুনির ব্যাপারে যোগ দিতুম না, কারণ আমি জানি, আমার হাতে আলপিনের চাইতে বেশি মারাত্মক অস্ত্র নেই। তবে এই

সূত্রে কাজী-সাহেব এমন একটি তর্ক তুলেছেন যে তর্কে যোগদান করবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছিনে—কারণ সে তর্ক হচ্ছে ভাষার তর্ক, আর বৃথা ভাষার তর্ক করেই আমার জীবনটা বৃথায় গেল। কাজী সাহেব বলেছেন যে, 'কবিগুরু বলেছেন আমি কথায় কথায় রক্তকে খুন বলে অপরাধ করেছি।'

কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন,—এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে-সভায় তিনি ও-কথা বলেন সে-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণস্বরূপ তিনি 'খুনের' কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি।

(২)

সাহিত্য-জগতে তরুণ বলতে কাকে বোঝায়, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। যদি আমি ও পদবাচ্য না হই তা হলে কাজী সাহেবও তা নন্। কারণ, সাহিত্যিক ঠিকুজি অনুসারে আমার বয়েস ষোল—আর কাজী সাহেবের দশ। সাহিত্যিকরা তো আর বিয়ের কনে নন যে, দশে ও ষোলোয় বেশি তফাৎ করে। গত পরশু একটি সারস্বত সমাজে আমাকে কেউ কেউ প্রবীণ সাহিত্যিক বলে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, আমি যদি প্রবীণ হই তাহলে কাজী সাহেব কি করে নবীন হন? এ-ক্ষেত্রে নবীনে-প্রবীণে কি এত কম ব্যবধান? সত্য কথা এই যে, এক্ষেত্রে কোনোই প্রভেদ নেই। যে নবীন-সাহিত্যিক প্রবীণ নন—তিনিও তদ্রূপ সাহিত্যিক, যে প্রবীণ-সাহিতিক নবীন নন তিনি যদ্রূপ সাহিত্যিক। সাহিত্য হচ্ছে চির-নবীন ও চির-পুরাতন, সাহিত্যিকরাও তাই। সরস্বতীর নোকরি গভর্নমেন্টের চাকরি নয় যে, আপিসে Senior-Junior-এর কোনও অর্থের প্রভেদ আছে। কার কত বয়স সে খোঁজ সরস্বতী রাখেন না।

(৩)

বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজী সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী-প্রতিভা' নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পাতা উল্টে গেলে 'খুনে'র সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এ সব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না।

তারপর কাজী সাহেব এই বলে দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অন্তরে আরবি ফারসি শব্দের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করতে চান। কাজী সাহেবের এ বিলাপ প্রলাপ মাত্র। কেননা, যদি তাঁর ও-রকম কোনও কুমতলব থাকত তাহলে তিনি বহু পূর্বে

আমার ভাষার উপর খড়্গহস্ত হতেন। বীরবলী ভাষা যে সাহিত্যে একঘরে, এমনকি সংবাদপত্রে ও আর পাঁচজনের ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে তা বসতে পারে না, তার প্রধান কারণ যে সে ভাষা শব্দ সম্বন্ধে untouchability মানে না।

বীরবলী ভাষা চলে শুধু বীরবলের সইয়ের উপর, অর্থাৎ স্বনামে, অনামে নয়। বীরবল সাহিত্য-সমাজে শুধু 'আমি' বলতে পারেন, 'আমরা' বলবার তার অধিকার নেই, গৌরবে বহু-বচন ব্যবহার করবার অধিকারে তিনি বঞ্চিত। যাক্ সে সব কথা। বাংলা সাহিত্য থেকে আরবি ও ফারসি শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না। আর রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষা জানেন না এমন কথা বোধ হয় কোনও অকরুণ তরুণ সাহিত্যিকও বলতে চান না। আরবি-ফারসি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে 'কলম' ছাড়তে হয়। কারণ ও-শব্দটি শুধু আরবি নয়, এমন অনির্বচনীয় আরবি যে ও-শব্দ হা করে কণ্ঠমূল থেকে উদগীরণ করতে হয়। ও 'ক' হিন্দু জবানে বেরোয় না এক কাশি ছাড়া। এই সূত্রে কাজী সাহেব আমাদের বেশের উপর মুসলমান বেশের প্রভাবের কথা যা বলেছেন তা সবই সত্য, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের বেশের অনুরূপ সরস্বতীর বেশে গোঁজামিল দিলে তার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমরা হ্যাটকোটও পরি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার অভিন্নহৃদয় সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী যখন কবিতা লিখতে গিয়ে, মিলের খাতিরে লিখে বসলেন, 'সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট'—তখন দেশ-সুদ্ধ লোকে হেসে উঠেছিল। সুতরাং 'সরস্বতী যদি এখন চুড়িদার পায়জামা পরে গায়ে কাবা ও মাথায় শেরওয়ানি টুপি চড়িয়ে হাতে রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে রাজপথে দেখা দেন, তাহলে সকলে একবাক্যে বলে উঠবেন—'ওঁকে বোরখা পরাও, বোরখা পরাও।' এ হচ্ছে যুক্তির কথা নয়, রুচির কথা।

'কথায় কথায় রক্তকে খুন বলাটা' যে সাহিত্যিক অপরাধ, তার কারণ, কথায় কথায় খুনকে রক্ত বলাটাও সমান অপরাধ। অদ্যাবধি ফৌজদারি আদালতে কোনও উকিলই 'রক্তের মামলা' করেননি, কারণ অদ্যাবধি কোনও বাঙালি 'রক্তের আসামী' হয়নি। অশ্বত্থামার মতো যাঁর মাথায় খুন চড়ে যায়, তাঁকেও রক্তের দায়ে কোন বিচারালয়ই ফেলতে পারে না। এর কারণও স্পষ্ট। কথায় বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি!' কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে বঙ্গ-সাহিত্য মুড়ি ও চাল-ভাজার অদ্বৈতবাদ অচল। ন্যায়সংগত খুন ও রক্তেরও অদ্বৈতবাদ অচল। মা-কালীর খুনে অরুচি নেই, তাই বলে শ্রীমান দিলীপকুমার যদি ভক্তিভরে তাঁর সুমুখে গান ধরে যে-'কে দিয়েছে খুন জবা পায়', তাহলে লট্র লট্র বশিনী তন্মুহূর্তে অট্ট অট্ট হাসিনী হয়ে উঠবেন।

অভিধানে খুন আর রক্ত এক হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণে তা নয়। রক্তও বিশেষ্য, খুনও তাই। কিন্তু রক্ত উপরন্তু বিশেষণ, খুন তা নয়। অপরপক্ষে খুন ক্রিয়া, রক্ত তা নয়। আর আমরা যাকে 'পদ' বলি, তার দুকূল আছে, এক অভিধান-কূল আর এক ব্যাকরণকূল। শব্দের এই দুকূল রক্ষা করে ব্যবহার করাই সাহিত্যের ধর্ম।

সর্বশেষে খুনের একটি গুণের উল্লেখ করব—যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেননি। কবিতা লিখতে হলে মিলের প্রয়োজন—অন্তত বাংলো কবিতাতে তো আছই। এখন বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, রক্তের তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না। ক চ ট ত প বর্গের ভিতর ভক্ত শুধু রক্তের সঙ্গে মেলে, তারপর শক্ত। বাস্, ওইখানেই খতম্। অপরপক্ষে খুনের মিলের আর অন্ত নেই। পঞ্চবর্গের প্রায় অক্ষরে খুনের মিল পাওয়া যায় ; পুঁথি বেড়ে যায় ; এই ভয়ে তার আর ফর্দ দিলুম না। আপনারা এইসব অক্ষরের গায়ে 'উন' চড়িয়ে দেখবেন মেলে কি না মেলে। এমনকি বর্ণমালার শেষ অক্ষরজাত হুনের সঙ্গে খুনের সম্বন্ধ অতি নিকট। অতএব কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয় তাহলে reason-এর খাতিরে rhyme-কে তালাক দিতে হয়। আর কে না জানে rhyme -এর খাতিরে—['আত্মশক্তি', ২০শে মাঘ ১৩৩৪, শুক্রবার, ৩ পৃষ্ঠা] reason-এর সাত খুন মাপ।

'বর্ষারম্ভে' ১৩৪৪ বৈশাখে ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যক বুলবুলে প্রকাশিত হয়।

নবপর্যায় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম; তাহাতে কবির স্বাক্ষরিত বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আজ চাই কি' এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ইহা 'নবযুগ' হইতে পরে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে তারিখের দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'আমার সুন্দর' ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ (২ জুন ১৯৪২) তারিখের দৈনিক 'নবযুগ'-এ কবির স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়।

'সত্যবাণী' ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়।

'ব্যর্থতার ব্যথা' ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে বাহির হইয়াছিল ; 'গণবাণী' হইতে ইহা ১৩৬৭ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'ধূমকেতু' পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে।

'ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি' ১৩৩৮ সালের ৫ই ভাদ্র মুতাবিক ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখে ভূতপূর্ব 'ভোটরঙ্গ'-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিকের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র প্রারম্ভিব সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'ধর্ম ও কর্ম' ১৩৪৮ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবারের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'হারামণি' নামক লোকগীতি-সংগ্রহ সম্পর্কে ১৩৩৭ শ্রাবণের 'জয়তী'তে 'দিলরুবা' কাব্য সম্পর্কে ১৩৪০ কার্তিকের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে, 'আগামীবারে সমাপ্য' নামক উপন্যাস সম্পর্কে ১৩৪০ পৌষের 'মোয়াজ্জিন'-এ এবং 'সুজনের গান' নামক গীতিগ্রন্থ সম্পর্কে ১৩৪৭ পৌষের 'ভোরের আলো' ও ১৩৪৭ মাঘের 'সওগাত'-এ কবি-কৃত গুণালোচনা প্রকাশিত হয়।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বুধবার তারিখে ৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র-রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক : নজরুল ইসলাম ; মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। উহার প্রথম খণ্ডের বিশেষ সংখ্যায়

'লাঙল' এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৩শে পৌষ প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় 'পলিটিকাল তুবড়িবাজি' সম্পাদকীয় নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখে 'নজরুল ইসলামের পত্র' প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'গণবাণী ও মুজফ্ফর আহমদ' এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় 'বাঙালীর বাংলা' বাহির হইয়াছিল।

পুনশ্চ

'সুর ও শ্রুতি' শিরোনামীয় অসমাপ্ত প্রবন্ধটি শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি অন্বেষা' নামক সংকলন-গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত বলিয়াছেন :

> 'এই রচনাটি অপ্রকাশিত। একটি বাঁধাই খাতায় কাজী নজরুল ইসলামের নিজের হাতের লেখায় পাওয়া গেছে। খাতায় তিনি এত দ্রুত লিখেছেন যে, কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধারের অসুবিধা হয়েছে। রাগ-রাগিণী ও শ্রুতির চার্টগুলি তাঁর নিজের হাতে তৈরি। এই চার্টগুলি দেখে, অনুমান করা যায় শাস্ত্রীয় সংগীতের তুলনামূলক বিচারে তিনি কিরূপ আগ্রহী ছিলেন এবং কিরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। একই খাতায় আরো কয়েকটি রাগের প্রকৃতি ও পরিচয় বর্ণনা করেছেন।... খাতা-দৃষ্টে অনুমান হয় ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি এই লেখা আরম্ভ করেছিলেন।'

'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালী' শীর্ষনাম লেখাটি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'চতুর্বর্গ-কলের বোঁটা' শিরোনামীয় রসরচনাটি ১৩৩৬ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখের সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকায় 'চানাচুর' বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'হক সাহেবের হাসির গল্প' ১৩৪৯ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় বাহির হয়।

'নজরুল ইসলামের পত্র' শিরোনামে উল্লিখিত রচনাটি আগে প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র উভয় অংশে মুদ্রিত হয়েছিল। নতুন সংস্করণ রচনাবলীর অভিভাষণ অংশে এটি 'কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ' নামে মুদ্রিত হলো।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'আমার লীগ কংগ্রেস' প্রসঙ্গে

নজরুলের 'আমার লীগ কংগ্রেস' শীর্ষক নিবন্ধটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে (নতুন সংস্করণ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত) মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু 'নজরুল-

রচনাবলী'তে মুদ্রিত উক্ত নিবন্ধে ষষ্ঠ স্তবকের ধারাক্রমে 'আশার আলোক দেখতে পাইনি।'র পর নিম্নোক্ত কথাগুলো নেই :

> 'হঠাৎ লীগ-নেতা কায়েদে আজম যেদিন পাকিস্তানের' কথা তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন—'আমরা ব্রিটিশ ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব'—সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলাম—হাঁ, এতদিনে একজন 'সিপাহসালার'—সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠল।'

উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলাম উপমহাদেশ বিভাগে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি সংগ্রাম করেছেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য। 'আমার লীগ কংগ্রেস'-এর উপরোক্ত বক্তব্যেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধ করার জন্য কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, 'আমার লীগ কংগ্রেস' শীর্ষক প্রবন্ধটি সাবেক পাকিস্তান আমলে বিশিষ্ট লেখক ও 'নজরুল ইকবাল সোসাইটি'র সভাপতি মরহুম মীজানুর রহমান তাঁর সম্পাদিত 'তরুণ পাকিস্তান' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণ করেন। তাতে উপরোক্ত অংশটুকু রয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত এবং 'তরুণ পাকিস্তান'-এ মুদ্রিত প্রবন্ধটির বাকি সব অংশ এক ও অভিন্ন।

জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৩৯ 'ভাদ্রে' 'জুলফিকার' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ২৪টি গান ছিল। 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে সেগুলি সংকলিত হইয়াছে।

'জুলফিকার' গীতিগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিকা মিসেস প্রমীলা নজরুল ইসলাম ; ১৬নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ এবং মুদ্রাকর শ্রী সমীর মজুমদার এম. এস্‌সি. ; বেঙ্গল প্রিন্টার্স ১১৭/১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭৬ ; দাম দুই টাকা। তাহাতে মোট ৫৪টি গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬ সংখ্যক গান : 'কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়', ৩২-সংখ্যক গান : 'নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান,' ৩৪-সংখ্যক গান : 'দূর আরবের স্বপন দেখি,' ৪-সংখ্যক গান : 'নাই হলো মা জেওর লেবাস এ ঈদে আমার,' ৪৪-সংখ্যক গান : 'আমার হৃদয়-শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি' এবং ৫১-সংখ্যক গান : 'নামাজ পড়ো রোজা রাখো কলেমা পড়ো ভাই,' এই ৬টি গান 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের 'সংযোজন' বিভাগে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া এখানে সেগুলি পরিবর্জিত হইল। অবশিষ্ট ২৪টি গান, এবং উপরোক্ত ৬টি গানের স্থলে নূতন ৬টি গান এখানে পরিবেশিত হইয়াছে।

এখানকার ২৬-সংখ্যক গান : 'হেরা হতে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে' ১৩৭৬ সনের গ্রীষ্ম-সংখ্যক 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'য়, ৩২-সংখ্যক গান : 'ফেরি করি ফিরি আমি আল্লা নবীর নাম' মৎসম্পাদিত 'নজরুল-রচনা সম্ভার' পুস্তকে,

৩৪-সংখ্যক গান : 'সুদূর মক্কা-মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির' জনাব আবদুস্ সাত্তার সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি-সন্ধানে' পুস্তকে, ৪২-সংখ্যক গান : 'রোজ হাশরে আল্লা আমার করো না বিচার,' ৪৪-সংখ্যক গান : 'নাম মোহাম্মদ বোল্ মন', ৫১-সংখ্যক গান : 'হে নামাজি আমার ঘরে নামাজ পড়ো আজ' জনাব ইজাবউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'পল্লীগীতি' পুস্তকে আহরিত হইয়াছে।

৫৪-সংখ্যক গান : 'দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মতো গোলাপফুল' দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতিগ্রন্থ 'জুলফিকার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের (১৯২৩) ভাদ্র মাসে। প্রকাশক : বি. দোজা, এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের ২য় খণ্ডে (১৯৯৩) গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত।

নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে 'জুলফিকার' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র বহুকাল পরে কলকাতা থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রকাশিত 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (প্রকাশকাল জুন : ২০০২) নজরুলের 'জুলফিকার' গীতিগ্রন্থটি সন্নিবেশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে 'জুলফিকার'-এর 'সংযোজন' হিসাবে ২৯টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ বলা হয় যে, 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' নামে নজরুলের কোনো গীতিগ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হয়নি, যদিও 'জুলফিকার' গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত এবং ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-তে 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' নামে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি আবদুল কাদিরের নিজস্ব সংযোজন। (দ্রষ্টব্য : 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়।)

উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশিত হবার পরও, কবির অসুস্থতার এবং বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার সুদীর্ঘকালের পরিসরে—এমনকি ১৯৭৬ সালে তাঁর ইন্তেকালের পরও, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অনেক প্রকাশক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি-পরিবারের সহযোগিতায়) নজরুলের রচনা গ্রন্থাকারে শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করেছে, পুরানো বইয়ের পুনর্মুদ্রণও করেছে। এখানে দুটি মাত্র উদাহরণ উপস্থাপিত হলো—(১) নজরুলের সুস্থাবস্থায় 'সন্ধ্যামালতী' নামে তাঁর কোনো গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন অবস্থায় ১৩৭৭ সালে (১৯৭১) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে (১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২)। (২) নজরুলের সুস্থাবস্থায় 'রাঙা-জবা' নামে তাঁর কোনো গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

'রাঙা-জবা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে (১৩৭৩) কবির অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার সুদীর্ঘকাল পরে। পরিবেশক : হরফ প্রকাশনী, ৩-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২।

উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে দেখলে, 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' নামে নজরুলের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও, কবি আবদুল কাদির 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' শিরোনামে ২৯টি গান (যেগুলো 'জুলফিকার' গীতিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়) অন্তর্ভুক্ত করে কোনো অন্যায় করেননি। উল্লেখ্য, 'পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি' প্রকাশিত 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম'-এর তৃতীয় খণ্ডে 'জুলফিকার' শিরোনামে এবং 'সংযোজন' হিসাবে যে-গানগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে-গুলো ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে (দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) রয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী' নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৮) 'জুলফিকার' গ্রন্থ চতুর্থ খণ্ডে এবং 'জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড' সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পুনশ্চ

'জুলফিকার' গীতি-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যথাক্রমে 'নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই', 'কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও, মদিনায়', নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান', 'দূর আরবের স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে', 'নাই হলো মা জেওর লেবাস এই ঈদে আমার', 'আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি'—এই গানগুলো সংযোজিত হলো। আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) গানগুলো 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ড

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'বন-গীতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের (১৯২৩) আশ্বিন মাসে। প্রকাশক : এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলকাতা। উক্ত গ্রন্থে গানের সংখ্যা ছিল ৬৬টি।

'নজরুল-রচনাবলী'র (নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২০০৮) নতুন সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডে 'বন-গীতি' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'বন-গীতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালে (১৯৫৩)। এই সংস্করণের প্রকাশকের নাম আছে প্রমীলা নজরুল ইসলামের। ঠিকানা : ১৬ রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট, কলকাতা। আখ্যাপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে : প্রকাশক : নলেজ হোম, ৫৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা। মুদ্রক : নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২৫/১এ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা, দাম আড়াই টাকা। (গ্রন্থ-পরিচয়, 'নজরুল রচনাসমগ্র', ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০)

'বন-গীতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্গত ২১টি গান 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান সংস্করণে (নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) আলাদা গ্রন্থরূপে 'বন-গীতি' দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হলো। উল্লেখ্য, ১৩৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত 'বন-গীতি' গ্রন্থটি কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে গানের সংখ্যা ৬৬টি।

'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণে (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৮) অন্তর্ভুক্ত 'বন-গীতি' : দ্বিতীয় খণ্ড-এর অন্তর্গত ২১টি গান ইতিপূর্বে কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'বন-গীতি'র অন্তর্ভুক্ত না হলেও, গানগুলো তৃতীয় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'রচনা সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম'-এর চতুর্থ খণ্ডে 'বন-গীতি' দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্গত ২১টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ বলা হয়েছে, যে-কারণেই হোক প্রথম সংস্করণভুক্ত নিম্নলিখিত গানগুলি দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গানগুলো হলো : যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলী সখী বাজিল, কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু, তুমি ফুল আমি সুতো, ভালোবাসার বাঁধব বাসা, মাধব-বংশীধারী বনওয়ারী গোঠচারী, শ্যামা তুই বেদেনির মেয়ে, ও মা ফিরে এলে কানাই মোদের, এসো মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী, নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে, ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই, রাখো রাখো রাঙা পায়, মোরে সেই রূপে দেখা দাও হে হরি, রাখো এ মিনতি ত্রিভুবনপতি।

উপরোক্ত গানগুলো 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'বনগীতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবগুলো গানই ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত (১৯৯৩)। এতেই স্পষ্ট যে, 'বন-গীতি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের অন্তর্গত উপরোক্ত গানগুলো দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হলেও, 'নজরুল-রচনাবলী'তে বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৮) পঞ্চম খণ্ডে 'বনগীতি'র অন্তর্গত সবগুলো গানই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পু ন শ্চ

'বন-গীতি : দ্বিতীয় খণ্ডের' সবগুলো গানই আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) অন্তর্গত 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
সন্ধ্যামালতী

নজরুলের সুস্থাবস্থায় 'সন্ধ্যামালতী' নামে তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার দীর্ঘকাল পরে ১৩৭৭ সালে শ্রাবণ মাসে (১৯৭১) কলকাতার প্রকাশনা-সংস্থা 'মিত্র ও ঘোষ' (১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২) কর্তৃক 'সন্ধ্যামালতী' নামে গীতিগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যামালতী'-তে নজরুলের রচিত ১৮৪টি গান ছাড়াও 'শাল পিয়ালের বনে', 'মেয়ের গান', 'ছেলের গান', 'কোরাস গান', 'ছেলে ও মেয়ের গান' ইত্যাদি শিরোনামে ১০টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত গ্রন্থে নজরুলের 'শ্রীমন্ত' গীতিনাট্যও অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-তে ইতিপূর্বে 'সন্ধ্যামালতী' নামে কোনো গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত না হলেও, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গানই 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, 'সন্ধ্যামালতী'র অন্তর্ভুক্ত 'মদির স্বপনে মম মন-ভবনে', ('গানের মালা'), 'গত রজনীর কথা মনে পড়ে ('গীতিশতদল'), 'দূর প্রবাসে কাঁদে প্রাণ' ('গানের মালা'), 'চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-সিরাজি ঝরে' ('গীতি-শতদল'), 'কে এলে মোর ব্যথার গানে' ('জুলফিকার'), 'কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো' ('মহুয়ার গান'), 'চম্পা পারুল যূথী টগর চামেলা' ('গানের মালা'), 'কে নিবি ফুল' (বনগীতি), 'ঐ কাজল চোখে' ('গানের মালা'), 'বল্লরী-ভুজ বন্ধন খোলো' ('গানের মালা'), 'কে দিল খোঁপাতে ধুতুরার ফুল লো' ('মহুয়ার গান'), 'অয়ি চঞ্চল লীলায়িত দেহা' ('গানের মালা'), 'দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা' ('গানের মালা'), 'ভুল করে কোন ফুল-বিতানে' ('গুল-বাগিচা'), 'আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে' ('গীতি-শতদল'), 'ও কালো বউ জল আনিতে যেয়ো না আর' ('গানের মালা'), 'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো' ('গানের মালা'), 'হেরা হতে হেলেদুলে' ('জুলফিকার'), 'সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহি মুসাফির' ('জুলফিকার') ইত্যাদি গান 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত কবির বিভিন্ন গীতি-গ্রন্থের (ব্রাকেটে উল্লিখিত) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীমন্ত' গীতিনাট্যও 'নজরুল-রচনাবলী'তে অন্যত্র আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'সন্ধ্যামালতী' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নজরুলের একই গান একাধিক ক্ষেত্রে বা গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'সন্ধ্যামালতী' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত 'চোখ মুছিলে জল মোছেনা বল সখি এ কোন জ্বালা' গানটি নজরুলের রচিত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কারণ আঙুরবালাকৃত গানটির আদি রেকর্ডে গীতিকাররূপে নজরুলের নাম নেই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শিল্পী আঙুরবালা ঢাকা সফরে এসে গানটি 'নজরুল সঙ্গীত'রূপে পরিবেশন করেন এবং জানান যে নজরুলের প্রশিক্ষণে তিনি গানটি রেকর্ড করেছিলেন। এ ছাড়া বিশিষ্ট

নজরুল সঙ্গীত সাধক প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঢাকা সফরের সময় গানটিকে নজরুল সঙ্গীতরূপে সনাক্ত ও পরিবেশন করেন। শ্রীমতী আঙুরবালা এবং শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে সংকলিত গানটিকে নজরুল রচনাবলীতে নেওয়া হলো। গানটির বাণী, শব্দ চয়ন, সুরের বৈশিষ্ট্য নজরুলের গজল গানের অনুরূপ।

রাঙা জবা

'রাঙা জবা' প্রথম সংস্করণ ১৩৭৩ সালের ১লা বৈশাখ শুক্রবার প্রকাশিত হয়। প্রকাশিকা : বেগম মরিয়ম আজিজ এম.এ. ; সোলেমানপুর, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা। মুদ্রাকর : শ্রীনিরঞ্জন জানা ; মিলন প্রেস, ৫৯-এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৯। পরিবেশক : হরফ প্রকাশনী ; ৩-১২৬, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-১২। ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

মূল 'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থের ১৪-সংখ্যক গান : 'কে পরালো মুণ্ডমালা,' ১৫-সংখ্যক গান : 'নাচে রে মোর কালো মেয়ে', ১৬-সংখ্যক গান : 'আনন্দের আনন্দ', ১৭-সংখ্যক গান : 'মা এসেছে মা এসেছে', ১৮-সংখ্যক গান : 'দেখে যারে রুদ্রাণী মা', ১৯-সংখ্যক গান : 'মাতল গগন—অঙ্গনে ঐ' এবং ২০-সংখ্যক গান : 'শ্মশান-কালীর নাম শুনে' যথাক্রমে 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের ৪৫, ৪৬, ৬৯, ৭০, ৪৮, ৪৭, ও ৫০ সংখ্যক গান। মূল 'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থের ২৭-সংখ্যক গান : 'জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী' নজরুল-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'বনগীতি' গ্রন্থের 'সংযোজন' বিভাগের ২১-সংখ্যক গান। মূল ৫২-সংখ্যক গান : 'জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী' এবং ৫৩-সংখ্যক গান : 'অসুর-বাড়ির ফেরৎ এ মা' যথাক্রমে 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের ৮৪ ও ৮২-সংখ্যক গান। মূল ২১-সংখ্যক গান : 'মহাবিদ্যা আদ্যশক্তি', ৫৮-সংখ্যক গান : 'প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণী', ৬৩-সংখ্যক গান : 'নন্দলোক থেকে (আনন্দলোক থেকে) আমি এনেছি রে', ৬৭-সংখ্যক গান : 'মায়ের আমার রূপ দেখে যা' এবং ৭৬-সংখ্যক গান : 'নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে' কবির 'দেবীস্তুতি' নামক রূপক-গীতিকাব্যের গান। মূল ৯৪-সংখ্যক গান : 'মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা' এবং ৮-সংখ্যক গানের পাঠ অভিন্ন-প্রকার। মূল ৬৫-সংখ্যক গানটি এই—

কেন আমায় আন্‌লি মা গো মহাবাণী-সিন্ধুকূলে?
ক্ষুদ্র ঘটে এ-সিন্ধুজল কেমন করে নেবো তুলে?
চতুর্বেদ, এই বাণী লয়ে
দুলে চারি বিন্দু হয়ে ;
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ-তারা গগন-মূলে॥

অনন্তকাল রবি-শশী এই সে মহাসাগর হতে
সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগতে॥
স্বল্প আমার এ আধারে
সে বাণী কি ধরতে পারে?
শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্রেও তোর চরণ ছুঁলে॥

লক্ষণীয় যে, ইহার পাঠ মূল ৬৪-সংখ্যক (এখানকার ৫১-সংখ্যক) গানের প্রায় অনুরূপ। সুতরাং এই ১৭টি গান এখানে পরিবর্জিত হইল।

উপরোক্ত ১৭টি গানের পরিবর্তে এখানকার ৮৪-১০০ সংখ্যক ১৭টি শ্যামাসঙ্গীত পরিবশিত হইয়াছে। ইহার ৮৪-সংখ্যক গান : 'কি নাম ধরে ডাকব তোরে মা' এবং ৮৫-সংখ্যক গান : 'নিশি-কাজল শ্যামা আয় মা' জনাব আবদুস্ সাত্তার সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি-সন্ধানে' পুস্তকে, ৯৪-সংখ্যক গান : 'জাগো অরুণ ভৈরব' স্বরলিপিসহ হরফ প্রকাশনীর 'নবরাগ' নামক গ্রন্থে, ৯৫-সংখ্যক গান : 'এসো শঙ্কর-ক্রোধাগ্নি' নজরুল একাডেমীর 'নজরুল-গীতি' প্রথম খণ্ডে, ৯০-সংখ্যক গান : 'তোর মেয়ে যদি থাক্‌তো উমা', ৯১-সংখ্যক গান : 'বর্ষা গেল আশ্বিন এল উমা', ৯২-সংখ্যক গান : 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও' এবং ৯৬-সংখ্যক গান : 'শান্ত হও শিব বিরহ্-বিহ্বল' নজরুল-গীতি দ্বিতীয় খণ্ডে, ৮৬-সংখ্যক গান 'ওমা তোর চরণে কি ফুল', ৯৭-সংখ্যক গান : 'ভগবান শিব জাগো জাগো,' ৯৮-সংখ্যক গান : 'ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে' এবং ১০০-সংখ্যক গান : 'মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়' নজরুল-গীতি তৃতীয় খণ্ডে, ৮৭-সংখ্যক গান : 'তোর নাম-গানেরই দীপক-রাগে' ও ৯৯-সংখ্যক গান : 'নমো নমঃ নমঃ হিমগিরি-সুতা' 'নজরুল-গীতি' চতুর্থ খণ্ডে, এবং ৮৮-সংখ্যক গান : 'শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে' নজরুল-গীতি পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। ৯৩-সংখ্যক গান : 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখের 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের 'বিজয়া' নাটিকার শেষ সমবেত-সংগীত।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'রাঙা জবা'র অন্তর্গত অধিকাংশ গানই কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)-এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। ২০০৪ সালে প্রকাশিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক সদ্যপরলোকগত প্রখ্যাত নজরুল-সংগীত গবেষক, নজরুল-সংগীত সংগ্রাহক, নজরুল-সংগীত বিশেষজ্ঞ এবং নজরুল-সংগীত বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এম.এ পি.এইচ.ডি.। 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক : বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এম.এ.। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর-সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)-এর তৃতীয় সংস্করণে নজরুল-সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের ভিত্তিতে,

গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী প্রকাশিত গানের পুস্তিকার সহায়তায়, নজরুলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত বাণীর আলোকে গানের শুদ্ধ বাণী পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণী ও 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের (২০০৪) অন্তর্গত বাণীর সাথে মিলিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে। অবশ্য অতি সামান্য পার্থক্যগুলো পরিবর্তন করা হয়নি।

পু ন শ্চ

কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) তৃতীয় খণ্ডে 'রাঙা জবা' অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে গানের সংখ্যা ৯৯টি। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণে' অন্তর্ভুক্ত 'রাঙা জবা' গ্রন্থের ৯৯টি গানই সন্নিবেশিত হয়েছে। এ-ছাড়াও বর্তমান সংস্করণে 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থটি সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্যাদি এবং কিছুসংখ্যক গানের বাণীর পাঠান্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পাঠান্তর প্রণয়নে সহায়ক সূত্র তথা উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত নজরুল-গবেষক, নজরুল-সংগীত সংগ্রাহক ও সংগীতজ্ঞ ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর-সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের (২০০৪) অন্তর্গত গানের বাণী।

উল্লেখ্য, 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' (১/১ আশ্চর্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, কলকাতা) প্রকাশিত 'কাজী নজরুল ইসলাম : রচনাসমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) 'রাঙা-জবা' সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সংকলনে 'রাঙা-জবা'র অন্তর্গত গানের সংখ্যা অনেক কম। 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত 'রাঙা-জবা'র নিম্নোক্ত গানগুলো সেখানে নেই : 'কি নাম ধরে ডাকব তোরে', 'নিশি কাজল শ্যামা আয় মা', 'ওমা তোর চরণে কি ফুল দিলে', 'তোর নাম গানেরই দীপক রাগে', 'শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে', 'রাঙা জবায় কাজ কি মা তোর', 'তোর মেয়ে যদি থাকত, উমা', 'বর্ষা গেল আশ্বিন এল', 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও', 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে', 'জাগো অরুণ ভৈরব', 'এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি', 'শান্তি হও শিব বিরহ-বিহ্বল', 'ভগবান শিব জাগো জাগো', 'নমো নমো হিম-গিরি', 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়'।

মধুমালা

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতিনাট্য সম্পর্কে কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে (দ্রষ্টব্য : চতুর্থ খণ্ড নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩)

'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ কোনো তথ্যাদি নেই। 'মধুমালা' কবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিংবা আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তারও উল্লেখ নেই। 'নজরুল-রচনাবলী'র (নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২০০৮) প্রতিটি খণ্ডে নজরুলের যে 'গ্রন্থপঞ্জি' রয়েছে তাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'মধুমালা' গীতিনাট্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০ সালে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে (প্রকাশকাল মে, ২০০৪) 'মধুমালা' গীতিনাট্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ বলা হয়েছে যে, 'মধুমালা' মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে প্রথম অভিনীত হয় ১০ অক্টোবর ১৯৩৯ সালে। 'মধুমালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৫ মাঘে, ১৯৫৯ জানুয়ারিতে। 'হরফ প্রকাশনী' কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাসম্ভার' ২য় খণ্ডে ভূমিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, 'নাট্যভারতীর উদ্যোগে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'মধুমালা' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। সম্ভবত তথ্যটি অভ্রান্ত নয়। ... ১৯৪৫ সালের কথা কোনোমতেই সত্য হতে পারে না। কারণ তখন নজরুল শিল্প-সংস্কৃতির সচেতন জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাকশক্তিহীন শয্যাশ্রয়ী রোগীতে পরিণত হয়ে গেছেন।' (দ্রষ্টব্য : রচনাসমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম, পঞ্চম খণ্ড)

কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ, বাকশক্তিহীন এবং শয্যাশায়ী হলেও, তাঁর রচিত 'মধুমালা' মঞ্চস্থ হতে পারবে না—এমন কথার পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

> 'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পাদক কবি আবদুল কাদির লিখেছেন, 'নজরুলের 'মধুমালা' গীতিনাট্যের রচনাকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, ডিসেম্বর, ১৯৩৭। কিন্তু নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় রচনার প্রায় আট বছর পরে, ১৯৪৫ সালে।'

(দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ', আবদুল কাদির। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৮৯)

সঞ্চিতা

১৯২৮ সালে নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয়। তা প্রকাশ করেন ব্রজবিহারী বর্মণ রায়, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা হতে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+১৩০ ; মূল্য দেড় টাকা ; প্রকাশের তারিখ ২ অক্টোবর ১৯২৮। এতে অগ্নি-বীণা, ঝিঙে ফুল, সর্বহারা, ফণি-মনসা, ছায়ানট, দোলনচাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল ও চিত্তনামা থেকে কবিতা গৃহীত হয়।

অব্যবহিত পরবর্তীকালে (১৪ অক্টোবর ১৯২৮) গোপালদাস মজুমদারও ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে 'সঞ্চিতা' প্রকাশ করেন। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+২২৪, মূল্য আড়াই টাকা। এতে অগ্নি-বীণা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্তনামা ও ঝিঙেফুল ছাড়াও বুলবুল ও জিঞ্জীর থেকে কবিতা ও গান গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ডি. এম. লাইব্রেরী সংস্করণের প্রচারই অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ক্রমশ চক্রবাক, সন্ধ্যা, চোখের চাতক, নজরুল-গীতিকার গান সবশেষে থাকে।

সঞ্চিতার উভয় সংস্করণই 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রীচরণারবিন্দেষু' বলে উৎসর্গ করা হয়।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

১৯২৮ সালের পরে প্রকাশিত 'সঞ্চিতার' বিভিন্ন সংস্করণে নজরুলের পরবর্তী কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ থেকে রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
বনের বেদে

গীতিনাট্য, মেগাফোন ড্রামাটিক পার্টি কর্তৃক অভিনীত, বেতার এবং গ্রামোফোনের তাগিদে রচিত। কল্যাণী কাজীর সৌজন্যে 'নজরুল পরিষদ পত্রিকা'য়—কলকাতা, ১৩১৩ থেকে সংকলিত। 'বনের বেদে' গীতিনাট্যটি মেগাফোন গ্রামোফোন পার্টি কর্তৃক অভিনয়কালে প্রযোজনা করেন ধীরেন বসু, ব্যবস্থাপনায় ছিলেন তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। 'বনের বেদে' রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০-এর ডিসেম্বর মাসে।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
বিয়ে বাড়ি

হিজ মাস্টার্স ভয়েস, প্রীতি উপহার, Text and Story of Marriage Presentation set N 7326 to N7328, সৌজন্যে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

সাপুড়ে

'সাপুড়ে' ছায়াছবির পরিচিতি আমরা আসাদুল হক রচিত 'চলচ্চিত্রে নজরুল' গ্রন্থ (বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩) থেকে উদ্ধৃত করছি, 'নিউ থিয়েটার্স' প্রযোজিত বাংলা ছায়াছবি সাপুড়ে ১৯৩৯ সালের ২৭শে মে কলকাতা 'পূর্ণ' প্রেক্ষাগৃহে সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। চিত্রনাট্যকার এবং ছায়াছবির পরিচালনায় ছিলেন দেবকী বসু। সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। চিত্রনাট্যকার হিসেবে দেবকী বসুর নাম গেলেও প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্য রচনা করেন কাজী নজরুল এবং ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল হলেও সাতটি গান রচনা, সুরারোপ এবং প্রশিক্ষণের সকল দায় দায়িত্ব পালন করেন কবি নজরুল ইসলাম। ছায়াছবিতে মোট গানের সংখ্যা আটটি। সাতটি রচনা করেন কবি নজরুল এবং বাকি একটি গান রচনা করেন অজয় ভট্টাচার্য। আলোকচিত্র পরিচালনা করেন ইউসুফ মুল্‌জী। শিল্প নির্দেশনা করেন তারক বসু। শব্দযন্ত্র পরিচালনা করেন অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন কালী রাহা।'

'নজরুলের 'সাপুড়ে' কাহিনীটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। মূল কাহিনীটি বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি। সিনেমাহলে বিক্রয়ের জন্য কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার ও গান দিয়ে যে পুস্তিকা সে সময় মুদ্রিত হয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে তার একটিমাত্র কপি পাওয়া গেছে কবিশিষ্য নিতাই ঘটকের নিকট থেকে। সেই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ আমরা এখানে মুদ্রিত করলাম। এটিও সম্পূর্ণ কাজী নজরুল ইসলামের রচনা।—সম্পাদক 'নজরুল পরিষদ পত্রিকা' ১৩৯৩, কলকাতা।

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গন্জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফতরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু,

'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন : মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ পুনরায় কুমিল্লায় আগমন, চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা

প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী

হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্ল্যাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইবরাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ['চল্ চল্ চল্'] ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ — ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ — 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ — সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশ-গ্রহণ।

১৯৩২ — নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩ — গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪ — গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ — ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ — এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ— ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক— সজনীকান্ত দাস
জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য— এ. এফ. রহমান
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
তুষারকান্তি ঘোষ
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
সৈয়দ বদরুদ্দোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি-পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন ড্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'-এ অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। নজরুল-বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাহীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান নজরুল-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [তিথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্‌শান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে

কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি–র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল–জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩; ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪; আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ—'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ—'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

	কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল–স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
সন্ধ্যামালতী	গান। মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
নজরুল সঙ্গীত সমগ্র	সম্পাদনা : রশিদুন্‌নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬।

'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণীর পাঠান্তর

কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় 'সন্ধ্যামালতী' নামে তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবির অসুস্থতার দীর্ঘকাল পর ১৩৭৭ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯৭১) কলকাতার প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যামালতী' শীর্ষক গ্রন্থ। প্রকাশকের 'নিবেদন'-এ বলা হয় : "কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই রচনাগুলি এতোকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেছিল। কবিপুত্রদের সহযোগিতায় ও আনুকূল্যে রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। এজন্য আমাদের ও পাঠকদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।" উল্লেখ্য, ১৩৮৪ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে, ১৯৭৭) ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এবং কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'সন্ধ্যামালতী' অন্তর্ভুক্ত না হলেও এই গ্রন্থের অন্তর্গত রচনাসমূহ 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)·'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' শিরোনামে স্থান পায়। কলকাতার প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণীর সঙ্গে 'নজরুল-রচনাবলী'র (৩য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর অনেকক্ষেত্রেই পার্থক্য রয়েছে। নীচে যতটা সম্ভব এই পাঠান্তর পরিবেশিত হলো। স্থান সঙ্কোচনের কারণে হয়তো গানের স্তবক-বিন্যাসে পার্থক্য ঘটেছে। মুদ্রন-বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে। এজন্য দুঃখিত।

নজরুল-সঙ্গীত গ্রন্থ 'সন্ধ্যামালতী'	'নজরুল-রচনাবলী'	
গানের প্রথম পংক্তি ১	'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড) ১৯৯৩, গানের প্রথম পংক্তি ২	'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের অন্তর্গত গানের প্রথম পংক্তি ৩
১. সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে	'সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন]	'সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে' [গানের স্তবক সংখ্যা এক] 'মিত্র ও ঘোষ' (কলকাতার) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'চিরুনি বিনোদ বিনুনীতে বাঁধে দেখিলে সে-কোন সুন্দর চাঁদে ; হৃদয়ে ভীরু প্রদীপ শিখা কাঁপে আনন্দে থেকে থেকে ॥'

১	২	৩
২. জল দাও জল দাও	'জল দাও জল দাও' [গানের স্তবক সংখ্যা দুই] 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'জল দাও জ্বলে গেল সাহারার মত হৃদি তল, উপরোক্ত পংক্তিটি অন্যত্র নিম্নরূপ : 'জল দাও–দাও জল মরু–পথে মরি তৃষ্ণায় সাহারার মত হৃদিতল॥'	'জল দাও জল দাও' [গানের স্তবক সংখ্যা দুই] 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (মিত্র ও ঘোষ'এর) একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'জল দাও জ্বলে গেল সাহারার মত হৃদিতল।'
৩. কপোত কপোতী উড়িয়া বেড়াই		'কপোত–কপোতী উড়িয়া বেড়াই' কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭) নিম্নোক্ত পংক্তিটি নেই : 'পুরুষ : বিশ্ব ভুলায়ে ও–রাঙা পায়ে আমারে বেঁধেছে জীবনে–মরণে।'
৪. তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতে	'তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতে' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন]	'তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতে' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (মিত্র ও ঘোষ) একটি স্তবক নিম্নরূপ : 'যেন বৃন্দাবনে আর রাধা নাই বৃন্দাবনে গো সব সাধ গেছে মরে॥' 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড ১৯৯৩) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'যেন রাধা নাই আর বৃন্দাবনে গো সব সাধ গেছে মরে।'

১	২	৩
৫. এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া	'এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া' [গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ] 'নজরুল-রচনাবলী'তে একটি পংক্তি : 'ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া।'	'এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭) একটি পংক্তি : 'মোহনিয়া শ্যাম পিয়া ঘন দেয়া॥'
৬. আর্শিতে তোর নিজের রূপই	'আর্শিতে তোর নিজের রূপই' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড ১৯৯৩) পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'চাঁদ যেন চকোর'	'আর্শিতে তোর নিজের রূপই' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭) নিম্নোক্ত পংক্তিটি নেই : 'ওলো চাঁদ যেন চকোর' শুধু 'চাঁদ যেন চকোর' ব্যবহৃত হয়েছে।
৭. বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রানী	'বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রানী' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা করো দূর কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি॥'	'বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রানী, 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা কর দূর কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি॥'

১	২	৩
৮. বনে যায় আনন্দ দুলাল	'বনে যায় গোঠে যায় আনন্দ-দুলাল' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে কয়েকটি পংক্তি : ১. 'বাজে চরণে ঘুমুরের রুমঝুমু তাল' ২. এল লুকিয়ে দেখিতে তারে দেবতার দল'	'বনে যায় আনন্দ দুলাল' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত (১৩৭৭) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে কয়েকটি পংক্তি : ১. 'বাজে চরণে ঘুমুরের রুমুঝুমু তাল, ২. 'এল লুকিয়ে দেখিতে তারে দেবতার দল' উপরোক্ত পংক্তিগুলো 'বেণুকা' শীর্ষক স্বরলিপি গ্রন্থে নিম্নরূপ: ১. 'বাজে চরণে নূপুরের রুনুঝুনু তাল' ২. 'লুকিয়ে দেখিতে এলো বেদতারি দল (তায়), [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত (অক্টোবর, ২০০৬) উক্ত গ্রন্থে আরেকটি পংক্তি : 'বনে যায় গোঠে যায়।'
৯. বনদেবী এস গহন বন-ছায়ে	'বন-দেবী এস গহন বন-ছায়ে' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি : 'কল্পলোকের তুমি রূপরাণী, লো প্রিয়া ! অপাঙ্গে ফোটাও জুঁই চম্পা টগর মোতিয়া, 'নিঠুর পরশ তব (হায়) যাচিয়া জাগে বনভূমি ফুল দল পড়ে ঝরি' তব চারু পদচুমি' 'সুন্দরের পথ সাজাই ঝরা কুসুম-দল বিছায়ে।' উপরোক্ত পংক্তিগুলো 'মিত্র ও ঘোষ' এর 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে নেই।	'বনদেবী এস গহন বন-ছায়ে' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] কলকাতার 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত (১৩৭৭) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে কয়েকটি পংক্তি : 'আমরা রতি মীন-কেতন পঞ্চশর দোলা জাগাই বুকে মধু বায়ে ফুল-ফসলের আমরা দূত সুন্দরের পথ সাজাই ঝরাফুল দল বিছায়ে।'

১	২	৩
১০. একি অপরূপ রূপের কুমার	'একি অপরূপ রূপের কুমার' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড ১৯৯৩) নিম্নোক্ত স্তবকটি আছে : ১. 'এতরূপ সখি কেমনে দেখি বিধি দিল দুটি আঁখি, তাহে আবার পলক পড়ে বিধি দিল দুটি আঁখি। ২. 'সে চড়ায় আলোক-ধেনু বাজাইয়া বেণুকা, সন্ধ্যা উষার রঙে গো খুর-রেণুকা।' উপরোক্ত স্তবক দুটি গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই। রেকর্ড নং TWIN F.T. 4212 শিল্পী : কুমারী রেণু বসু	'একি অপরূপ রূপের কুমার' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭)-র নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই : ১. 'এতরূপ সখি কেমনে দেখি বিধি দিল দুটি আঁখি তাহে আবার পলক পড়ে বিধি দিল দুটি আঁখি।' ২. 'প্রেম যমুনার তীরে সই নিরবধি দেখি তারে, দেখি আর চেয়ে রই।'

১	২	৩
১১. প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই	'প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) এবং 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের (১৩৭৭) অন্তর্গত এবং পার্শ্বের ৩ নং কলামে উদ্ধৃত পংক্তিগুলো নেই।	'প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] কলকাতার 'মিত্র এন্ড ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'নাই যদি পাই তবু জানি যেন আমি তুমি মোর প্রিয়তম তুমি মোর স্বামী প্রতীক্ষা করিব অনন্ত জনম— আমার সে স্বপন ভাঙিয়ো না॥ বধূ তুমি থাকো মোরে ভুলিতে দিও না মোর সব কেড়ে নাও তব স্মৃতি কেড়ে নিও না॥ শুধু কাঁদিরেত দাও প্রিয় তব বিরহে আমি তোমারে পাবনা সকলে কহে তবু প্রেম-প্রদীপ মোর জ্বলিতে দাও তারে নিভায়ো না॥
১২. শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপা-নারী	'শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপ-নারী' [গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ] হিজমাস্টার্স ভয়েস এন. ৭৩১৮ থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে গৃহীত কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'শুক বলে, 'বীর শিকারীরা এই গোঁফে দেয় চাড়া সারী বলে, 'মুণি-ঋষির দেখলে দাড়ি নাড়া কিবা বাহার খোলে॥'	'শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপ-নারী' [গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ] 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থে (১৩৭৭) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রয়েছে : 'শুক বলে, 'মোর গোঁফ শোভা পায় বীর শিকারীর মুখে' সারী বলে, 'দাড়ির আসন মুণি-ঋষির বুকে দাঁড়ি আদরিণী' 'শুক বলে, 'সে যতই বাড়ুই তবু গোঁফের নীচে, সারী, তোমার দাড়ি।' গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত উক্ত গানের উপরোক্ত পংক্তিগুলো কিছুটা ভিন্নরূপ। রেকর্ড নং হিজ মাস্টার্স ভয়েস এন. ৭৩১৮

বি. দ্র. : 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি গানের যে পাঠান্তর এখানে যথাসম্ভব পেশ করা হয়েছে সেগুলো নির্ণিত হয়েছে কলকাতা থেকে ১৩৭৭ (১৯৭১) সালে প্রকাশিত 'সন্ধ্যামালতী' গ্রন্থ, 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) এবং 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' [নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত, ২০০৬) ইত্যাদি গ্রন্থের সহায়তায়।

'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থ প্রসঙ্গে

কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত (১৯৯৩) 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থ সম্পর্কে 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ বলা হয়েছে 'রাঙা জবা' প্রথম সংস্করণ ১৩৭৩ (১৯৬৭) সালের ১লা বৈশাখ শুক্রবার প্রকাশিত হয়। প্রকাশিকা : বেগম মরিয়ম আজিজ এম.এ. ; সোলমানপুর, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা। মুদ্রাকর : শ্রী নিরঞ্জন জানা ; মিলন প্রেস, ৫৯-এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা ৯। পরিবেশক : হরফ প্রকাশনী ; ৩-১২৬, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-১২। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।' [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১১জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫শে মে ১৯৯৩]

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকেই স্পষ্ট যে, 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, নজরুলের অসুস্থতা ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার বহু বছর পরে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থ ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত এবং কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' পরিবেশিত গ্রন্থ। 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ 'রাঙা জবা'র অন্তর্গত গানগুলো সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকলেও কবি আবদুল কাদির কোথাও উল্লেখ করেননি যে গানগুলো গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়েছে, এবং কোনো রেকর্ড নম্বরও উল্লেখিত হয়নি।

কিন্তু এটা সুবিদিত যে, 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সব গানই গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়েছে এবং নজরুলের সুস্থাবস্থায়ই রেকর্ড করা হয়েছে অধিকাংশ গান। নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত (মে, ১৯৯৩) এবং বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী, নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ও সংগ্রাহক জনাব আবদুস সাত্তার প্রণীত 'নজরুল-সঙ্গীত অভিধান', নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত (জুলাই, ১৯৯৫) এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ডক্টর করুণাময় গোস্বামী সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'নজরুল-সঙ্গীতের তালিকা', নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুরের ভিত্তিতে প্রণীত এবং নজরুল ইন্সটিটিউট ও নজরুল একাডেমী প্রকাশিত নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, নজরুলের 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সব গানই গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়েছে। স্বরলিপি গ্রন্থসমূহে রেকর্ড নম্বর এবং শিল্পীর নামও উল্লেখিত আছে।

ইতিপূর্বে 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) অন্তর্ভুক্ত 'রাঙা জবা' গীতি-গ্রন্থের বহু গানের বাণীর সঙ্গেই গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত গানের বাণীর পার্থক্য রয়েছে। নজরুলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির সঙ্গেও অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। গান রচনার পর এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গীত হওয়ার আগেও নজরুল অনেকক্ষেত্রে গানের বাণী পরিবর্তন করেছেন। 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণে (নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) 'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত গানের বাণী যথাসম্ভব সঠিকভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। গানের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর প্রণয়নে সহায়ক-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের ২০০৪ সালের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। এই পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রাহক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ পরলোকগত ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এম.এ. পিএইচ.ডি.। মূল সম্পাদক : বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান এম.এ.।

২০০৪ সালে প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে গানের বাণীর নীচে গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর উল্লেখিত না থাকলেও এসব গানের বাণী যে আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকেই নেয়া হয়েছে তা অনুধাবন করা যায় এই কারণে যে, ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সংগ্রহে বিপুল সংখ্যক নজরুল-সঙ্গীতের

আদি গ্রামোফোন রেকর্ড রয়েছে, এ-তথ্য আমাদের জানা। উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মমোহন ঠাকুর তাঁর সংগৃহীত নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে বহুসংখ্যক গান ক্যাসেট করে ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটকে প্রদান করেছেন। 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের 'মুখবন্ধ'-এ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, গানের বাণী আদি গ্রামোফোন রেকর্ড, রেকর্ড কোম্পানীর পুস্তিকা, নজরুলের হাতের লেখা মূল পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত।

'রাঙা জবা'র অন্তর্গত গানের বাণীর পাঠান্তর

'রাঙা জবা' গীতিগ্রন্থ	'নজরুল-রচনাবলী'	'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩
১. বল রে জবা বল	'বল রে জবা বল' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-এর অন্তর্গত 'রাঙা জবা' গ্রন্থে ছিল 'কবে উঠবে প্রসাদী ফুল'	'বল রে জবা বল' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'হবে কবে প্রসাদী ফুল' এ-ছাড়াও আরেকটি পংক্তি : 'কবে উঠবে রেঙে'
২. আদরিণী মোর কালো মেয়েরে	'আদরিণী মোর কালো মেয়েরে' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-এর অন্তর্গত 'রাঙা জবা' গ্রন্থের একটি স্তবক ছিল নিম্নরূপ : 'শিরে তারে রাখি যদি মন কাঁদে নিরবধি (সে) চলতে পায়ে দলবে বলে পথে হৃদয় পেতে থাকি।'	'আদরিণী মোর কালো মেয়েরে' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'শিরে তারে রাখি যদি মন কাঁদে নিরবধি, (সে) চলতে পায়ে দলবে বলে পথে হৃদয় পেতে থাকি।'

১	২	৩
৩. শামা তোর নাম জপমালা	'শামা তোর নাম জপমালা' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) তে দুটি পংক্তি ছিল নিম্নরূপ : 'মায়ের কোলে সে যে শিশুর সম অভয় চিতে সদা খেলে নাচে।'	'শামা তোর নাম জপমালা' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) দুটি পংক্তি নিম্নরূপ: 'যেমন খেলে শিশু মায়ের সনে তোর অভয় কোলে সে তেমনি নাচে।'
৪. (আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়	'(আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে দুটি পংক্তি ছিল নিম্নরূপ : 'কেঁদে বেড়াই, কাঁদলে যদি আসে দয়া করে॥'	'আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়, 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নরূপ পংক্তি রয়েছে : 'কোন মায়াতে মহামায়ায় রাখবে বেঁধে আমার হিয়ায় কাঁদলে যদি হয় দয়া তার তাই কাঁদি প্রাণভরে॥'
৫. মায়ের চেয়ে শান্তিময়ী	'মায়ের চেয়ে শান্তিময়ী' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে নিম্নোক্ত স্তবকটি ছিল : 'মোর নন্দিনী এই আনন্দিনী আমি সেই গরবে গরবিনী তার আর কি চাওয়ার আছে গো যার অন্তরে মা আনন্দিনী তার আর কি পাওয়ার আছে গো এই মা যে আমার হৃদয়-গগন আলোর মতো আছে ছেয়ে॥	'মায়ের চেয়ে শান্তিময়ী' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'মোর নন্দিনী এই আনন্দিনী আমি সেই গরবে গরবিনী তার আর কি চাওয়ার আছে গো যার অন্তরে মা আনন্দিনী তার আর কি পাওয়ার আছে গো এই মা যে আমার হৃদয়-গগন আলোর মতো আছে ছেয়ে।'

১	২	৩
৬. কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো	'কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো' [গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো ছিল : 'তুষার-ধবল কান্তি যাহার চন্দ্র-লেখা চূড়ায় চন্দ্রকান্তমণির জ্যোতিঃরূপ দেখে যার লজ্জা পায় সেই চন্দ্রচূড়ও রূপ দেখে তোর অঙ্গে ছাই মাখালো'	'কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২004) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'তুষার-ধবল কান্তি যাহার চন্দ্র-লেখা চূড়ায় চন্দ্রকান্তমণির জ্যোতিঃ রূপ দেখে যার লজ্জা পায় সেই চন্দ্রচূড়ও রূপ দেখে তোর অঙ্গে ছাই মাখালো।'
৭. শক্তের তুই ভক্ত শামা	'শক্তের তুই ভক্ত শামা' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো ছিল : '(তাই) ভয় পেয়ে তুই মুক্তি দিতে চাস মা নিজে সেধে * * * চতুর্মুখে ব্রহ্মা ভাবেন-দেবী আছেন চর্তুবেদে'	'শক্তের তুই ভক্ত শামা' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : '(তাই) ভয় পেয়ে তুই মুক্তি দিতে চাস মা নিজে সেধে * * * * চতুর্মুখে ব্রহ্মা ভাবেন দেবী আছেন চতুর্বেদে।'

১	২	৩
৮. বল মা শ্যামা	'বল মা শামা' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী' (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩)-তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো ছিল : '(দেখি) আর্শিতে মুখ দেখতে গিয়ে মূর্তি তোরই রাজে মুদলে আঁখি বিগ্রহ তোর দেখি বুকের মাঝে আর কতকাল ছবি দিয়ে রাখবি মোরে মা ভুলিয়ে, তোর কোলে মা যাব ভবে, শান্তি কবে পাব প্রাণে !	'বল মা শ্যামা' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : '(দেখি) আর্শিতে মুখ দেখতে গিয়ে মূর্তি তোরই রাজে, মৃদুলে আঁখি বিগ্রহ তোর দেখি বুকের মাঝে, আর কতকাল ছবি দিয়ে রাখবে মোরে মা ভুলিয়ে, তোর কোলে মা যাব কবে, শান্তি কবে পাব প্রাণে॥'

বি. দ্র. : কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি (অখণ্ড) গ্রন্থের পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক পরলোকগত ডঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর তাঁর লেখা 'মুখবন্ধ'-এ (২৪/৮/২০০২ তারিখে লিখিত) উল্লেখ করেছেন যে, "যেহেতু নজরুলের বহুসংখ্যক গানের এক বা একাধিক পাঠান্তর রয়েছে সেহেতু আদি রেকর্ডের বাণীই আমরা গ্রহণ করেছি। আদি রেকর্ডভিত্তিক বাণী ও স্বরলিপি বাংলাদেশে নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে চলেছে।'

উল্লেখ্য, স্থান সংকোচনের কারণে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তরে স্তবক-বিন্যাস যথাযথরূপে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শত সতর্কতা সত্ত্বেও, হয়তো কিছু কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাটও রয়ে গেছে। এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ডের গানের বাণীর পাঠান্তর

নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'জুলফিকার'–এর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত কিছু কিছু গানের বাণীর সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীরও পার্থক্য ও পাঠান্তর রয়েছে। এখানে যথাসম্ভব তা তুলে ধরা হলো।

জুলফিকার : দ্বিতীয় খণ্ড	'নজরুল-রচনাবলী'	অন্যান্য গ্রন্থ
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩
১. দূর আরবের স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে	'দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ড (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) [গানের স্তবক সংখ্যা দুই] 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অংশে মুদ্রিত একটি পংক্তি : 'স্বপ্নে শুনি নিতুই রাতে যেন মিশর থেকে'	'দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ও 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক সংকলনে পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'স্বপ্নে শুনি নিতুই রাতে যেন কাবার মিনার থেকে' গ্রামোফোন রেকর্ডেও অভিন্ন। রেকর্ড নং H.M.V. KDB 150 ও 5 শিল্পী : কে. মল্লিক
২. নাই হলো মা বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার	'নাই হলো মা বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার' [গানের স্তবক সংখ্যা তিন] 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) প্রথম পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'নাই হলো মা জেওর-লেবাস এই ঈদে আমার'	'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) 'নাই হলো মা বসন-ভূষণ' ও 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক সংকলনে এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'নাই মা হলো বসন-ভূষণ এই ঈদে আমার' রেকর্ড নং TWIN FT 13824 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

১	২	৩
৩. আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি' মোমের বা	'আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি' মোমের বাতি' 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত তিনটি পংক্তি নেই : 'তোমায় পেলে পাব খোদায় তাই শরণ যাচি তোমারই পায় পাওয়ার আগে জেগে থাকি প্রেমের শয্যাপাতি।'	'আমার হৃদয় শামাদানে জ্বালি' মোমের বাতি' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ও 'নজরুল-সঙ্গীত স সংকলনে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'তোমায় পেলে পাব খোদায় তাই শরণ যাচি তোমারই পায় পাওয়ার আগে জেগে থাকি প্রেমের শয্যাপাতি। [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) তৃতীয় সংস্করণ, (২০০৪), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা এবং 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' প্রথম প্রকাশ (২০০৬), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।]

বি. দ্র. : স্থান-সংকোচনের কারণে গানের স্তবক-বিন্যাস সঠিকভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মুদ্রণ-বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে।

বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ডের গানের বাণীর পাঠান্তর

বনগীতি : দ্বিতীয় খণ্ড	'নজরুল-রচনাবলী'	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩
১. হে মদিনার নাইয়া	'হে মদিনার নাইয়া' 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডের (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৯) 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অংশে একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'য়্যা রসুল আমায় পার করো'	'হে মদিনার নাইয়া' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ও 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থে পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'পার কর য়্যা রসুল'
২. লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া	'লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া' [গানের স্তবক সংখ্যা চার] 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডের (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) প্রতিটি স্তবকের শেষে নিম্নোক্ত পংক্তিটি নেই : 'মজনুঁ গো আঁখি খোলো'	'লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ও 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রতি স্তবকের শেষে 'মজনুঁ গো আঁখি খোলো' পংক্তিটি আছে। রেকর্ড নং H.M.V. N 17254 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ই

ঈ

উ

এ

ও

ঝ

ত

থ

দ

শ

স

হ